গীতসূত্রসার

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়



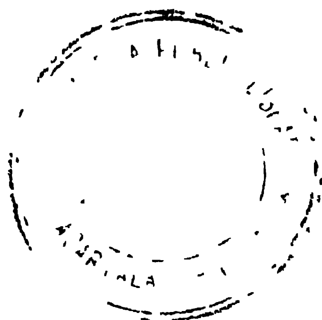
গীতসূত্রসার

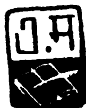
প্রথম ভাগ

[সংগীতের প্রকৃত উৎপত্তি এবং যাবতীয় মূলসূত্র ও
সাধনোপদেশ সম্বলিত কণ্ঠে গান শিক্ষার সহজ উপায়]

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

'সঙ্গীত শিক্ষা', 'সেতার শিক্ষা' এবং
'হারমনিয়ম শিক্ষা' প্রভৃতির গ্রন্থকার।





এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

GEETASUTRA SAR

By Krishnadhan Bandyopadhyaya

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সরকার-প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

চতুর্থ সংস্করণ, পৌষ ১৩৬২

মূল্য ২০·০০ (কুড়ি টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদ :
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

মুদ্রাকর :
মন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীততাত্ত্বিক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রচিত 'গীতসূত্র সার' গ্রন্থের প্রথম ভাগের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হলো। ভারতীয় সঙ্গীত জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার স্বরূপ এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। তারপর গ্রন্থখানির আরও দুটি সংস্করণ হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। তারপর এই সুদীর্ঘ চার দশকেরও বেশী কাল ধরে বইখানি অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল এবং পুরনো ছাপা বইয়ের কপিও পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ সঙ্গীত জ্ঞানী ও সঙ্গীত জিজ্ঞাসু মহলে বইখানার চাহিদার অন্ত ছিল না। শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীততত্ত্বান্বেষী মানুষ, এমন কি ভারতের বহির্ভাগস্থ ভারতের রাগসঙ্গীত বিষয়ে কৌতূহলী গবেষকেরা এই অসামান্য গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন অনুভব করে আসছিলেন।

দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থখানির ব্যাপক চাহিদার কথা স্মরণ করে এবং ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের বিস্তৃত ও বহুমুখী আলোচনা সম্বলিত অজস্র তথ্য ও তত্ত্বের আকর এমন একখানা তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থের পুনরপি প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে আমরা বহু আয়াসে পুরাতন গ্রন্থের কপি সংগ্রহ করে গ্রন্থখানার নূতন মুদ্রণ প্রকাশ করলাম। এ যে আমাদের পক্ষে কতখানি কষ্টসাধ্য কাজ ছিল, গ্রন্থের অভ্যন্তরে এক-নজর চোখ বুললেই তা সহজে প্রতীয়মান হতে পারে। প্রথমতঃ আমাদের দেশে ইউরোপীয় রেখা-স্বরলিপি পদ্ধতির এখনও সুপ্রচলন হয়নি, অনেক প্রেসেই এই স্বরলিপির চিহ্নাদি অলভ্য। দ্বিতীয়তঃ স্থানে স্থানে পাঠের মধ্যেই এই জাতীয় চিহ্নের অন্তর্নিবেশ ঘটায় মুদ্রণ-কার্য আরও বেশী বিঘ্নসঙ্কুল হয়েছে। মুদ্রণের এই অসুবিধা দূরীকরণের উপায় হিসাবে কোথাও কোথাও গোটা পৃষ্ঠা ব্লক করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রক্রিয়াটি আয়াসসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য দুই-ই কিন্তু গ্রন্থটিকে পাঠক সমাজের সামনে সুমুদ্রিত ও নির্ভরযোগ্য রূপে পরিবেশন করবার তাগিদে আমাদের এই ঝুঁকি নিতে হয়েছে। এখন বইখানি যাঁদের জন্য উদ্দিষ্ট তাঁদের মনোমত হলেই এই পরিশ্রম ও ব্যয় বহন সার্থক।

এত এত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ থাকতে 'গীতসূত্র সার' বইখানা প্রকাশের উপরেই কেন আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অসাধারণ সাহসী,

মৌলিক চিন্তা সমৃদ্ধ সঙ্গীতভাবুক ছিলেন। তাঁর চিন্তার বৈপ্লবিকতা ও অগ্রসরতা আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনি বহু বিষয়ের জ্ঞানের অনুশীলন করেছিলেন, তবে বিশেষভাবে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত চর্চায় তাঁর একান্ত মনোযোগ ও প্রযত্ন ন্যস্ত হয়েছিল। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ও প্রায়োগিক উভয়বিধ চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তিনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থগুলির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল কিন্তু পুরাতন বলেই পুরাতনকে মান্য করার নির্বিচার প্রবণতা তাঁর ছিল না। গীতসূত্র সার বইয়ের বক্তব্য পূর্বাপর অনুধাবন করলেই দেখা যাবে সংস্কৃত গ্রন্থগুলির ভুলভ্রান্তি প্রদর্শনে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেননি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের নিকষে প্রাচীন গ্রন্থাদির যে সকল মতামত ও বক্তব্য তাঁর নিকট গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে, কেবলমাত্র সেগুলিকেই তিনি গ্রাহ্য বলে প্রচার করেছেন। নূতন মতামত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি সর্বাংশে আপনাকে যুক্তির দ্বারা চালিত করেছেন, গতানুগতিক সংস্কারের কিংবা গড্ডল লোক-শ্রুতির কাছে কোথাও বশ্যতা স্বীকার করেননি।

ভারতীয় সঙ্গীতভাবনার ক্ষেত্রে কৃষ্ণধন যে কত বড় বিপ্লবী ছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপে এই বলাই যথেষ্ট যে, আজ থেকে একশত বছরেরও আগে থেকেই তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে স্বরলিপিধৃত করবার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রেখাঙ্কন-স্বরলিপি প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব অকুণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। শুধু প্রচারেই ক্ষান্ত হননি, নিজে হাতে-কলমে সেই ঘোষণাকে কার্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ কথার নিদর্শনের জন্য বেশী দূরে যাবার দরকার নেই, এই গ্রন্থের স্বরলিপিগুলিই তার সাক্ষ্য। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের গান সমূহ এবং তাঁর 'সেতার শিক্ষা' বইয়ের সমস্ত গৎ তিনি এই পদ্ধতিতেই পরিস্ফুট করেছিলেন। তাঁর আর একটি বৈপ্লবিক ঘোষণা হলো, ওস্তাদী ঘরানা সঙ্গীতের সংকীর্ণচিত্ততা থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তি ঘটিয়ে তাকে আধুনিক সৃজনশীল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। রাগ সঙ্গীতের প্রগাঢ় জ্ঞানী হয়েও তিনি আধুনিক সঙ্গীত-রীতির একজন সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতে নব নব সৃষ্টির বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি তাঁর এই অভিমত ছিল যে, আগামী দিনের ভারতীয় কণ্ঠ সঙ্গীতকে শুদ্ধমাত্র একক (সোলো) সঙ্গীতের কাঠামোতেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে নাট্য-সঙ্গীতের (ড্র্যামাটিক মিউজিক) অভিমুখে সঞ্চালিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় বৃন্দগান, আধুনিক কোরাস এবং পাশ্চাত্য অপেরা সঙ্গীত নূতন

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তি হতে পারে। যন্ত্র সঙ্গীতের ন্যায় কণ্ঠ সঙ্গীতেও যৌথরীতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্র সার' বইয়ের অপরিসীম মূল্যবত্তার ধারণা গ্রন্থ পাঠেই সম্যক উপলব্ধ হবে, তবে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই অর্থপূর্ণ সংবাদটি পরিবেশন করা প্রয়োজন যে, শুদ্ধমাত্র এই গ্রন্থখানি মূলে পড়বার আগ্রহাতিশয্যবশতঃই ভারত-বিশ্রুত মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতকোবিদ স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী বাংলা ভাষা শিক্ষা করেছিলেন।

বইয়ের বানান রীতি সম্পর্কে দুই-একটি কথা। মূল গ্রন্থে গ্রন্থকার যে-বানান অবলম্বন করেছেন এই গ্রন্থেও হুবহু সেই বানান অনুসরণ করা হয়েছে। আজকের বানানের সঙ্গে সে বানানের সঙ্গতি নেই বলে তাকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। এমনকি কমা, সেমিকোলন, ইত্যাদি যতি চিহ্নের বেলায়ও মূলকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা হয়েছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহকরণে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের শিষ্য সুপরিচিত সঙ্গীতবেত্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীহারবিন্দু চৌধুরী মহাশয় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। অনুগ্রহপূর্বক তিনি এই গ্রন্থের একটি নাতিবিস্তৃত সুন্দর ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। ভূমিকায় শুধু যে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঙ্গীতিক কৃতিত্বেরই পরিমাপন করা হয়েছে তাই নয়, তাঁর জীবনীর তথ্যাবলীও যতদূর সম্ভব চয়ন করে গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ভূমিকাটি একাধারে মূল্যায়ন ও জীবন কথা দুইয়েরই কাজ করবে। নীহারবিন্দুবাবুর এই মূল্যবান সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পাদনা, মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য করণীয়াদির দায়িত্ব বহন করেছেন প্রবীণ সাহিত্য ও সঙ্গীত সমালোচক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়। তাঁকেও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের প্রকাশন সংস্থার প্রতিনিধি রূপে শ্রীযুক্ত বিপুল চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রকাশের সঙ্গে আগাগোড়া সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও বইটির পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর আগ্রহের জন্যই এই গ্রন্থ বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারলো। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আমাদের ঘরের লোক, তাঁকে আর আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

গ্রন্থখানির মুদ্রণের জন্য নবীন সরস্বতী প্রেসের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দও প্রভূত আয়াস ও যত্ন নিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁদেরও সমূহ ধন্যবাদ প্রাপ্য।

১৫ই অগ্রহায়ণ, প্রকাশক

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।*

কণ্ঠ গীতচর্চ্চার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ বিধানার্থ এই পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইল। ভারতবর্ষের যন্ত্রসঙ্গীত অপেক্ষা কণ্ঠসঙ্গীত উৎকৃষ্টতর; বিশেষতঃ কালাবতী—ওস্তাদী—গান উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়াছে। সেই গান যাহাতে সহজে ও বিশুদ্ধরূপে শিক্ষা করা যায়, এবং তাহার মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি ও কুব্যবহার প্রবেশ জন্য, তাহা সাধারণের প্রিয় হইতে পারে নাই, তাহা সংশোধনানন্তর, যাহাতে উহাকে শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির অনুমোদনীয় ও গ্রহণযোগ্য করা যায়, তাহার উপযোগী উপদেশ সকল এই পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে। সঙ্গীত অনেক বিদ্যাপেক্ষা কঠিনতর। সাধারণতঃ, গান করা এক পক্ষে অতি সহজ বিদ্যা বলিয়া মনে হয়; কেননা, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলেই বিনা শিক্ষাতেও গান করিয়া থাকে, কিন্তু একটু অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া দেখিলে জানা যায় যে, গান বিদ্যা যন্ত্রাদি বাদনাপেক্ষা দুরূহতর। সেই বিদ্যা সহজ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে ইহাতে সঙ্গীতের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, অতি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে; স্থূল কথায় সঙ্গীত বিদ্যার প্রকৃত ব্যাকরণ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। অতএব ব্যাকরণের নিয়মে সঙ্গীতের যাবতীয় মূলসূত্র ইহাতে লিপিবদ্ধ ও উদাহৃত হইয়াছে।

সঙ্গীতের বিশুদ্ধ উপপত্তি (*theory*) জ্ঞানাভাবে শিক্ষা করা, কিম্বা শিক্ষা দেওয়া, কিছুই সহজ হয় না; সেই জন্য স্বর, মাত্রা, তাল, প্রভৃতি সঙ্গীতের ব্যবহার্য্য তাবৎ বিষয়ের প্রস্তুত উপপত্তি ইহাতে অতি সরল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সঙ্গীতের বিশুদ্ধ উপপত্তি-বিষয়ক পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই; দুই এক খানি পুস্তকে যে ঔপপত্তিকাংশ প্রকটনের চেষ্টা হইয়াছে দেখা যায়, তাহা প্রায় সমুদয় ভ্রম-সঙ্কুল। তদ্দ্বারা সাধারণের উপকার না হইয়া, বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা, কেন না অশিক্ষা অপেক্ষা ভুল শিক্ষা যে অনিষ্টের কারণ তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ঐ সকল ভ্রান্ত মত সবিস্তার সমালোচন সহকারে উপপত্তি বিষয়ক বিশুদ্ধ, বিজ্ঞানানুমোদিত যে মত, তাহা এই পুস্তকে মীমাংসিত হইয়াছে। আধুনিক কালে রাগ রাগিণী সম্বন্ধে যে মত সর্ব্ববাদী সম্মত, তাহার মীমাংসা সহকারে, রাগাদির সমুদয় রহস্য ও জ্ঞাতব্য কথা যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপে এই পুস্তক দ্বারা কেবলই

---

* যাঁহারা সঙ্গীত পুস্তক পাঠ করা বিড়ম্বনা মনে করিবেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন পাঠে পুস্তকের অবস্থা সংক্ষেপে জ্ঞাত হইতে পারিবেন; তজ্জন্যই ইহা বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল।

যে গান শিক্ষার্থীর উপকার হইবে তাহা নহে, ইহা কণ্ঠ ও যন্ত্র, সর্ব্ব প্রকার সঙ্গীত শিক্ষার্থীর কাজে লাগিবে; এবং উহা শিক্ষক ও ছাত্র, উভয়েরই ব্যবহার যোগ্য হইবে।

এই পুস্তকের শেষে যে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা, সঙ্গীতের ব্যবহার্য্য যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকের যে যে স্থানে আছে, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে। আমার পূর্ব্ব-প্রণীত সংগীত পুস্তক সকলে যে যে বিষয়ে মত-ভ্রম ছিল, তৎসমুদয় এই পুস্তকে সংশোধিত হইয়া প্রকটিত হইয়াছে।

কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির নাম করিয়া, সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ভ্রান্তি সকল প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন; সেই জন্য, সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসমূহে সঙ্গীত শাস্ত্র কি প্রকার বর্ণিত আছে, তাহা সাধারণের অবগতি জন্য বিবিধ সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া, স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, ও তালাধ্যায়, ১২শ পরিচ্ছেদে, সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই হেতু ঐ পরিচ্ছেদটী অন্যান্য পরিচ্ছেদাপেক্ষা কিছু দীর্ঘ হইয়াছে। এস্থলে আমার স্বীকার করা উচিত যে, রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত "সঙ্গীতদর্পণ", ও সংস্কৃত "সঙ্গীতসারসংগ্রহ", এবং বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ ও পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের প্রকাশিত সংস্কৃত "সঙ্গীত-রত্নাকর" ও "সঙ্গীত-পারিজাত", এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনেক শ্লোক এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শেষোক্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয় সঙ্গীতের সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের চক্ষু উন্মোচন করণাভিপ্রায়ে, কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু শুনিয়াছি, তাঁহারা সঙ্গীতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ শার্ঙ্গদেব-কৃত উক্ত সঙ্গীত-রত্নাকর ছাপাইতে আরম্ভ করিয়া, কোন ঘটনা বশতঃ এক অধ্যায়ের অধিক প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহা যে অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এই পুস্তকে ইউরোপীয় ও বাঙ্গালা, দুই প্রকার স্বরলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং কোন্ স্বরলিপি যে গীত অভ্যাস পক্ষে অধিক উপকারী, তাহা সাধারণের তুলনা করার সুবিধার্থ, কোন কোন গান উভয় স্বরলিপিতেই লিখিত হইয়াছে। স্বরলিপি বিষয়ক প্রস্তাব 'উপক্রমণিকার' শেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐ উপক্রমণিকা, সঙ্গীতে পটু ও অপটু সকলেরই পাঠ্য; উহাতে সঙ্গীতের নানা কথা আছে। সঙ্গীত সাধনা পক্ষে ইউরোপীয় স্বরলিপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, আপাততঃ উহার এক মহৎ দোষ এই যে, এতদ্দেশে উহা সহজে ছাপাইবার সুবিধা নাই; কারণ সকল যন্ত্রালয়ে উহার অক্ষর পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রকৃত উপকারী স্বরলিপি সম্বলিত পুস্তক প্রকাশের অসুবিধা অনেক। আমাদের

দেশে সকল যন্ত্রালয়ে ছাপাইতে পারা যায়, এরূপ একটি সহজ ও উপকারী বাঙ্গালা স্বরলিপি নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সেই জন্য, আমি যে বাঙ্গালা স্বরলিপি এই পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা এরূপ ভাবে গঠিত যে, তাহা সকল যন্ত্রালয়েই অক্লেশে ছাপাইতে পারা যাইবে। ইহা সঙ্গীত লিখন পক্ষে অন্যান্য বাঙ্গালা স্বরলিপি অপেক্ষা ভাল, কি মন্দ, তাহা আমার বলায় কোন ফল নাই; উহা "ফলেন পরিচীয়তে" হওয়াই উচিত। ঐ স্বরলিপিতে মাত্রার সংকেতগুলি নূতন নহে। উহা ইংরাজদিগের অধুনাতন ব্যবহৃত "টনিক্ সল্ফা" স্বরলিপিতে ব্যবহার হয়। অতএব উহার গুণাগুণ লোকের অবিদিত নাই। আমি, অনেকের ন্যায় নিজে একটা নূতন উদ্ভাবন করিয়া, যশোলাভের প্রত্যাশী নহি। স্বদেশের হিত কামনায়, সমাজ মধ্যে বিশুদ্ধ সংগীত জ্ঞান বিস্তারের জন্য, পূর্ব্বগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যে পথ উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাই অনুসরণ করা আমি উচিত বিবেচনা করি; কারণ তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। তবে যে বিষয়ে কোন পথ আবিষ্কৃত হয় নাই, আবশ্যক হইলে তাহার উপযোগী নূতন পথ নিজে প্রকাশ করিতে বাধা দেখি না, আর তাহা না করিলেও চলে না।

আমাদের এই বঙ্গদেশে সংগীতের চর্চ্চা অতিশয় বিরল জন্য, সংগীত পুস্তকেরও তাদৃশ আদর নাই। সুতরাং সংগীত পুস্তক লেখার বিশাল পরিশ্রমের অনুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। এখনও সংগীত চর্চ্চা অপকার্য্য বলিয়া অনেক ভদ্রলোকের ভ্রম আছে। ইহা যে অতিশয় দুঃখের বিষয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে? পরন্তু এমত অবস্থায়, বিবিধ বিদ্যানুরাগী, সংগীতবিশারদ, সার্ রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-মহোদয়ের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, এই অপবাদগ্রস্ত বিষয়ে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়া বহুবিধ সংগীত পুস্তক প্রকাশ পূর্ব্বক, দেশ বিদেশ হইতে যে রূপ অপরিমিত খ্যাতি ও সম্মান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে সংগীত চর্চ্চার কলঙ্ক অপনীত, ও সংগীত গ্রন্থকারের পদবীকে উন্নত করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নিকট সমস্ত ভারতবর্ষের সংগীত সমাজ চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে।......

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক দ্বারা স্বদেশীয় একটী লোকেরও বিশুদ্ধ সংগীত জ্ঞানের, ও গান শক্তির, উন্নতি সাধিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কোচবিহার,
১লা আশ্বিন, ১২৯২
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা

সংগীত-বিপ্লবী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকের বাংলার রেণেশাঁস ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাপ্রবাহের উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পসাহিত্য. চিত্রাঙ্কন, সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এসময় বাংলায় বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়। এসময় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান নানাভাবে বাংলার যুগমানসে প্রতিফলিত হতে থাকে ও ইংলণ্ডীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি ভারত ভূমিতে ফলপ্রসূ হতে সুরু করে।

চারুকলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নবযুগের উদ্ভব হয়, সে তুলনায় সঙ্গীত-চিন্তার ক্ষেত্রে খুব ক্ষীণ আলোড়ন লক্ষ্য না করে পারা যায় না। ঐতিহাসিক কারণেই শিল্পধারায় অসম বিকাশ ঘটে থাকে। তৎকালীন সঙ্গীত ও সঙ্গীতবেত্তাগণ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ছিলেন। গুটিকয়েক সঙ্গীতবিদ্ মাত্র সঙ্গীতের নবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তিপথের সন্ধানে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে সঙ্গীত চিন্তানায়ক সঙ্গীত রাজ্যের সকল গোঁড়ামি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষিতপটুত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে হিন্দুসঙ্গীতের বিজ্ঞান-সম্মত অগ্রগতির দুর্গম পথ সুগম করার কাজে জীবনোৎসর্গ করে গিয়েছেন, তিনি হলেন বিপ্লবী সঙ্গীত বিজ্ঞানী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীরস শাস্ত্রীয় বাগাড়ম্বর, গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চালিত সঙ্গীতজ্ঞকুল ও স্থবিরনিশ্চল সঙ্গীতের বিরুদ্ধে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে আমৃত্যু অক্লান্ত যোদ্ধার মত সংগ্রাম করে গেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ইতঃপূর্বে এমন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, এমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এবং এমন স্বাধীন বিপ্লবী চিন্তানায়কের সন্ধান মেলা ভার। সে যুগে কেন—এ যুগেও সঙ্গীত বিষয়ে নিভীক ভাবে এরূপ স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করা ও বলিষ্ঠ মতাদর্শ প্রচার করা যে কী অসম সাহসিকতার কাজ তা ভেবে বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে থাকা যায় না। ভারতীয় সঙ্গীতসমাজে এমন মুক্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি সত্যিই দুর্লভ। সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় এরূপ অন্তর্দৃষ্টি এরূপ পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও এরূপ প্রাগ্রসর মনোভাব ভারতের সঙ্গীত-ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে বিরল।

সাম্প্রতিক কালে সঙ্গীত জগতে যে পরিবর্তন ও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, আজ সঙ্গীতের যে বিকশমান রূপ বা নাট্যসঙ্গীতের যে অগ্রগতি দেখা যায়, সঙ্গীতে অধুনা যে স্বরলিপির ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত, আজ যে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণযুক্ত ঠুংরী শৈলীর গানের মাধুর্যমণ্ডিত রূপ আমরা লক্ষ্য করি,—তার প্রায় সব কৃতিত্বই সংগ্রামী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। সে যুগে নানা বাধাবিপত্তির মাঝেও তিনি সঙ্গীতের নব নব রীতিপদ্ধতিকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বাগত জানিয়েছেন। কূপমণ্ডুক রূপী সনাতনীদের ও সংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতনবাদীদের নিষ্ফল তর্কজালে আবদ্ধ না হয়ে এবং তাঁদের নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ না করে কৃষ্ণধনবাবু তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করে গেছেন। শিল্পক্ষেত্রে তাঁর সাংগ্রামিকতা আর্থিক দুর্গতি বা সস্তা জনপ্রিয়তার অপ্রতুলতায় কখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। চতুর্দিকের নিন্দা অপবাদ ও ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত সকল লাঞ্ছনা ও দুঃখ অক্লেশে বরণ করেছেন। জীবিতকালে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মানের এক কানাকড়িও পাননি—ভবিষ্যতে পাবেন বলেও তিনি আশা করেননি—ফলের দিকে দৃক্‌পাত না করেই আজীবন তিনি স্বদেশের সংস্কৃতির ও সঙ্গীতের সেবা করে গেছেন।

কৃষ্ণধনবাবু তাঁর অকাট্য যুক্তি ও বিজ্ঞজনোচিত মননশীলতা দ্বারা চিরাচরিত সাঙ্গীতিক প্রথা ও তথাকথিত স্বীকৃত শাস্ত্রের ভ্রান্তি অপনোদন করে গেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এমন যুক্তিবাদী ও সত্যসন্ধ ছিলেন যে, সত্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি তাঁর গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করতেও পশ্চাৎপদ বা কুণ্ঠিত হননি। অন্ধ গুরুভক্তির আতিশয্যে তিনি কখনও অজ্ঞতা বা চিরকালাশ্রিত অবৈজ্ঞানিক রীতিনীতি ও প্রথাকে প্রশ্রয় দেননি।

কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম উমাসুন্দরী দেবী। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যকাল সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। বর্তমান হেদুয়া অঞ্চলের ভীম ঘোষ লেনে (কলিকাতা-৬) বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবার বাস করতেন। কৈশোরে কৃষ্ণধনবাবু হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়াশুনা করেন। উত্তরকালে তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেন, তার সঠিক বিবরণ জানা যায়নি; কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন তা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে কৃষ্ণধনবাবু কর্তৃক ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট পদ গ্রহণ করার মধ্য দিয়েও অনুমিত হয় যে, তিনি উচ্চ উপাধিধারী ও উচ্চ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণধনবাবু নানা বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রেও তাঁর গভীর

অনুরাগের কথা জানা যায়। বাল্যে ও যৌবনে তিনি ব্যায়াম চর্চাও করেছিলেন। কিশোর কৃষ্ণধন অভিনয়-কলায়ও বিশেষ পারদর্শিতার নিদর্শন রেখে যান। সার্থক নট রূপে তিনি কিছুকাল পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া ভিলার নাট্যশালায় অভিনীত মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে তিনি নাম-ভূমিকা গ্রহণ করে নাট্যামোদীদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিলেন। এ উপলক্ষে মাইকেলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কৃষ্ণধনবাবু তাঁর 'চীনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থটি মাইকেল মধুসূদনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

খুব অল্প বয়স থেকেই কৃষ্ণধন সঙ্গীতানুশীলন আরম্ভ করেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন—কানে শুনেই যে কোনও গান অবিকল শিখে নিতে পারতেন। অর্থাভাবে তিনি ধারাবাহিক ভাবে সঙ্গীত শেখার সুযোগ পাননি। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সে সময় খুব বড় বড় শৌখিন রাজা মহারাজা বা পেশাদার লোক ছাড়া কেউ সঙ্গীতাভ্যাস করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। পড়াশুনা বজায় রেখে কৃষ্ণধন-বাবু নানা অসুবিধার মধ্যেও সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রাখেন—পরে তিনি সুগায়ক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট কণ্ঠসঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ও রেখা-স্বরলিপি (staff notation) শিক্ষা করেন। শোনা যায় পিয়ানো সংগ্রহ করতে না পেরে তিনি কাগজে পিয়ানোর কী-বোর্ড (Key-board) এঁকে তার উপর পিয়ানো বাদন অভ্যাস করেছেন। ইউরোপীয় সঙ্গীতালোচনা করতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গীত গ্রন্থাদি দেখে মুগ্ধ হন ও সঙ্গীত শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আস্থাবান হন। ভারতীয় ওস্তাদদের খাপছাড়া শিক্ষাপ্রণালীর উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ভারতে বিধিবদ্ধ প্রণালীর সঙ্গীত শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন ও আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান। স্বরলিপির সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার সম্ভবপরতা নিয়ে তিনি নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সে সময় ওস্তাদগণ মুখে মুখে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন এবং প্রায়শঃ নিরক্ষর ছিলেন বলে তাঁরা স্বরলিপি ও সঙ্গীত-গ্রন্থাদির চরম বিরোধিতা করতেন। সে যুগে সঙ্গীতালোচনা বা সঙ্গীত সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ই এ দেশে এলবার্ট হলে সর্বপ্রথম সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা করেন (আনুমানিক ১৮৯৮ খৃঃ)। আজ যে সঙ্গীত সম্মেলনী বা সঙ্গীত বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি লেখা হয়—এ সবেরই পথিকৃৎ হলেন কৃষ্ণধনবাবু।

কৃষ্ণধনবাবু পরে পাথুরিয়াঘাটার প্রখ্যাত সঙ্গীতগুণী ধ্রুপদী ও বীণাবাদক হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খাণ্ডারবাণীর ধ্রুপদ ও রাগালাপ শিক্ষা করেন।

জীবিকার্জনের জন্য তিনি রাজস্টেটের স্কুল শিক্ষকের চাকুরী (১৮৬৫ খৃঃ) নিয়ে সুদূর গোয়ালিয়রে চলে যান। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্যই তিনি পশ্চিমে চাকুরী করতে যান। গোয়ালিয়র রাজ্য তখনকার দিনে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বিখ্যাত সেতারী ওস্তাদ আহম্মদ্ জান্ খাঁ সাহেবের কাছে সেতার বাদনের কলা-কৌশলাদি আয়ত্ত করেন। মধ্যজীবনে কৃষ্ণধনবাবু কোচবিহার মহারাজের স্টেটে চাকুরী গ্রহণ (১৮৭৬ খৃঃ) করেন। কোচবিহার থেকেই মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সহায়তায় তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'গীতসূত্র সার'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৬. ৯. ১৮৮৫ ইং)। এই বিখ্যাত গ্রন্থটি কৃষ্ণধনবাবুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি রূপে পরিগণিত। ভারতীয় ভাষায় এমন যুক্তিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সঙ্গীত পুস্তক আর দ্বিতীয়টি নেই। পণ্ডিত ৺বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী শুধু এ বইটি পড়বার জন্য বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। গীতসূত্র সারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও চমৎকারিত্ব দেখে ভাতখণ্ডেজী গ্রন্থখানিকে লক্ষ্মৌ সঙ্গীত কলেজের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করেন। কৃষ্ণধনবাবুর পূর্বে দু'একটি সঙ্গীতবিষয়ক বই প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু সেগুলির তুলনায় তাঁর গীতসূত্র সার বইখানা রাগ-রাগিণীর সুচিন্তিত অভিমত, বিশ্লেষণভঙ্গী ও তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অভিনব ধরনের সঙ্গীত গ্রন্থ হিসাবে আজও স্বীকৃত। তাঁর এ পুস্তক পাঠে তাঁর সঙ্গীত বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত-বাংলা-সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। বাংলা ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে।

কৃষ্ণধনবাবুর দ্বিতীয় মহৎ কীর্তি হলো ভারতীয় সঙ্গীতে আন্তর্জাতিক রেখা-স্বরলিপির (Universal staff notation) প্রবর্তন-প্রচেষ্টা। ভারতীয় স্বরলিপি-পদ্ধতি মূলতঃ ভাষা-ভিত্তিক ও বহুলাংশে অসম্পূর্ণ; তাই কৃষ্ণধনবাবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত স্বরলেখন প্রণালী আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ও প্রচারক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সঙ্গীতজগতের চাবিকাঠি সনাতনী ও উগ্র স্বাজাত্যাভিমানীদের হাতে থাকাতে আজও এদেশে সর্বাপেক্ষা উন্নত বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি-পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হয়নি। কিন্তু যেদিন ভারতীয়রা সঙ্গীতের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন, সেদিন কৃষ্ণধন নির্দেশিত পাশ্চাত্ত্য রেখা স্বরলিপি গ্রহণ করা যে অপরিহার্য হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমর্থক হয়েও কৃষ্ণধন ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা প্রভৃতি রীতির গানের

নিম্নশ্রেণীর (কোন কোন ক্ষেত্রে কুরুচিপূর্ণ) কথা সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি করে গেছেন। তিনি নতুন সৃষ্টিকে সব সময়ই অভিনন্দন জানিয়েছেন। শত ভাল হলেও তিনি সঙ্গীতকর্মে পৌনঃপুনিকতার বিরোধী ছিলেন।

সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধনকৃত গীতসূত্র সার গ্রন্থে গায়কের কণ্ঠ মার্জনা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত মনোজ্ঞ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে, ভারতীয় ভাষায় লিখিত সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করা হলেও কণ্ঠ বিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। কৃষ্ণধন এ বিষয়েও পথ-প্রদর্শক হিসাবে সুচিহ্নিত থাকবেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে সঙ্গীতের উৎপত্তি, সাধারণ শিক্ষার উপর সঙ্গীতের ফল, সঙ্গীতালোচনার দুরবস্থা, স্বরপ্রকরণ ও স্বরসাধন, স্বরগ্রাম ও স্বরান্তরের নিয়ম, গানের অলঙ্কার, রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি বিষয়ক যুক্তি বিচার, রাগ-রাগিণী গাইবার সময় ও ঠাট, মেল প্রভৃতি নিরূপণ, আলাপ ও গানেব রীতি, সঙ্গীত দ্বারা রসেব উদ্দীপনা, হিন্দুসঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র, কণ্ঠেব সহিত যন্ত্রের সঙ্গত, মাত্রা, ছন্দ ও তালাদির বিবরণ, প্রচলিত তালসমূহের মাত্রা ও ছন্দ নির্ণয়, রাগাদির গ্রাম নিরূপণ, ষড়জ সংক্রমণ, ছন্দের প্রকার ও জাতি গানের প্রকার ও রীতি, রাগ-রাগিণীর শ্রেণীবিচাব ও জাতি, রাগাদির বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী, রাগাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উপর সমালোচনা, স্বরের শ্রুতিবিচার প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে সুচারুরূপে ক্রিয়াত্মক ও ঔপপত্তিক বিচাব বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। তাঁর আজীবন সাধনা ও গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার রূপে গীতসূত্র সার গ্রন্থ ভারতীয় সঙ্গীত সন্ধানীর কাছে চিরসমাদর লাভ করবে।

ভারতীয় সঙ্গীতে কোরাস্ (দলবদ্ধ গান), ঐকতানিক ও বহুতানিক সমবেত সঙ্গীত, গোষ্ঠী বাদন (orchestra), বহুস্বর মিলকরণ (harmonization) প্রভৃতি বিষয়েও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন। তানপুরা ও হারমোনিয়াম যন্ত্র সম্পর্কেও তিনি তাঁর স্বাধীন মতামত অকুতোভয়ে ব্যক্ত করে গেছেন, যদিও তা সর্বাংশে গ্রহণ বা বর্জনযোগ্য নয়। তাঁর তানপুরা বিরোধিতা সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। তাঁর সমুদয় সঙ্গীতগ্রন্থ ভারতীয় সঙ্গীতার্থীদের অবশ্যই পাঠ্য। কৃষ্ণধনই আধুনিক সংগীতশাস্ত্রের (musicology) জনক।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী আসামরাজ্যের গৌরীপুরে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকোবিদ (musicologist), সঙ্গীত-চিন্তা-বিপ্লবী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের অন্তিমপ্রান্তে তিনি আসাম গৌরীপুরাধিপতি

প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার (খ্যাতিমান চিত্রপরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার পিতা) সঙ্গীতগুরু রূপে আসামে অবস্থান করেন।

সঙ্গীত জগতে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির জন্য কৃষ্ণধন যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার রুদ্ধদ্বার উন্মোচনে তিনি যে অলোকসামান্য অবদান রেখে গেছেন তার জন্য দেশবাসী কৃষ্ণধনবাবুকে চিরকাল স্মরণ করবেন।

নীহারবিন্দু চৌধুরী

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পুস্তকাদির তালিকা (অসম্পূর্ণ)

১। গীতসূত্র সার (প্রথম ভাগ পরিশিষ্টসহ)।

২। গীতসূত্র সার (২য় ভাগ, ২য় খণ্ড)।

৩। সেতার শিক্ষা (তৃতীয় সংস্করণ)।

৪। সেতারের গৎ।

৫। হারমোনিয়াম শিক্ষা।

৬। চীনের ইতিহাস।

৭। হিন্দুস্থানী এয়ারস্ অ্যারেঞ্জ্‌ড্ ফর দি পিয়ানোফোর্তে।

৮। সঙ্গীত শিক্ষা।

৯। বঙ্গৈকতান।

১০। সেতারের অতিরিক্ত গৎ (পাশ্চাত্ত্য রেখা-স্বরলিপি সম্বলিত)

—o—

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

সঙ্গীতের উৎপত্তি

সঙ্গীত মনুষ্যজাতির প্রাচীনতম বিদ্যা। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে এবং পুরাণাদিতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া, তাহা তিনি ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তুম্বুরু, এই পাঁচ শিষ্যকে শিক্ষা দেন।* তন্মধ্যে ভরত মুনি দ্বারা পৃথিবীতে সঙ্গীত প্রচারিত হয়। ইহাতে আমাদের সঙ্গীতবিদ্যার অতি প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে, অর্থাৎ সঙ্গীত এত পুরাতন বিদ্যা যে, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তাহার আদি না পাওয়াতেই তাহা দেবাদিদেব মহাদেব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সকল পৌরাণিক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া ন্যায় ও যুক্তি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দেখা যাউক, সঙ্গীতের উৎপত্তি কিরূপ। ভারতীয় সঙ্গীতবেত্তা কাপ্তেন এ. উইলার্ড সাহেব† বলিয়াছেন যে, সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিৎ দার্শনিকগণ একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানবীয় ভাষারও পূর্ব্বে সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে। এই মতের পরিপোষণার্থ তিনি ডাক্তার বার্ণি-কৃত প্রসিদ্ধ 'সঙ্গীতের ইতিহাস' হইতে নিম্নলিখিত যুক্তি নিচয় নির্দ্দেশ করেন। "পৃথিবীতে মনুষ্যোদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠসঙ্গীত সমুদ্ভূত হইয়াছে। ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি মনের যাবতীয় আবেগ প্রকাশার্থে এক এক প্রকার দীর্ঘ স্বর স্বাভাবিকরূপে ব্যবহৃত হইত। চিত্তবিকার ব্যক্ত করিতে অধিক স্বরের প্রয়োজন হয় না, এবং সেই সকল আবেগসূচক স্বর মনুষ্য মাত্রেরই প্রায় একরূপ, কেবল বয়স, লিঙ্গ, এবং শারীরিক গঠনের বিভিন্নতায় স্বরের গম্ভীরতা ও তীব্রতার প্রভেদ হয় মাত্র। তৎপরে যখন দেশ ও সমাজের রীতি ভেদানুসারে কথার সৃষ্টি হয়, তখন ঐ

* "ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুম্বুরুমেবচ।
পঞ্চ শিষ্যাং স্বতোধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্বিধিঃ॥" নারদ সংহিতা।

† ইনি ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে এক উত্তম গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।

স্বাভাবিক স্বর ক্রমে অর্থশক্তিহীন ও নানা বাক্যে পরিণত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। এখনও ইতর প্রাণীদের মধ্যে ঐ স্বাভাবিক স্বর বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহা সকলেই বুঝিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যের এক এক কল্পিত ভাষা অতি অল্প স্থানেই প্রচলিত এবং তাহা বিশেষ আয়াস সহকারে লব্ধ হইয়া তাহাতে কথা বার্ত্তা হয়"। আরও, কল্পিত ভাষার কথাদ্বারা যাবতীয় আবেগ পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয় না; সুখ দুঃখ প্রকার ভেদে অসংখ্য; ভাষা সেই সকলের বিভিন্নতা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। একটি শব্দ অক্ষরযোগে শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়া তাহা সর্ব্বদা একই প্রকারে উচ্চারিত হয়; কিন্তু সেই উচ্চারণে যত প্রকার স্বরভঙ্গী প্রযুক্ত হয়, তাহার তত প্রকার অর্থ হয়। একটা 'হাঁ' কিম্বা 'না' এমনভাবে উচ্চারণ করা যায়, যে তাহাতে আদি অর্থের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বরভঙ্গীর বহুল বিচিত্রতাই সংগীত; উহা ভাষারও আত্মাস্বরূপ; উহা ব্যতিরেকে কোন শব্দেরই পরিষ্কার অর্থ হইতে পারে না।

সঙ্গীত যে আমাদের স্বভাবসম্ভূত, এবং আমাদের শারীরধর্ম্মের নিয়মানুগত, তাহা ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, যে আমরা কথা কহার স্বরকে কেমন অনায়াসেই পূর্ণস্বারিক (ডায়াটনিক) ধ্বনিতে পরিণত করিতে পারি। বালকেরা কেমন শিশুকাল হইতেই তাহাদের আনন্দের ভাষাকে তালে ও ছন্দে এক প্রকার পরিণত করিয়া লয়। এই অভ্যাস শৈশব হইতেই জগদ্ব্যাপ্ত। এই জন্য পৃথিবীস্থ সভ্যাসভ্য সকল ব্যক্তিরই সঙ্গীত দৃষ্ট হয়।

পক্ষী জাতির স্বরে সুন্দর পূর্ণস্বারিক ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকেই জানেন। বৌকথাক পাখী কোমল-গ-রি কোমল-গ-সা, এই প্রকার সুরে "বৌ কথা ক" বলে। কোকিল ধীরে ধীরে যে:কুহু রব করে, তাহাতে মিড় যুক্ত সা-রি-সা, কখন সা-গ-সা, কখন সা-ম-সা উচ্চারিত হয়; যে সময়ে দ্রুত কুহু কুহু করে, তখন সা-রি, রি-গ, এই প্রকার সুরে ডাকিতে ডাকিতে, কখন কখন প পর্য্যন্তও উঠে; ভয় পাইলে অষ্টম সুরেই ডাকিয়া উঠে। পশুর রবেও পূর্ণস্বারিক ধ্বনি পাওয়া যায়। ক্ষুধার্ত্তা হইলে বিড়ালী গৃহস্থের পায়ে পায়ে বেড়াইয়া যে সুরে ডাকে, তাহাতে সা-এর পর কোমল গ-এ অধিক জোর দিয়া সা-এ প্রত্যাগত হয়; তজ্জন্য সেই রবে কাকুতি মিনতির ভাব প্রকাশ পায়। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, সংগীত জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম। ইহার কারণানুসন্ধানে প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডারুইন মহোদয় বলিয়াছেন যে, যৌন নির্ব্বাচন (সেক্শুয়্যাল·সিলেক্শন্) দ্বারা জীবের স্বর ক্রমবিকাশ (ইভোল্যুসন) ক্রিয়া যোগে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রয়োজন নিবন্ধন সাঙ্গীতিক ধ্বনিতে পরিণত

হইয়াছে। বস্তুতঃ, যে সকল প্রাণী কণ্ঠস্বর দ্বারা স্ত্রীজাতির মনাকর্ষণ করে, তাহাদের মনোহর ধ্বনিরই বিশেষ প্রয়োজন। সেই ধ্বনি মানবীয় চর্চ্চা দ্বারা উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ-সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এমন জাতি নাই, যাহার সঙ্গীত নাই। এক এক জাতির সভ্যতার ও মানসিক উন্নতির তারতম্যানুসারে সংগীতেরও উৎকর্ষাপকর্ষ দেখা যায়। ভারতীয় সংগীত ভারতীয় সভ্যতার অনুরূপ, তেমনি ইউরোপীয় সংগীত ইউরোপীয় সভ্যতার অনুরূপ। পরিব্রাজকেরা বলেন যে, আমেরিকার এবং আফ্রিকার আদিম নিবাসিদিগের সংগীত এখনও যেন মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছে।

সাধারণ শিক্ষার উপর সঙ্গীতের ফল

"অনেকে বলেন যে, সঙ্গীতের উদ্দেশ্য কেবল আমোদ প্রমোদ। এই কথা নিতান্ত অপবিত্র ও অবাচ্য। সঙ্গীতকে আমোদ বলিয়া মনে করা ন্যায়ানুগত কার্য নহে। যে সঙ্গীতের অন্য উদ্দেশ্য নাই, তাহা অবশ্যই অপদার্থ এবং অশ্রদ্ধেয়।" প্রাচীন বুধশ্রেষ্ঠ প্লেটো ঐ রূপ বলিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানবান লোকমাত্রেরই ঐ প্রকার মত। অস্মদ্দেশে বহু লোকেরই তদ্বিপরীত সংস্কার, অর্থাৎ তাঁহারা সঙ্গীতকে কেবল আমোদেরই বিদ্যা মনে করিয়া অতিশয় তাচ্ছিল্য করেন। পরন্তু তাঁহাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সঙ্গীতের যেরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা, তাহাতে সঙ্গীতের উপর অন্যতর মত হওয়াই অসম্ভব। সঙ্গীত সর্ব্বদা সৎকাব্যের সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ থাকা উচিত, তাহা হইলে সেই সঙ্গীতদ্বারা অন্তঃকরণে উন্নত ভাবের সঞ্চার হইয়া, উচ্চতর সাধু প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে পারে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রকার সংগীত শিক্ষার আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ঐ সংগীতদ্বারা শারীরিক ও মানসিক, উভয়বিধ শিক্ষারই সাহায্য হয়। উহা দ্বারা

ঈশ্বরোপাসনা, সদাচারিতা ও রুচিবিজ্ঞান (ইস্থেটীক্স) সম্বন্ধে লোকের প্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিতা ও সবলা হয়। রুচিবিদ্যানুশীলনের প্রভাবে সংগীত, সাহিত্যোদ্যানের বাছা বাছা অনুপম পুষ্পমালা ধারণ পূর্ব্বক, কনিষ্ঠা সহোদরা চিত্রবিদ্যাকে সঙ্গে লইয়া. স্বভাব ও কল্পনা ক্ষেত্রে যাহা কিছু সুন্দর, সুমধুর, সমঞ্জস, পরিপাটীব্যবস্থাযুক্ত, ও সুপ্রকাণ্ড (সাব্‌লাইম্), সেই সকলের প্রতি আত্মাকে পক্ষপাতী হইতে উপদেশ করে, এবং তত্তদ্গুণগ্রাহিণী প্রবৃত্তিনিচয়কে বিকশিত করে। সদাচারিতা অর্থাৎ নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে সংগীত সৎকাব্যের সহিত মিলিয়া অপরিণতবুদ্ধি যুবকদিগের মনাকর্ষণ করতঃ তাহাদের প্রয়োজনীয় নীরস সদুপদেশ সমূহকে সুস্বাদু ও প্রীতিপদ করে। কোমলবুদ্ধি বালক বালিকাদিগকে কথায় বুঝাইয়া যে সকল সদুপদেশের প্রতি মনোযোগী করা যায় না, গানস্বরূপে সেই সকল শিখাইলে তাহারা সদানন্দ চিত্তে তাহাদের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়।

গান গাওয়া উপযুক্ত মত শিক্ষা করিতে হইলে পদ্যাবলিরও পরিষ্কার রূপ পাঠাভ্যাস প্রয়োজন হয় ও তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায্য ব্যবহার প্রযুক্ত উচ্চারণ শক্তিরও সমীচীন উন্নতি হয়। গানের তালাভ্যাস দ্বারা ছন্দের গূঢ় রহস্যের উপলব্ধি হয়, এবং বর্ণাদির লঘু গুরুত্বের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইয়া, উহাদের সদ্ব্যবহারদ্বারা চিত্তাকর্ষিণী বাক্‌শক্তি জন্মায়। গান গাওয়ায় এবং চেঁচাইয়া পাঠ করায় ফুস্‌ফুসের ও বক্ষস্থ পেশী সমূহের কার্য্য সুপরিচালিত হইয়া, তাহাদের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ (ষ্টাটিষ্টিক্স) দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে অন্যান্য ব্যবসায়াপেক্ষা প্রকাশ্য গায়ক ও বক্তার ব্যবসায় দীর্ঘায়ুর পক্ষে সানুকূল। এতদ্দেশে যে সুরাপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে, সংগীতানুশীলনে অবকাশ সময় ব্যয়িত হইতে থাকিলে, সুরাপানের ক্রমশঃ হ্রাস হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইতিহাসে প্রকাশ আছে যে, জর্ম্মনীয় লোকদিগের সংগীতপ্রিয়তা বৃদ্ধি হওয়াতে, তাহাদের অতিরিক্ত সুরাপান প্রথার তিরোভাব হইয়াছিল। সৎকাব্যের সহিত সংগীত সংযোজিত হইলে তদ্দ্বারা মানসিক উন্নতির যথেষ্ট স্থান পাওয়া যায়, কেননা তদনুশীলনে অনুচিকীর্ষা, অভিনিবেশ ও অনুধাবন শক্তি প্রতিভাত হয়, এবং নূতন নূতন রচনার গুণাগুণ সন্ধান জনিত বিচার ও চিন্তা শক্তির সমূহ উৎকর্ষতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সঙ্গীতের উপকার সকল সময়েই দেদীপ্যমান। অতএব, সম্ভব হইলে, সকল লোকেরই সঙ্গীত অভ্যাস করা উচিত। গান সঙ্গীতবিদ্যার মূল, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত জর্ম্মনীয় পণ্ডিত ডাক্তার মার্ক্স মহোদয় বলেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তিরই গান শিক্ষা করা উচিত। গান মানব প্রকৃতির অন্তর্জাত সংগীত ;

কণ্ঠ সেই সংগীতের স্বাভাবিক যন্ত্র—কেবল তাহাই নয়, কণ্ঠ অন্তরাত্মার সহবোধক সজীব ইন্দ্রিয়। চিত্তের সমস্ত বিকার ও উদ্বেগ কণ্ঠদ্বারা মূর্ত্তিমন্ত ও পরিব্যক্ত হয়, বাস্তবিক বাক্য এবং গান আমাদের আদি কাব্য, এবং বিহ্বল বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চিত্তেব চিবসঙ্গী। গান ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধন, অর্থাৎ এক এক জনের নিজ নিজ সম্পত্তি, যাহাতে অন্যে ভাগ বসাইতে পারে না।"

গানে লোক সামাজিক হয়, অতিশয় মুখচোরা লোকেরও সপ্রতিভতা বৃদ্ধি হইয়া তাহার সমাজেব ভয় তিবোহিত হইয়া যায। সৎ সমাজে গমনাগমনের অভ্যাস থাকিলে লোকেব যথেচ্ছাচাবিতা জন্মিতে পাবে না। আমাদের অনেক গায়কের কুচরিত্রতা দেখা যায বটে, কিন্তু তাহাব এক কাবণ আছে, আমাদের দেশে সুগায়কেব সংখ্যা অতি অল্প, যে দুই একজন সুগায়ক হন, তাহাবা সর্ব্ব সাধারণের যথেষ্ট আদর পাইয়া যথেচ্ছাচাবী হইয়া উঠেন, কেননা গানেব প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অতএব গায়ক সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই তাহাদের দুশ্চবিত্রতা কমিতে থাকিবে। উপাসকদিগেব দোষে উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য হানি হইতে পারে না। গানে জনসাধারণের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির বৃদ্ধি হয়, ভক্তি এবং উপাসনার গাম্ভীর্য্য ও প্রগাঢ়তা সম্পাদিত হয়, অবকাশ সময় ও পর্ব্বোৎসবাদি নির্দ্দোষ পবিত্রানন্দের মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে, জনসমাজ সজীবিত ও তৃপ্তিজনক হয়; আমাদের সমুদয় অস্তিত্ব সমুন্নত হয়, এবং লোকের যত গানপ্রিয়তা ও যত গায়ক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই আমাদের সুখানন্দের বৃদ্ধি হয়, অধিক কি— দশ বিশ জনে মিলিয়া গান গাওয়ার ন্যায় নির্ম্মল সুখ আর নাই।

গাইতে না পারিলে স্বরগ্রামের ও সুরের নানাবিধ সম্বন্ধের তাৎপর্য্য, রাগ রাগিণীর রস ও সৌন্দর্য্য, এবং স্বর রহস্যের যাবতীয় নিগূঢ়তা সম্যগুপলব্ধি হয় না। স্থূল কথায়, গাইতে না পারিলে, সঙ্গীতে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ কখনই হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে গানের চর্চ্চা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল দেশেরই জাতীয় গীত আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় গীত নাই। অপর সকল দেশেই ক্রিয়া কাণ্ড ও উৎসবোপলক্ষে পৈত্রিক রীত্যনুসাবে পাবিবাবিক গান প্রথা থাকাতে, সেই সকল দেশের লোকদিগের বাল্যকাল হইতেই গান গাওয়া অভ্যাস হয়। বাঙ্গালীর সে প্রথা নাই, সেইজন্য বাঙ্গালীর ন্যায় অসাঙ্গীতিক জাতিও কোথাও দৃষ্ট হয় না, এবং বাঙ্গালীর ন্যায় সংগীতে এত হতশ্রদ্ধা কাহারও নাই। এই জন্য আমাদের দেশে সংগীত ব্যবসায়ী লোকের এতাধিক দুরবস্থা। ইংলণ্ডে আইন কিম্বা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ মাসিক যত অর্থ উপার্জ্জন করে, সংগীত ব্যবসায়ীরা

অতোধিক করে। ভারতীয় লোকের এক আশ্চর্য্য সংস্কার এই যে, "সংগীত বিদ্যা আমীরের ও ফকিরের"। কিন্তু ইদানীং ঘোর সাংসারিক ইউরোপীয় লোকদিগের সংগীতপ্রিয়তার আতিশয্য দেখিয়া, এ কালের বাঙ্গালীর সংগীতে কিঞ্চিৎ আস্থা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা শিক্ষার কোন উপায় নাই।

সঙ্গীতালোচনার দুরবস্থা

আমাদের দেশে গান শিক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার; কারণ শিক্ষার কোন নিয়ম নাই, প্রণালী নাই, এবং শিক্ষা বিধায়ক সদুপদেশ সম্বলিত পুস্তকও নাই। গান শিক্ষার পুস্তক হইতে পারে,- ইহা ভারতীয় সংগীতবেত্তাদিগের বিশ্বাসই নাই। সর্বত্রই সংগীত ব্যবসায়ী ওস্তাদদিগের মুখ ভিন্ন গান শিক্ষার উপায়ান্তর নাই। ভাল ভাল ওস্তাদদিগের ঐ ব্যবসায় প্রায়ই পৈতৃক; তাঁহারা পৈতৃক বিদ্যা অপরকে সহসা দিতে ইচ্ছুক নহেন। তবে নিতান্ত পেটের দায়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা অন্যকে দেন বটে, কিন্তু মন খুলিয়া শিক্ষা না দেওয়াতে, শিক্ষা ভাল হয় না। সংগীত চর্চা বিস্তৃত হইয়া ক্রমে সংগীত কর্ত্তবের (প্র্যাকটিসের) উন্নতি হউক, এরূপ সহৃদয়তা সহকারে শিক্ষা দানে ব্রতী না হইলে কখনই শিক্ষা ভাল হয় না, এবং শিক্ষা প্রণালীরও উৎকর্ষতা হয় না। কিন্তু আমাদের ওস্তাদদিগের সহৃদয়তা মাত্রও নাই। যাঁহাদের সংগীত বিদ্যা গোপন রাখাই উদ্দেশ্য, তাঁহারা সংগীত শিক্ষার গ্রন্থ কি কারণ প্রস্তুত করিবেন? আবার. কাহারও সেই সহৃদয়তা থাকিলেও, বিদ্যাভাবে তাঁহার গ্রন্থ রচনার ক্ষমতা হয় না। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতে নানা প্রকার সংগীত গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কর্ত্তবের কোন উপদেশ ও সাহায্য পাওয়া যায় না। তাহা উপপত্তি (থিয়রি)-তেই পরিপূর্ণ; এবং ঐ সকল উপপত্তিও প্রায় ভ্রমসঙ্কুল দৃষ্ট হয়। এই সকল নানা কারণে লোকের বিশুদ্ধ সংগীত জ্ঞান নিতান্ত বিরল।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস, যে গান গাওয়া অতি দুর্লভ ক্ষমতা ও সেই ক্ষমতা উপার্জ্জন করাও অতিশয় কঠিন; ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা না হইলে কেহ শিক্ষা করিয়াও গায়ক হইতে পারে না; কারণ গান বিদ্যার যন্ত্র যে সুস্বর কণ্ঠ, তাহা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না; সেইজন্য অতি অল্প লোকেই সুগায়ক হয়। এই বিশ্বাস অতীব ভ্রান্তিমূলক। দয়াময় ঈশ্বর যেমন বাক্‌শক্তি সকলকেই দিয়াছেন, সেইরূপ গানোপযোগী কণ্ঠও সকলকে দিয়াছেন; এবং তদুপযোগী কানও দিয়াছেন। অতি অল্প লোকেই এরূপ কণ্ঠ পায়, যাহাতে সংগীত একেবারেই হয় না। ব্যক্তি মাত্রেই যেমন বল, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সম্ভবমত পরিমাণে প্রাপ্ত হয়, কেবল কোন কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি উহার কোনটা অনেকাপেক্ষা অধিক পায়, গান শক্তিও সেই রূপ। আমাদের দেশে গান শিক্ষার উপায় না থাকাতেই গায়কের সংখ্যা এত অল্প। গান শিক্ষা যদি বাল্যকাল হইতেই করা হয়, তাহা হইলে সকলেই সুগায়ক হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অধিক বয়সে গান শিক্ষা অতি দুরূহ ব্যাপার, কারণ তখন কণ্ঠের নমনীয়তার হ্রাস হওয়াতে, তাহা ইচ্ছামত ফিরাণ ঘুরাণ যায় না। আমাদের দেশে বালকের সংগীত শিক্ষা নিষিদ্ধ, সুতরাং অধিক বয়সে যিনিই গান শিখিতে যান, তিনিই অকৃতকার্য্য হন। আরো এক বিশেষ কারণ এই, ওস্তাদেরা গানে অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার চাপাইয়া তাহার নির্ম্মল মূর্ত্তিকে এমন বিকৃত ও বিকটাকার করিয়া তুলেন যে, তাহা দেখিয়া লোকে ভয় পায় ও হতাশ হয়। প্রচুর গমক্ গিট্‌কারী বিহীন, অথচ সুন্দর সুমধুর হিন্দুস্থানী রীতির গান প্রায় নাই। বিচিত্র কৌশলে রচিত, কারিগরীবিশিষ্ট (আর্টিষ্টিক) গানে অলঙ্কারের বিশেষ প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু নব্য শিক্ষার্থীদিগের প্রথমতঃ কিছু কাল শাদা সিধা গান অভ্যাস করাই উচিত। তাহা না করিয়া, কএক দিন সারগমের আরোহণাবরোহণ অভ্যাস করতঃ, একেবারে তানসেন-কৃত দরবারী কানাড়ার ধ্রুপদ, কিম্বা সদারঙ্গ-কৃত ইমন-কল্যাণের খেয়াল আরম্ভ করিয়া দেন। ইহাতে গান শিক্ষা যে কঠিন হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? সোপান দিয়া কলিকাতার মনুমেণ্টের দশগুণ উচ্চেও উঠা যায়। মনে কর, ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষার ইচ্ছায় যদি কেহ বর্ণপরিচয়ের প্রথম পুস্তক সাঙ্গ করিয়াই শেক্সপিয়ার বা মিল্টন পড়িতে আরম্ভ করে, তাহার যেমন কোন কালেই ইংরাজী শিক্ষা হয় না; আমাদের দেশে গান শিক্ষা সম্বন্ধে অবিকল ঐরূপ প্রথাই প্রচলিত। এই জন্যই লোকের এরূপ সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, গান শিক্ষা যাহার তাহার কার্য্য নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইউরোপে সংগীতালোচনার বিষয় অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, যে ঐ কথা সত্য কিনা। তথায় বাল্যকাল হইতে গান শিক্ষা করার রীতি প্রচলিত, সেইজন্য যেই শিক্ষা করিতে পায়, সেই

সুগায়ক হইয়া উঠে। আমাদের দেশে যাঁহারা সুগায়ক হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বাল্যকাল হইতে নিশ্চয় গানের চর্চ্চা করিয়াছেন। লেখক গলায় বয়সা ধরার পূর্ব্ব হইতেই গান শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক বয়সে গানের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া কেহই সুগায়ক হইতে পারে নাই, ইহা স্থির নিশ্চয়। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্ সময়ে গান শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত? বালকের লেখা পড়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই গানারম্ভ হওয়া উচিত, তাহা হইলে বয়স কালে প্রত্যেকেই উত্তম গায়ক হইয়া উঠে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাদের ভদ্র সমাজে সেরূপ প্রথা হওয়া অসম্ভব, কারণ লোকের সে রুচি নাই, শিক্ষার স্থান নাই, উপযুক্ত গুরু নাই, এবং অভ্যাস করিবার সামগ্রীও নাই, অর্থাৎ বালকের গাওয়ার উপযুক্ত গানও নাই। অতএব আমি এই পুস্তকে সে চেষ্টা পাই নাই, যাঁহারা কিছু কিছু গাইতে পারেন, তাঁহাদের চর্চ্চার উৎকর্ষতা বিধান জন্য এই পুস্তক রচিত হইল।

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত

ভারতবর্ষে সংগীত অনেক প্রকার, এবং তাহাদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন জনপদস্থ লোকের রুচি ও স্যভতার অনুযায়ী। ভারতে চারি প্রকার সংগীত প্রধান— হিন্দুস্থানী সংগীত, বাঙ্গালা সংগীত, মাহারাষ্ট্রীয় সংগীত, এবং কর্ণাটী সংগীত। এই কয় প্রকারের মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীত সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমখণ্ডে পঞ্জাব হইতে পাটনা পর্য্যন্ত প্রদেশকে হিন্দুস্থান বলে। হিন্দুস্থান ভারতীয় সভ্যতার আদি স্থান; অতএব এই স্থানে বহুকাল হইতে সংগীতের বহুবিধ চর্চ্চা হওয়াতেই, হিন্দুস্থানী সংগীতের সমধিক উন্নতি সাধন হইয়াছে। তানসেন, বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত গায়কগণের শিক্ষা হিন্দুস্থানেই হয়, এবং হিন্দুস্থানেই তাঁহারা কীর্ত্তি স্থাপন করেন। এই জন্য ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানী ওস্তাদের আদর অধিক; এবং হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকটে সকলে গান শিখিতে পছন্দ

করেন। ইদানীন্তন বঙ্গদেশে হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহাতিশয় হইয়াছে। অতএব হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ এই গ্রন্থ প্রণীত হইল।

অনেকের এই বিশ্বাস যে, হিন্দুস্থানে মুসলমানাধিকার হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দু সংগীতের যে উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমানদের আগমনের পর হইতে তাহার অবনতি হইয়াছে; সংগীতের বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থাবলি ঐ বাক্যের প্রমাণস্বরূপ নির্দ্দেশিত হয়। মুসলমানেরা ঐ সকল গ্রন্থের চর্চ্চা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ হিন্দুদিগের নিকট হইতেই সমস্ত হিন্দু সংগীত শিক্ষা করেন। পাঠান রাজত্বের এবং প্রথম মোগল রাজত্বের সময় প্রধান প্রধান গায়কগণ হিন্দু ছিলেন, অমর তানসেন প্রথমে হিন্দু ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করিলে, বাদশাহী দরবারে মুসলমান গায়ক ও বাদকের আদর ও প্রতিপত্তি হয়; তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রকারে হিন্দু সংগীত মুসলমানদিগের হস্তগত হয়, এবং তাঁহাদের দ্বারা, ও বাদশাহী উত্তেজনা ও উৎসাহ যোগে, সংগীতের অনেক উন্নতি ও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। উন্নতি হইলে প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়, অতএব প্রাচীন সংগীত হইতে আধুনিক সংগীত অনেক বিষয়ে যে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সংগীতের সংস্কৃত গ্রন্থসকলের মধ্যে কেবল উপপত্তি ভিন্ন, গান ও গত্ প্রভৃতি কর্ত্তবাংশের উদাহরণ কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বা আধুনিক, কোন্ সংগীত যে উত্তমতর, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। প্রাচীন কালের ব্যবসায়ী লোকে যে ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থের মতানুসারে সংগীত সাধনা করিত, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। এই পুস্তকের ১২শ পরিচ্ছেদে ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা হইয়াছে; তদ্দ্বারা সংগীত কুতূহলী পাঠকগণ উহাদের কার্য্যিক (প্রাক্‌টিক্যাল) উপযোগিতা কিরূপ, বুঝিতে পারিবেন। মুসলমান সম্রাটদিগের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। এই জন্য তৎকালে সংগীতের যে প্রকার চর্চ্চা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকালাপেক্ষা অধিক ব্যতীত অল্প নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উন্নতির প্রধান কারণ ও উত্তেজক; অতএব তাহারই প্রভাবে হিন্দুস্থানী লোকের সংগীত জ্ঞান, রচনা কৌশল, এবং কর্ত্তব শক্তি প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষতা হইয়াছে, কেননা নবাব পাদশারা ভূয়োভূয়ঃ উৎসাহ দানদ্বারা বহুকাল ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্রোত প্রবল রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে নূতন রাগ রাগিণীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, নূতন নূতন সংগীত যন্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার উন্নতির অনেক লক্ষণই দেখা যায়, কেবল সংগীতের দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুশীলন হয় নাই বলিয়া, সংগীতের অবনতি হওয়া স্বীকার্য্য

হইতে পারে না। ঐ সকল গ্রন্থের বর্ণিত ২২ প্রকার শ্রুতি, ২১ প্রকার মূর্চ্ছনা, ২৩ প্রকার গমক্, ৬৩ প্রকার বর্ণালঙ্কার, শত সহস্র প্রকার তান, ইত্যাদির কেবল নাম মাত্র শিখিয়া ওস্তাদদিগের কি উপকার হইত? কোন কোন গ্রন্থে ঐ সকল ঔপপত্তিকাংশের দুই একটা কার্য্যিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইলেও, ঐ সকল উপপত্তি প্রাচীন সংগীতেরই উপযোগী জন্য, আধুনিক সংগীতে ব্যবহার নাই। মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যে প্রকার সংগীত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হয়ত তখনই প্রাচীন সংগীত হইতে অনেক ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

শুনা যায়, যে দক্ষিণে কর্ণাট ও দ্রাবিড় প্রদেশে নাকি সংস্কৃত গ্রন্থানুসারে সংগীত চর্চ্চা হইয়া থাকে। দ্রাবিড়ী গায়কের গান কলিকাতার অনেকেই শুনিয়াছেন, হিন্দুস্থানী কায়দা অপেক্ষা দ্রাবিড়ী কায়দা কখনই উৎকৃষ্ট, কিম্বা তত্তুল্য মনোহর বলিয়াও বোধ হয় নাই। অতএব কেবল গ্রন্থ দেখিলেই হয় না। সংগীত সাধনা ও কর্ত্তবের বিদ্যা। যে গ্রন্থে কর্ত্তবের সম্যক্ উপদেশ ও সাহায্য পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থই বিশেষ উপকারী, এবং আমাদের তাহারই অভাব। নতুবা সংগীতের সংস্কৃত গ্রন্থের যখন অভাব নাই, সেই সকল গ্রন্থ কি আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করিয়া লওয়া যায় না? তবে আমরা উপযুক্ত সংগীত গ্রন্থের অভাব ভোগ করিতেছি কেন? প্রাচীন সংস্কৃত সংগীতগ্রন্থের মত ও রীতি অবলম্বনে বঙ্গভাষায় প্রথমতঃ 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ দ্বারা কয়টা লোকের সংগীত জ্ঞানের উন্নতি, এবং সাধনা ও কর্ত্তবের সাহায্য হইয়াছে? ইদানীন্তন ঐ প্রকার প্রাচীন সংস্কৃত মতাবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও ঐ প্রকার ফল হইয়াছে। ঐ প্রকার গ্রন্থ দ্বারা লোকের কেবল জেঠামী বৃদ্ধি হয় মাত্র; আসল বিষয়ে জ্ঞান লাভ কিছুই হয় না। আধুনিক হিন্দুস্থানী সংগীতের রীতি ও প্রকৃতি ভিন্ন প্রকার; সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আধুনিক সংগীতের নূতন ব্যাকরণ প্রস্তুত করার প্রয়োজন। সংগীত-কর্ত্তবের প্রকৃত সাহায্য হয়, এ প্রকার গ্রন্থ প্রণয়নের কৌশল এতদ্দেশীয় সংগীতবেত্তাগণ বিশেষ অবগত নহেন, কারণ ঐ প্রকার গ্রন্থ কখন অস্মদ্দেশে ছিল না। ইউরোপে ঐ প্রকার গ্রন্থ রচনা প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কারণ তথায় গ্রন্থ দৃষ্টে শিক্ষা ভিন্ন মৌখিক শিক্ষার রীতি নাই। কোন ইউরোপীয় ভাষার সংগীত গ্রন্থের পরামর্শ গ্রহণে আমাদের সঙ্গীত গ্রন্থ প্রস্তুত করিলে, অনায়াসেই ইচ্ছানুরূপ ফল লাভ হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মৎপ্রণীত 'সেতার শিক্ষা' নামক গ্রন্থে ইউরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করাতে, সেতার বাদন সহজ

করা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছি*। এই গ্রন্থেও উক্ত পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে; অতএব ইহাতেও ঐ প্রকার ফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।

সঙ্গীত-লিখন-প্রণালী

সংগীতের স্বর, তাল, গমক প্রভৃতি যে সঙ্কেতাক্ষর দ্বারা লিখিয়া প্রকাশ করা যায়, তাহাকে "স্বরলিপি" কহে। স্বরলিপি দুই প্রকার; 'সার্গম' স্বরলিপি, ও 'সাঙ্কেতিক'

* ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে এক জন সংস্কৃত শাস্ত্রবিশারদ, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থকার, এবং সঙ্গীতদক্ষ মহাত্মা যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

বিনয়পূর্ব্বং নিবেদনমেতৎ,

মহাশয়! আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু অদ্য চারি পাঁচ মাস হইল আমি আপনকার "সেতার শিক্ষা" গ্রন্থ একখানি আনাইয়াছি। ঐ গ্রন্থ আনাইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি সেতারের গত্ আমার শিক্ষিত ছিল; তন্নিমিত্ত গ্রন্থে কল্পিত সঙ্কেতগুলি বুঝিতে আমার কষ্ট হয় নাই। এক্ষণে আমি ঐ গ্রন্থের প্রায় ২৫, ৩০টী গত্ শিখিয়াছি। গ্রন্থে যে গত্গুলি লিখিত আছে তন্মধ্যে প্রায়ই উৎকৃষ্ট; বিশেষতঃ মজিদ খানি অর্থাৎ ঢিমা কাওআলীর গত্গুলি অতীব চমৎকার। লিখন প্রণালীও যত দূর বিশদ ও সুগম হইতে পারে তাহা হইয়াছে। আমার মতে আজি পর্য্যন্ত সঙ্গীত বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, আপনার গ্রন্থ সে সকলের অপেক্ষাই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতম ও নির্দ্দোষ। আমি সঙ্গীতসার, ঐক্যতানিকক্ষেত্রদীপিকা, মৃদঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও আনাইয়াছি ও দেখিয়াছি। সে গুলিতে গ্রন্থকারগণের উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা ও ভ্রান্তিই অধিক লক্ষিত হইল। তাহার প্রমাণার্থ দুই একটী স্থূল উদ্ধৃত করিলাম, দেখিবেন। * * * * * * * যাহা হউক সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা যখন ঐ গ্রন্থগুলির প্রশংসা করিয়াছেন, তখন মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিন্দা বা প্রশংসায় তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পরন্তু "ভারত সংস্কারকে" আপনার সেতার শিক্ষার নিন্দা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসার লোভে ব্যগ্র হইয়া তাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির নিকট সমালোচনার্থ পুস্তক খানি দিয়াছিলেন। সমালোচকের যোগ্যতা বিচার করেন নাই। যাহারা অগাধ ও নক্রাদিসঙ্কুল সাগরে মজ্জন করিয়া মুক্তা উত্তোলন করাকে লাভ বিবেচনা করে, অথবা কণ্টকাকীর্ণ কেতকীবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পুষ্পোচ্চয়নকে সম্পদ বলিয়া মানে, তাহারাই আপনকার গ্রন্থ সমালোচনার যোগ্য পাত্র। আমরা অনুরোধ করি যে, আপনি তাদৃশ লোককে আর ঐ গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রদান না করেন। মনে করুন ঐ পুস্তক খানি থাকিলে ৪টী টাকা আপনার থাকিত, সন্দেহ নাই; নিবেদনমিতি।

রাজারামপুর, দিনাজপুর; ২৬এ ভাদ্র ১২৮১। } (সহী) শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তিনঃ (তর্কচূড়ামণি)। (নিবাতকবচ বধ, কাব্যপেটিকা, প্রভৃতির গ্রন্থকর্ত্তা)।

স্বরলিপি। স র গ ম প্রভৃতি সুরের নামের আদ্যক্ষর যোগে যে স্বরলিপি লিখা যায়, তাহাকে সার্গম স্বরলিপি বলা যায়; এবং রেখা ও বিন্দু, কিম্বা অন্য কোন প্রকার সঙ্কেত যোগে যে স্বরলিপি লিখা যায়, তাহাকে সাঙ্কেতিক স্বরলিপি বলে।

ভারতবর্ষে স্বরলিপির ব্যবহার কখন ছিল না*, মুখে মুখেই চিরকাল সংগীত শিক্ষা হইতেছে, সেই জন্য ভারতীয় সংগীতবেত্তারা স্বরলিপির উপকার অবগত নহেন, স্বরলিপিদ্বারা সকল প্রকার গানের সুর তাল বিশুদ্ধরূপে লিখা যাইতে পারে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাসও করেন না। তাঁহারা বলেন যে, হিন্দু সংগীত অলিখনীয়, কারণ তাঁহারা এই আপত্তি করেন যে, স্বরলিপি দ্বারা গান যদি বিশুদ্ধরূপেই লিখা যাইতে পারে, তবে স্বরলিপি শিখিয়াই লোকে তদ্দৃষ্টে গান রীতিমত গাইতে পারে না কেন? অনেক কৃতবিদ্য লোকেও এই তর্কের ভ্রমজালে নিপতিত হন। স্বরলিপির সঙ্কেতাবলি চিনিতে ও তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই যে গান গাওয়ার ক্ষমতা জন্মে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। স্বরলিপি দেখিয়া দুই এক বৎসর নিরন্তর অভ্যাস করিলে, তবে লিপি দৃষ্টিমাত্র নূতন গান বিশুদ্ধরূপে গাওয়া সম্ভব হয়। অতএব স্বরলিপি প্রণালীর দোষ দেওয়া, কিম্বা সংগীত লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব মনেকরা, অজ্ঞতার ফল। লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এরূপ কেহই মনে করেন না যে, ভাষা লিখার সঙ্কেত—বর্ণমালা—এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু কেবল অক্ষর নির্ভরেই কি সব পাঠ

* অনেকের এরূপ সংস্কার যে, পুরাকালে স্বরলিপি প্রচলিত ছিল। এই সংস্কার অতীব ভ্রান্তি মূলক। স্বরলিপি প্রচলিত থাকিলে, কোন না কোন প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত পুস্তকে তাহার এক আধটা উদাহরণও পাওয়া যাইত। স্বরলিপি—এই কথাটাই আধুনিক। শার্ঙ্গদেব-কৃত 'সঙ্গীত রত্নাকর', সোমেশ্বর কৃত 'রাগবিবোধ', অহোবল-কৃত 'সঙ্গীত-পারিজাত', প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে স্বরলিপির ন্যায় যে সারগম† দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত স্বরলিপি নহে, কারণ তাহাতে সুরের বিভিন্ন স্থায়িত্বের, এবং আশ্, মিড, গমক প্রভৃতির, সংকেত দৃষ্ট হয় না, কেবল সুরের নাম-মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব তাহাকে কেবল সারগম† বলা যাইতে পারে, প্রকৃত স্বরলিপি ভিন্ন প্রকার। গোপাল নায়ক, তানসেন প্রভৃতি আধুনিক কালের বিখ্যাত পুরাতন গায়কগণ কেহই স্বরলিপি দৃষ্টে কখন সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই। সকলেই মুখে মুখে গান শিক্ষা করিয়াছেন, এবং হাত দেখিয়া যন্ত্র বাদন শিক্ষা করিয়াছেন। সুরের নামমাত্র ব্যবহার থাকিলেই স্বরলিপির ব্যবহার থাকা বলা যাইতে পারে না; তাহা হইলে সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই স্বরলিপির ব্যবহার আছে, বলিতে হয়, কেননা সকল সভ্য জাতির মধ্যেই সঙ্গীতের সুরের নাম প্রচলিত আছে, এবং যাহাদের ভাষার বর্ণমালা আছে, তাহারা ঐ সকল নাম লিখিয়াও থাকে। কিন্তু ইউরোপ ভিন্ন অন্য কোথাও প্রকৃত স্বরলিপির উদ্ভাবন হয় নাই, এবং অধুনা যে যে জাতি স্বরলিপি দৃষ্টে সঙ্গীতালোচনা করিতেছে, তাহারা সকলেই ইউরোপীয় স্বরলিপির ব্যবহার করিতেছে।

† ইংরাজীতে এইরূপ সারগম সাধনকে solfeggio বলে।

করা যায় ? কখনই নহে। বালকে নাটক পড়িতে পারে না ; বালক কেন, অস্মদ্দেশীয় ভদ্র সন্তানের মধ্যে অনেক বয়স্থ লোকেও নাটক পড়িতে পারেন না। তজ্জন্য যে অক্ষরে নাটক লিখিত হয়, তাহার দোষ কেহই দেন না ; সে পাঠকেরই দোষ ; কেননা যাঁহার সংস্কার ও অভ্যাস অধিক, তিনি অনায়াসেই পড়েন। অতএব সকল কার্য্যেই সাধনা ও সংস্কার, দুইএরই বিশেষ প্রয়োজন। ভাষার অর্থনির্বিশেষে অসংখ্য প্রকার উচ্চারণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বর্ণমালায় তাহার শতাংশের একাংশ সঙ্কেতও নাই। আর তাহা করাও অসম্ভব। তাহা করিলেও অক্ষরের জটিলতা দোষে কেহ কখন লিখিত ভাষা সহজে শিক্ষা করিতে পারিত না। অভ্যাস ও সংস্কার বলে সঙ্কেতের ঐ অভাব আপনা হইতেই পরিপূরিত হইয়া যায়। অনেক সাহেব ইংলণ্ড হইতে হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষা উত্তম শিক্ষা করিয়া আইসেন, কিন্তু প্রথমতঃ তাহার বাঙ্গলা ও হিন্দী কথা এ দেশীয় লোকে কেহই বুঝিতে পারে না। তাহাতে কেহ এরূপ সংশয় করে না, যে ঐ সকল ভাষা অলিখনীয়। পুস্তক দেখিয়া যেমন শিক্ষা করিতে হয়, তেমনি প্রথম প্রথম লোকের মুখেও সর্ব্বদা শুনিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কার শীঘ্রই জন্মে। ভাষার ন্যায় সঙ্গীতেরও অনেক কার্য্য সঙ্কেতদ্বারা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ইহাতেও সংস্কার ও অভ্যাস দ্বারা সেই সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়। ভাষাপেক্ষা সংগীত লিখা বরং সহজ, কেননা ইহা কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেরই অধীন। সেই নিয়মের অনুধাবন হইলেই, সংগীত লিখা যাইতে পারে। যাহারা সংগীত লিখার চর্চ্চা করে নাই, তাহাদের তদ্বিষয়ে অবিশ্বাস হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো যৎকালে আফ্রিকায় ভ্রমণ করেন, তাঁহার সঙ্গীয় এক বন্ধু তাঁহার কোন যন্ত্র লইয়া দূরে গিয়াছিলেন। সেই যন্ত্র প্রয়োজন হওয়াতে মার্কো পোলো তদ্বিষয়ে এক পত্র লিখিয়া, তাহা এক কাফ্রিকে দিয়া, দূরস্থ বন্ধুর নিকট পাঠাইলেন। বন্ধু সেই পত্র পাঠমাত্র যন্ত্র খানি বাহির করিয়া দিলেই, সেই কাফ্রি একবারে চমৎকৃত ও অবাক হইয়া গেল ; এবং তদবধি সেই গ্রামস্থ তাবৎ কাফ্রি মার্কো পোলো ও তাঁহার বন্ধুকে দেবতা বলিয়া মান্য ও ভক্তি করিয়াছিল। কাফ্রিরা লিখিতে পড়িতে জানিত না, সুতরাং তাহার উপকার অবগত ছিল না ; হঠাৎ তাহা দেখিয়া যে তাহারা চমৎকৃত হইবে, এবং বিদ্যাবান্ লোককে দেবশক্তিমন্ত মনে করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। অধুনা ভারতবর্ষে সংগীত সম্বন্ধেও অবিকল ঐ রূপ অবস্থা। ইদানীং যে দুই এক ব্যক্তি স্বরলিপি সহকারে গান সাধনা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের লিপি দৃষ্টিমাত্র নূতন নূতন গান গাওয়া যে ওস্তাদ দেখেন, তিনিই

আশ্চর্য্য হন। অতএব স্বরলিপি চর্চ্চা যাহাতে দেশময় ব্যাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। কোন্ স্বরলিপি সহজ ও উৎকৃষ্টতর, তাহার মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। যাহার যে লিপি সামনে পড়িবে, এক্ষণে তাহার তাহাই অভ্যাস করা উচিত। এই প্রকারে সংগীতনিপুণ ভদ্রলোক মাত্রেরই স্বরলিপির কার্য্যজ্ঞান বৃদ্ধি হইলে, ক্রমে পাঁচ প্রকার চর্চ্চা করিতে করিতে, কোন্ স্বরলিপি যে সহজ ও অধিকতর কার্য্যোপযোগী, তাহা লোকে আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে। এখন তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করা বৃথা; কারণ সাধারণে তাহার তাৎপর্য্য কখনই সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না। আমার মতে ইউরোপীয় সাঙ্কেতিক স্বরলিপি যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতম, তাহাব বিচার মৎপ্রণীত 'সেতার শিক্ষা' নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য।

গীতসূত্র সার

১ম পরিচ্ছেদ—কণ্ঠ মার্জ্জনা

কণ্ঠ অতীব চমৎকার ও অনুপম যন্ত্র। মনুষ্যকৃত কোন যন্ত্রই এ পর্য্যন্ত কণ্ঠের ন্যায় ক্ষমবান হইতে পাবে নাই, কখন যে পারিবে, তাহাও সম্ভব বোধ হয় না। প্রতি মূহূর্ত্তে কণ্ঠযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষ যত্ন ও অভিনিবেশ ব্যতীত ইহার ক্রিয়ারহস্য অবগত হইতে পারা যায় না, কেননা ইহার কার্য্য চাক্ষুষ হইবার উপায় নাই। ভারতবর্ষীয় গায়কগণ কণ্ঠ মার্জ্জনার সুনিয়ম ও সদুপায় এখনও জানিতে পারেন নাই। কি প্রণালীতে সাধনা করিলে স্বর সুমধুর ও সবল হয়, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম থাকে, তাহা প্রায়ই কেহ জানেন না। সেই জন্য অনেক গায়কেই, বিশেষতঃ কালাবঁত্, অর্থাৎ ওস্তাদী গায়কগণ, যথেষ্ট শ্রম কবিয়াও সর্ব্ব সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন না, এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, গায়কের বয়স কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই আর গানশক্তি তত থাকে না, ইহার বহু জীবিত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কণ্ঠ সম্বন্ধে লোকের আশ্চর্য্য ভ্রান্তি এখনও রহিয়াছে; কণ্ঠ পরিষ্কার হইবে বলিয়া গায়কেরা, ঘৃতাক্ত বস্ত্রখণ্ড পুনঃ পুনঃ গ্রাস করিয়া, তাহা বাহির করিয়া লয়; অধিক ঘৃত দিয়া খিচুড়ী খাইয়া, তাহা উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলে। তাহারা জানে না যে, গলদেশে দুইটী নালী, একটী অন্ননালী, যদ্দ্বারা খাদ্য উদরস্থ হয়, সেইটী ভিতর দিকে, অপরটী শ্বাসনালী, যদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, এটী সম্মুখের দিকে। এই শ্বাসনালী দিয়াই কথা ও গান উচ্চারণ হয়। যাঁহারা উপরোক্ত প্রকারে কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সকল কার্যই অন্ননালী দিয়া হয়, কিন্তু সে নালী দিয়া স্বরোচ্চারণ হয় না, সুতরাং তাঁহাদের সকল শ্রমই পণ্ড হয়। যে শ্বাসনালী দিয়া স্বর বাহির হয়, তন্মধ্যে বায়ু ভিন্ন কিছুই যায় না, যাইলে অত্যন্ত কাশি

হয়, যাহাকে "বিষম লাগা" বলে, কেবল বায়ু নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করে*। সেই বায়ুই কণ্ঠস্বরের কর্ত্তা। কণ্ঠ হইতে কি প্রকারে স্বরোৎপাদন হয়, তাহা গায়কেরা অনবগত থাকাতেই, স্বরের উৎকর্ষতা সম্পাদনের উপায় অবগত হইতে পারেন নাই। স্বরোৎপাদনের নিয়ম ক্রমে বর্ণিত হইতেছে †।

শ্বাসনালীর উপর প্রান্তে দুই খানি পাতলা ক্ষুদ্র ত্বক্ থাকে, তাহারা বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপাদন করে। ঐ ত্বক্ দুই খানিকে "বাক্-তন্তু" (ভোকাল কর্ডস্) নামে কহা যায়। ওহারা নলের মুখে সাম্‌না সাম্‌নি পড়িয়া থাকে। শব্দ করার ইচ্ছা হইলে, কণ্ঠস্থ পেশী দ্বারা বাক্ তন্তুদ্বয় উত্থিত হয়; তখন ফুস্‌ফুস্ নামক হৃদয়স্থ বায়ুকোষ হইতে বায়ু আসিয়া উহাদিগকে কম্পিত করিলে, ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অতএব ফুস্‌ফুস্ ও বাক্-তন্তু, এই দুই সামগ্রী কণ্ঠস্বরের মুল উপাদান। উহাদের যোগ্যাযোগ্য ব্যবহারেই স্বরের উৎকর্ষাপকর্ষতা হয়—মধুর ও কর্কশ হয়। ফুস্‌ফুস-যন্ত্র ভস্ত্রার ন্যায়, অর্থাৎ কামারের হাপরের ন্যায়। সর্দ্দী হইলে উহাতে শ্লেষ্মা জন্মে, তখন বায়ুর ব্যাঘাত ঘটিয়া স্বর বিকৃত হয়। অধিক চীৎকার করিলে, কিম্বা সর্দ্দী হইলে, কোমল বাক্-তন্তুদ্বয় স্ফীত হইয়া স্বরবিকার উৎপন্ন হয়। বাটীতে কোন ক্রিয়া কাণ্ড হইলে, কর্ম্মকর্ত্তার গলা অগ্রে ভাঙ্গিয়া যায় তাহারও কারণ এই :—অধিক চীৎকারে বাক্-তন্তু বায়ু কর্ত্তৃক অধিক আহত হইয়া স্ফীত হয়, তখন আর তাহা ভাল রূপে কম্পিত হইতে না পারাতে, স্বর-ভঙ্গ উপস্থিত হয়; এবং কখন অতিশয় ফুলিয়া একবারে কম্পিত হইতে না পারাতে স্বর বন্ধ হইয়া যায়। অতএব বাক্-তন্তু যাহাতে স্ফীত না হয়, এবং ফুস্‌ফুসে যাহাতে শ্লেষ্মা না জন্মায়, গায়কের সর্ব্বদা এই প্রকার সাবধানে থাকা উচিত।

কণ্ঠ স্বর দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও বাজখাঁই। স্বাভাবিক স্বর অধিক মিষ্ট ও সহজ-সাধ্য, বাজখাঁই স্বর আশু চটক্‌দার হয় বটে, কিন্তু তত মিষ্ট হয় না ‡। বাজখাঁই

* শ্বাসনালী দিয়া কোন পদার্থের অধোগতি হইলে, তাহা ফুস্‌ফুসে গিয়া পড়ে। কিন্তু ফুস্‌ফুস্ এমনি কোমল যন্ত্র যে, তাহাতে অন্য পদার্থ পড়িলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। অতএব ঐ বিপদ নিবারণার্থ স্বভাবের এমনি কৌশল যে, কণ্ঠনালী দিয়া বায়ু ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ যাইতে থাকিলেই, কাশি উপস্থিত হইয়া উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে—কখনই নামিতে দেয় না।

† এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য ডাক্তার কার্পেণ্টার ও মূলার কৃত 'শরীর বিধান' এবং ডাক্তার রাশ্ ও চার্লস লান্ কৃত কণ্ঠতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ইংরাজী শিক্ষিত সঙ্গীত ছাত্রদিগের পাঠ করা উচিত।

‡ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত 'সঙ্গীতসারে' লিখিত আছে "গলা চাপিয়া বাজখাঁই পদ্ধতিতে যে এক প্রকার গান করার প্রথা আছে, বাজ বাহাদুর সেই পদ্ধতির প্রণেতা। বাজ বাহাদুর ১৬০০ খৃঃ শতাব্দীতে মালওা প্রদেশে রাজ্য করিতেন।"

আওআজ কৃত্রিম সুতরাং অস্বাভাবিক, এবং তাহা আয়ত্ত করাও কঠিন; এই জন্য অনেকে বাহবা লইবার আশায় বাজখাঁই স্বর অভ্যাস করেন। কিন্তু কণ্ঠের মধুরতা নষ্ট করার পক্ষে বাজখাঁই বিশেষ পটু। হিন্দুস্থানের কালাবঁত্ গায়কেরা যে আওয়াজ গলায় সাধনা করেন তাহা সম্পূর্ণ বাজখাঁই না হইলেও তাহাকে অর্দ্ধ বাজখাঁই বলা যায়। স্বাভাবিক আওয়াজে অতি অল্প ওস্তাদেই গাইয়া থাকেন; এই জন্য ওস্তাদী গান সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জক হয় না, এবং ওস্তাদদিগের ঐ রূপ গলাও টেকে না। উহার কারণ, এবং বাজখাঁই ও স্বাভাবিক, উভয়বিধ স্বর কি রূপে উৎপন্ন হয়, তত্তাবদ্বিষয় নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

শ্বাসনালীর মুখদেশের নাম 'লারিংস'; তাহা বৃত্তের ন্যায় গোল। সেই বৃত্তের দুই দিকে, ভিন্ন স্থানে, বাক্-তন্তুদ্বয় একটীর সম্মুখে অপরটী অবস্থিতি করে। ইহারা বায়ুর প্রতিঘাতে সমস্বরে ধ্বনিত হয়; এবং ইহারা পেশী দ্বারা সঙ্কর্ষিত হইলে ধ্বনি উচ্চ হয়, ও ঢিল পড়িয়া স্থূলীকৃত হইলে, ধ্বনি গম্ভীর হয়। সেই সকল ধ্বনি মুখগহ্বরের স্থানে স্থানে, যথা—তালুতে, গণ্ডে, দন্তে, প্রতিধ্বনিত হইয়া, প্রবলতা ধারণ করত নির্গত হয়। মুখগহ্বরের তারতম্যে স্বরেরও তারতম্য হয়। যাহার মুখগহ্বরের স্বর অনিয়মিতরূপে প্রতিধ্বনিত হয়, তাহার স্বর সুললিত হয় না। বাক্-তন্তু দ্বয় স্বতন্ত্র কম্পিত হইলে, অর্থাৎ কম্পনের সময় কেহ কাহাকে স্পর্শ না করিলে, স্বাভাবিক স্বর নির্গত হয়। বাজখাঁই স্বর উচ্চারণ কালে গলা চাপিয়া লারিংসের বৃত্তাকার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অণ্ডাকার করিতে হয়, তখন বাক্-তন্তুদ্বয় পরস্পর নিকটস্থ ও কম্পন কালে ঠেকা ঠেকি হইয়া, একটীতে অপরটী আহত হয়; এই রূপে যে চেরা ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই বাজখাঁই। বাক্-তন্তুদ্বয় ঐ প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে স্ফীত হইয়া তখন আর উচ্চ ধ্বনি নির্গত করিতে পারে না; এই জন্য বাজখাঁই গলা অধিক চড়ে না। বাক্-তন্তু ফুলিয়া মোটা হইয়া খাদ স্বর অনায়াসে উৎপন্ন করে; এই হেতু কালাবঁত্ গায়কেরা খাদে গাইতেই বিশেষ পটু। বাক্-তন্তু উল্লিখিত রূপে আঘাত পাইয়া ফুলিয়া যাওয়াতে ক্রমে তাহার স্বরোৎপাদন শক্তির হ্রাস হয়; এই কারণে ওস্তাদী গায়কেরা বেশী বয়সে আর কণ্ঠস্ফূর্ত্তি পান না।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বাজখাঁই আওআজের যদি এতই দোষ, তবে ওস্তাদেরা কষ্ট করিয়া উহা সাধনা করেন কেন? ইহার কারণ প্রাচীন প্রথা ও অভ্যাস; অভ্যাসে দোষ গুণের বিচার থাকে না, মন্দও ভাল বলিয়া বোধ হয়। ঐ প্রথা হওয়ার কারণ এই, তাম্বুরা যন্ত্রের যে ধ্বনি, তাহা বাজখাঁই আওআজের

ন্যায়। ঐ যন্ত্রের সওআরীর উপর সূতা দিয়া যে জোআরী করা হয়, তাহাতেই তারের বাজর্থাই ধ্বনি হয়। ঐ সূতা তারে লাগাইয়া সওআরীর উপর টানিয়া ক্রমে এমন স্থানে দিতে হয়, যে খানে রাখিলে তার কম্পনের সময় সওআরীর উপর ক্রমাগত আহত হইতে থাকে, তাহা হইলেই এক প্রকার চেরা ঝাঁজী আওয়াজ উৎপন্ন হয়; সেই জোআরী করা আওআজই বাজর্থাই আওআজ। তাম্বুরা যন্ত্র যে প্রকারে নির্ম্মিত, তাহাতে তারের স্বাভাবিক ধ্বনি তত প্রবল না হওয়াতেই, উক্ত প্রকারে জোআরী দিয়া তাম্বুরার ধ্বনি প্রবল করা হয়। ওস্তাদেরা চিরকাল তাম্বুরা লইয়া গান করিয়া থাকেন; সুতরাং উহার জোআরীকৃত আওআজের সহিত গলার আওআজ মিল করিবার জন্য কণ্ঠস্বরেও তাঁহারা জোআরী দেন, তাহাতেই বাজর্থাই আওআজ হয়। কণ্ঠে কি প্রকারে জোআরী হয়, তাহার প্রক্রিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বাক্-তন্তুদ্বয় পরস্পর ঠেকা ঠেকি হইয়া কম্পিত হইলে জোআরী হয়। ওস্তাদী গায়কেরা যন্ত্র ভিন্ন যে গাইতে ইচ্ছা করেন না, তাহা সকলেই জানেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা জোআরী করা আওআজে গান গাওয়া অভ্যাস করাতে, শাদা গলায় ভাল গাইতে পারেন না; তাম্বুরার সাহায্য ব্যতীত গলায় জোআরী সুবিধা মত আইসে না, আসিলেও তত পরিষ্কার হয় না; তাম্বুরার জোআরীকৃত ধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাইলে কণ্ঠে জোআরী পরিষ্কার হয়, এবং যন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎ সুশ্রাব্য হয়।

বহু কাল হইতে তাম্বুরা লইয়া গান করার প্রথা বদ্ধমূল হওয়াতে, এবং তাম্বুরা ব্যতীত গানের সাহায্যকারী অন্য উত্তমতর যন্ত্র না থাকাতে, ওস্তাদেরা তাম্বুরার অনুরোধে কণ্ঠস্বরেও জোআরী করিয়াই বাজর্থাই ধরণ সাধনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাম্বুরা যন্ত্রই যত অনিষ্টের মূল; অতএব উহার সহিত আওআজ সাধা কখনই উচিত নয়। সাধনা দ্বারা কণ্ঠস্বর মিষ্ট করিতে হইলে, হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রের * সহিত সাধিয়া উহারই আওআজ কণ্ঠে অনুকরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, তাহা হইলে কণ্ঠ অতিশয় সুমধুর হইবে। কিন্তু হার্ম্মোনিয়ম

* গ্রন্থকার যে হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রের কথা মনে রাখিয়া উহার সহিত গলা মিলাইয়া স্বর অভ্যাস করিবার কথা বলিয়াছেন তাহা অধুনা প্রচলিত হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্র নহে, যে সময়ে এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮৮৫) সেই সময়কার বিদেশে প্রস্তুত অতীব সুরেলা উৎকৃষ্ট হার্ম্মোনিয়মকেই তিনি বুঝাইয়াছেন। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে তাম্বুরার ন্যায় জোআরীর দোষ না থাকিতে পারে কিন্তু এখনকার কালের বাজার চলতি হার্ম্মোনিয়মের একটা প্রধান ত্রুটী এই যে, উহাতে সূক্ষ্ম সুরান্তর অর্থাৎ 'শ্রুতির' বিশেষ কোন অবকাশ নাই। হার্ম্মোনিয়মের পর্দ্দাগুলি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বাঁধা থাকায় প্রতি সপ্তকাভ্যন্তরে যে বাইশ শ্রুতির আরোহাবরোহ ক্রম রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট করিবার সুযোগ ইহাতে নাই। হার্ম্মোনিয়মের সাহায্যে গলা সাধিবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখিলে ভাল হয়। —সম্পাদক।

কিছু মূল্যবান যন্ত্র; সকলের আয়ত্তাধীন নহে। এস্রার, বেয়ালা, সারঙ্গী, উহাদের সহিতও আওয়াজ সাধিলে কণ্ঠ সুললিত হইতে পারে। কিন্তু তাম্বুরা অতি অনায়াস-লভ্য যন্ত্র; সকলেই কিনিতে পারে। অতএব তাহার সহিত কণ্ঠ সাধন করিতে হইলে এই উপদেশ গ্রহণ করা উচিত যে, তাহাতে জোআরী না দিয়া, তাহার স্বাভাবিক ধ্বনির সহিত স্বর সাধনা করিবে; তাহা হইলে কণ্ঠে জোআরী জন্মিবে না। তাম্বুরায় যথেষ্ট জোআরী দিয়া, অথচ তাহার সহিত স্বাভাবিক কণ্ঠে গান সাধা প্রায়ই সম্ভব হয় না। সর্ব্বদা জোআরীর অনুষঙ্গী হইলে, কণ্ঠে জোআরীর অনুকরণ নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; কারণ কর্ণ সর্ব্বদা যাহা শুনে অর্থাৎ কাণের কাছে যে রূপ আওয়াজ অনবরত ধ্বনিত হয়, কণ্ঠ তাহা অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারে না, শারীর অনুকৃতির বল রোধ করা দুঃসাধ্য। তয়ফাওয়ালী বাইগণেরা সর্ব্বদা সারঙ্গীর সহিত গান গাওয়াতে, তাহাদের কণ্ঠ স্বরও ঐ যন্ত্রের ন্যায় সুমিষ্ট হয়। যাঁহার কণ্ঠে স্বাভাবিক আওআজ উত্তম প্রস্তুত হইয়া উহাতেই গাওয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তিনি তাম্বুরার জোআরীকৃত ধ্বনির সহিত গাইয়া কণ্ঠ অবিকৃত রাখিতে পারেন।

তাম্বুরার সহিত উচ্চ সুরে গাওয়া অভ্যাস করিলে, গলায় জোআরী হইতে পায় না; কেননা, পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে, বাজর্থাই স্বর কখনই চড়ে না; অধিক চড়াইতে হইলে জোআরী একেবারে ত্যাগ করিতে হয়। সুবিখ্যাত খেয়ালী মৃত আহম্মদ্ খাঁ অতি উচ্চ কণ্ঠে গাইতেন, এই জন্য তাঁহার কণ্ঠে জোআরী ছিল না, এবং অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার গলায় জোর ছিল। তিনি আন্দাজ ৮০ বৎসর বয়সের সময় লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠের মধুরতার বিষয় অনেকেই জানেন; উহা দেশ বিখ্যাত।

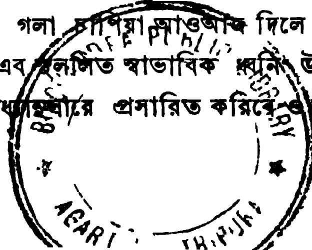
কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে উক্ত সিদ্ধান্ত আমার "অনুভব চিকিৎসা" নহে; আমি নিজে ভুক্তভোগী। জোয়ারী করা ও স্বাভাবিক, উভয়বিধ স্বরই সাধনাদ্বারা তারতম্য বুঝিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এবং বহুতর জীবিত গায়কের কণ্ঠস্বরের অবস্থা পরিদর্শন পূর্ব্বক ঐ সিদ্ধান্ত প্রমাণীকৃত করা হইয়াছে। কুসংস্কার, কদভ্যাস ও অজ্ঞতা বশতঃ অনেক গায়কে ঐ মতের পোষকতা না করিতে পারেন। কিন্তু নানা প্রকার সাধনা করিতে করিতে ক্রমে ঐ কথা যে সকলের বিশ্বাস হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ভারতীয় কারিগরগণের সমধিক শিল্পনৈপুণ্য না থাকাতে, এ প্রকার তাম্বুরা যন্ত্র প্রস্তুত হয় নাই, যাহাতে জোআরী না দিয়া স্বাভাবিক তারে সুন্দর সবল ধ্বনি

উৎপন্ন হয়। আমাদের সেতার যন্ত্রেও জোআরী আছে; কেবল ছড় বিশিষ্ট যন্ত্রে জোআরী নাই। অতএব ছড়বিশিষ্ট যন্ত্রই গানের সাহায্যার্থ বিশেষ উপযোগী। অনেকের এরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে, তার যন্ত্রে জোআরী ব্যতীত উত্তম বোলন্দ, অর্থাৎ সবল, ধ্বনি উৎপন্ন হইতে পারে না; কিন্তু পিয়ানোফোর্ট যন্ত্র দেখিলে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইতে পারে। উহা তার বিশিষ্ট যন্ত্র, অথচ জোআরী ন'ই; উহার ধ্বনি যেমন প্রবল, তেমনি সুললিত। বংশীর ধ্বনি অতিশয় সুমধুর, সকলেই জানেন; তাহাতে জোআরী নাই, খোলা আওআজ। পিয়ানো ও হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রের উচ্চ স্বরগুলি অবিকল বংশীর ন্যায়। বংশীর স্বর অতি উচ্চ; এই প্রকৃতির সুললিত খাদ স্বর ইউরোপীয় কর্ণেট, ট্রম্বোন, বাস্ ক্লারিনেট প্রভৃতি যন্ত্রে নির্গত হয়; ইহারা সকলেই বায়বীয় যন্ত্র ফুৎকার দ্বারা ধ্বনিত হয়। অতএব বায়বীয় যন্ত্রেই যথার্থ সুললিত সাঙ্গীতিক ধ্বনির উত্তম আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রের খাদ স্বর গুলিও ঐ সকল যন্ত্রধ্বনির অবিকল অনুরূপ। ইদানীং আমাদের দেশের অনেক লোকে হার্ম্মোনিয়ম ব্যবহার কবিতেছেন। মনে কর, যদি কাহারও হার্ম্মোনিয়মের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়, তাহার গান যে কি পর্য্যন্ত মধুর ও মনোহর হয়, তাহা কি আর বুঝাইবার প্রয়োজন করে? যে ফিকিরে হার্ম্মোনিয়মের ধ্বনি উৎপন্ন হয়, কণ্ঠেও অবিকল সেই কৌশল, কোন বিভিন্নতা নাই। উক্ত যন্ত্রে বায়ুদ্বারা পিত্তলখণ্ড কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপন্ন হয়; কণ্ঠে বায়ুদ্বারা মাংসখণ্ড কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অতএব কণ্ঠস্বর হার্ম্মোনিয়মের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করা, গান শিক্ষার্থীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইউরোপের ভাল ভাল অপেরা গায়ক ও গায়িকাদিগের কণ্ঠস্বর অবিকল ঐ প্রকার।

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হইলেও, যথেচ্ছামত স্বরোচ্চারণ করিলে তাহা মিষ্ট হয় না। কোন কোন কণ্ঠ সুশিক্ষা ও সুসাধনা ব্যতীতও সুমধুর হয় বটে; কিন্তু সে দৈবাৎ কখন উৎরাইয়া যায়। প্রত্যুত ধ্বনিবিজ্ঞান ও পদার্থতত্ত্ববিৎ সুনিপুণ কারিগরের নির্ম্মিত প্রত্যেক যন্ত্রই যেমন সুললিত ধ্বনি বিশিষ্ট হয়; প্রত্যেক গায়কেরও সেই রূপ মিষ্ট স্বর হওয়া উচিত। কোন সুললিত মনোহর ধ্বনি আদর্শ স্বরূপ লইয়া তদনুকরণের চেষ্টায় সাধনা করিলেই কণ্ঠস্বর মিষ্ট হইতে পারে; তাম্বুরার ধ্বনি সে আদর্শ নহে। কণ্ঠে সুস্বর উৎপাদনের নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গলা চাপিয়া আওআজ দিলে জোআরীকৃত বাজখাই ধরণের ধ্বনি নির্গত হয়। অতএব সুললিত স্বাভাবিক ধ্বনি উৎপন্ন করিতে হইলে, গলায় চাপ না দিয়া কণ্ঠ সাধ্যানুসারে প্রসারিত করিবে ও তখন জিহ্বার মূল দেশ



Rs- 20.00

সম্পূর্ণ নামাইয়া রাখিবে। জিহ্বা যত উত্তোলিত ও বহির্গত হইবে, ততই আওয়াজের জোর ও মাধুর্য্য কমিয়া যাইবে। তাহার দৃষ্টান্ত—জিহ্বা বাহির করিয়া আওয়াজ দিলে স্বর কেমন বিকৃত হয়, তাহা জানা যায়। অতএব জিহ্বা ভিতরে রাখিয়া তাহার মূলদেশ যত চাপিয়া রাখিবে এবং শ্বাসনালীর মুখদেশ যত বিস্তার করিয়া খুলিয়া দিবে, ততই পরিষ্কার, সুললিত ও বোলন্দ স্বর নির্গত হইবে। গানের কথোচ্চারণে কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ সঞ্চালিত হইবে। বাক্-তন্তুতে বায়ুর প্রতিঘাত অল্প হইলে স্বর ক্ষীণ অর্থাৎ মৃদু হয় ও প্রতিঘাত অধিক হইলে স্বর প্রবল হয়। বায়ু প্রয়োগের অল্পাধিক্যে প্রতিঘাতেরও অল্পাধিক্য হইয়া স্বর মৃদু ও সবল হয়। অতএব ফুস্‌ফুস হইতে ঐ বায়ু প্রয়োগের ন্যূনাতিরেক এরূপ অভ্যাস করিতে হইবে যে, প্রয়োজনানুসারে ধ্বনি ছোট বড করা যায়। কাণকথার ন্যায় অতি ক্ষীণ ধ্বনি হইতে অতীব প্রবল ধ্বনি পর্য্যন্ত উচ্চারণের অভ্যাস রাখিতে হইবে। গাইবার সময় সর্ব্বদাই নিশ্বাস পেট ভরিয়া টানিয়া লইবে, অধিক দম রাখার অভ্যাস না হইলে গাওনা উত্তম হয় না। হৃদয় ভরিয়া বায়ু লইয়া তাহা ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন মত কখন অধিক, কখন অল্প করিয়া ছাড়িতে হয়। কিন্তু সেই বায়ু এ প্রকারে নির্গত হইবে, যেন মুখে হাত দিলে গানের সময় হস্তে বায়ু অনুভূত না হয়। মুখ যথেষ্ট ব্যাদিত হইয়া ঈষদ্ধাস্য ভাবে থাকিবে। মুখের অবস্থার তারতম্যে স্বরের বিশেষ তারতম্য হয়; অতএব মুখের ভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হওয়া উচিত। মুখভঙ্গীর ইতর বিশেষে শব্দার্থের ইতর বিশেষ হয়, ইহা সকলেই জানেন। মানব কণ্ঠ নিঃসৃত এমন কোন ধ্বনিই নাই, যাহা মুখ দ্বারা গঠিত ও অনুশাসিত হইবার প্রয়োজন না হয়। অন্যান্য অঙ্গের মুদ্রাদোষ তত হানিজনক নহে; কিন্তু মুখের মুদ্রাদোষ নিতান্ত অসহনীয়, এবং তাহা গানের যে কতদূর হানি করে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতীয় ওস্তাদী গায়কদিগের প্রায়ই মুখের মুদ্রাদোষ অধিক, এবং তাঁহাদের অবোধ শিষ্যগণ গুরুর ঐ মুদ্রাদোষ পর্য্যন্তও অনুকরণ করিতে চেষ্টিত হয়। উপরে একটী উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছি, গাইবার সময় অন্তরস্থ বায়ু যেন নাসারন্ধ্র দিয়া কখনই নির্গত করা না হয়, তাহা করিলে স্বর সানুনাসিক অর্থাৎ নাকি হইয়া যাইবে; এটী বড় দোষ, ইহার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

ভারতবর্ষীয় গায়কগণ গানারম্ভের সময় গলা পরিষ্কারের জন্য প্রায়ই কাসেন, এবং শ্লেষ্মা তোলেন; এটা অতীব কদভ্যাস। তাঁহাদের কণ্ঠ প্রস্তুত করার দোষেই সহজে পরিষ্কার ধ্বনি নির্গত হয় না, ইহা না বুঝিয়া মনে করেন গলায় শ্লেষ্মা

জমিয়াছে। সর্দ্দী না হইলে সহজ শরীরে কখনই গলায় শ্লেষ্মা জমে না; তবে সর্ব্বদা শ্লেষ্মা তোলা অভ্যাস করিলে, তাহা যোগাইয়া থাকে। জোআরী করা কণ্ঠের ঐ দোষ অপরিহার্য্য। জিহ্বার মূল নামাইয়া কণ্ঠ সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গান করিলে কাসি হয় না, এবং শ্লেষ্মা তোলারও প্রয়োজন হয় না। কণ্ঠ গান গাইবার যন্ত্র বটে, কিন্তু অমার্জ্জিত অবস্থায় নহে; উহাতে যন্ত্রের উপাদান সকল বর্ত্তমান আছে মাত্র। সেই উপাদানসমূহ দ্বারা একটী উপযুক্ত সংগীত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইলে, তবে উত্তম গান হয়।

সুবিখ্যাত ইতালীয় গায়ক, গান শিক্ষক ও সঙ্গীত গ্রন্থকার মানুএল্ গার্ষিয়া কৃত গান শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ হইতে কণ্ঠ সাধনা ও স্বর রক্ষা সম্বন্ধে কএকটী উপদেশ, শিক্ষার্থীগণের ব্যবহারার্থ সংগৃহীত হইয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

"সকল দোষের মধ্যে অতিশয় সাধনা অতীব হানিজনক। অতিভোজন ও অতি-মাদকসেবন যেমন বাগিন্দ্রিয়ের অনিষ্ট কারক, অত্যুচ্চৈস্বরে হাক ডাক দেওয়া, চীৎকার করা, দীর্ঘ কাল সবলে কলহ করা, এবং প্রবল রবে বক্তৃতা দেওয়া, স্থূল কথায়, কোন প্রকার সোর সরাবৎ করা কণ্ঠস্বরের তেমনি হানিকর। নিরন্তর অতি উচ্চ স্বর সকল সাধনা করা যেমন নিষিদ্ধ, খাদ সুরে অনবরত সাধনা করাও তেমনি নিষিদ্ধ।"

"যন্ত্রী মনে করিলেই যেমন তাহার যন্ত্র পুনঃ পুনঃ লইয়া অভ্যাস করিতে পারে, গায়ক কণ্ঠযন্ত্র সে রূপ ব্যবহার করিতে পারিলে, সুদক্ষতা লাভ করা তাদৃশ কঠিন কার্য্য হইত না। বেয়ালা কিম্বা পিয়ানো বাদক সুপ্রণালী সহকারে প্রতি দিন ৬ কিম্বা ৭ ঘণ্টা করিয়া অভ্যাস করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পাবে। কিন্তু কোমল কণ্ঠযন্ত্র তাদৃশ কঠোর সাধনা সহ্য করিতে অক্ষম; এই জন্য সাধনার নিয়ম সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া অতীব আবশ্যক।"

"প্রথম প্রথম গান শিক্ষার্থী একাদিক্রমে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত সাধনা করিবে, এবং এই প্রকার ক্ষণিক অভ্যাস দিনের মধ্যে চারি পাঁচ বার করিবে; তৎপরে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সময় বাড়াইয়া সিকি ঘণ্টা পর্য্যন্ত অভ্যাস করা যাইতে পারিবে, এবং তৎপরে যখন ভাল বিষয় শিক্ষা হইবে, তখন ক্রমশঃ ঐরূপ করিয়া প্রতিদিন অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চারিবার সাধনা করিবে; ইহার অতিরিক্ত হওয়া বিধেয় নহে, এবং ঐ প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রামের সময় দিতে হইবে।"

"আহারের অব্যবহিত পরেই সাধনা করা এবং উপবাস জনিত দুর্ব্বলাবস্থায় গাইতে চেষ্টা করা, অতি অন্যায়।"

"কোন আবদ্ধ কিম্বা ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে গাওয়া হিতকর নহে, কারণ তথায় আওআজ মিইয়া যায়, ও সন্তোষজনক বোলন্দ আওআজ বাহির করার জন্য অতিরিক্ত শ্রম করিতে হয়।"

"সর্ব্বদা দর্পণের সম্মুখে গায়কের গাওয়া উচিত, তাহা হইলে মুখের, চক্ষের, ভ্রূর ও কপালের মুদ্রাদোষ সকল, ও অঙ্গের কোনরূপ কদর্য্য ভঙ্গী, নিবারিত হইতে পারিবে।"

"সকল সাধনা পূরা আওআজে হইবে, কিন্তু অতিশয় সবলে নহে। আবার অতি নরম করিয়া হীন স্বরে সাধনা করাও দোষ, কেননা তাহাতে আলস্য ও অপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, যাহা নিপুণতা ও পরিপক্বতা লাভের বিশেষ বিরোধী। সাধনার প্রারম্ভেই ফুস্ফুস্ ধীরে ধীরে স্ফীত করিয়া লইবে, তাহা হইলে গাইবার সময় হেচ্‌কী দিয়া শ্বাস লইতে হইবে না, কারণ ফুস্ফুস্ একবার বায়ু দ্বারা পরিপূরিত হইলে, পরে অল্প চেষ্টাতেই তাহার পূরা সামর্থ্য সংরক্ষিত হয়।"

"স্বরের সৌন্দর্য্যের শতাংশের নিরানব্বই অংশ গায়কের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, যে অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত কণ্ঠের অনেক দোষ; অতএব কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করিতে গুরূপদেশ বিশেষ প্রয়োজনীয়, নতুবা আপনি স্বর উত্তম হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে।"

"মুখ অবনত করিয়া সাধনা করা অতিশয় নিষিদ্ধ; মস্তক খাড়া করিয়া ও স্কন্ধদেশ পশ্চাদ্ভাগে সরাইয়া গান সাধিবে। মুখ গানের স্বর-নির্গমনের একমাত্র পথ; সেই পথ জিহ্বা, দন্ত কিম্বা ওষ্ঠদ্বারা যেন রুদ্ধ না হয়।"

"মুখের ভাবের উপর স্বরের তারতম্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মুখ ডিম্বাকার করিলে, শোকসূচক ক্ষুণ্ণ স্বর নির্গত হয়। ওষ্ঠদ্বয় বাড়াইলে, কুকুরে আওয়াজ উৎপন্ন হয়। মুখ অতিশয় ব্যাদান করিলে, স্বর কর্কশ ও কঠোর হয়। দন্তে দন্তে স্পর্শ করাইয়া গাইলে, পাত্‌লা খন্‌খনে আওয়াজ হয়। প্রত্যুত মুখের কেবল একটী ভাব আছে, যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ; অর্থাৎ স্বাভাবিক রূপে ঈষৎ হাস্য মুখ করিলে ওষ্ঠদ্বয় যেমন দন্তপংক্তিদ্বয়ের সম্মুখে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে থাকে, মুখের ভাবটী সেই রূপ রাখিতে হইবে; তাহাতে দন্তের উপর পাঁতি হইতে নিম্ন পাঁতি যথেষ্ট পৃথক থাকিবে, এবং ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা গহ্বরের মুখও আবদ্ধ হইবে না। জিহ্বা তালু স্পর্শ করিবে না, এবং তাহার অগ্রভাগও উত্থিত হইবে না, জিহ্বা এরূপ সমতল ভাবে পড়িয়া থাকিবে, যে তদ্দ্বারা স্বর নির্গমনের পথ একটুও রোধিত না হয়।"

"বিশেষ বিধি এই যে, স্বরগুলি সাহস ভরে নিশ্চয় রূপে উচ্চারিত হইবে, কিন্তু

প্রবল রবে নহে। কর্ণ যে স্বর মনন করিবে, বাগিন্দ্রিয় তাহাই উচ্চারণ করিবে; তাহার পূর্ব্বে অন্য শব্দ হইতে পারিবে না। কেবল কর্ণের সন্দেহ প্রযুক্তই কোন স্বর একবারে বিশুদ্ধ উচ্চারিত না হইয়া, টানিয়া লইয়া অর্থাৎ গড়াইয়া তাহার উচিত ওজনের উপর ফেলিতে হয়।"

২য় পরিচ্ছেদ ঃ—স্বরপ্রকরণ ও স্বরসাধন।

স্বরের তিন অবস্থা। এক অবস্থা স্বরের 'বল' বা তিগ্মতা (ইণ্টেন্‌সিটি), অর্থাৎ কোন্ স্বর কত দূর হইতে শুনা যায়। স্বর এত নরম অর্থাৎ দুর্ব্বল করা যায়, যে কাণে কাণে না বলিলে শুনা যায় না; আবার অত্যন্ত প্রবল হইলে পাঁচ দশ ক্রোশ হইতেও শুনা যায়। কিন্তু কণ্ঠের সে সাধ্য নাই। ফলতঃ কণ্ঠের যত সাধ্য, তত বলে গাওয়া উচিত নয়; মধ্যবিৎ বলে গাইতে অভ্যাস করাই উচিত, তাহা হইলে গান মোলায়েম অর্থাৎ সুললিত হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা স্বরের 'রূপ' বা আকার, যদ্দ্বারা বিভিন্ন লোকের স্বর চিনা যায়; এবং বহুবিধ যন্ত্র একত্রে সমস্বরে বাজিতে থাকিলেও কোন্‌টা বংশী কোন্‌টা বেয়ালা কোন্‌টা এস্রার প্রভৃতি যন্ত্রের ধ্বনি, তাহা চিনিতে পারা যায়, এই বিভিন্নতাকে স্বরের রূপ (টিম্বার) ভেদ কহা যায়। রূপ-ভেদে কণ্ঠস্বর কখন বাজখাঁই, কখন নাকী, কখন খোলা, কখন চর্ব্বিত, এই রূপ নানা প্রকার হয়।

এমন অনেক দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তির কথার স্বর বিভিন্ন কিন্তু গীত-স্বর এক রূপ। গুরু-কণ্ঠ শিষ্যে প্রায়ই অনুকরণ করিয়া লয়; এবং সেই অনুকরণ এত অবিকল হইতে পারে যে না দেখিলে অনেক চেষ্টায়ও চিনা দুষ্কর হয়। অতএব অতি সুস্বর-কণ্ঠ গায়কের নিকট গান শিক্ষা করা, এবং তাঁহারই স্বর অনুকরণ করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতীয় গায়কগণ কণ্ঠের সুস্বরতার প্রতি একেবারেই দৃষ্টি রাখেন না। কণ্ঠ যেমনি হউক না কেন, গানে রাগরাগিণী ঠিক থাকিলেই, এবং তান কর্ত্তব অজস্র করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল, মনে করেন। মুখের অবস্থার উপর স্বরের রূপ নির্ভর করে, ইহা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে।

তৃতীয় অবস্থা স্বরের 'ওজন' বা পরিমাণ (পিচ),—অর্থাৎ যাহাকে স্বরের গম্ভীরতা ও উচ্চতা কহা যায়, যেমন বালকের বা স্ত্রীলোকের স্বর সরু অর্থাৎ উচ্চ, এবং বয়স্থ পুরুষের স্বর মোটা, কিনা গম্ভীর বা খাদ। উচ্চতা নিম্নতা ভেদে স্বরের ওজন অসীম। কিন্তু মানব কণ্ঠে যে যে ওজনের সুর সহজে স্বাভাবিক রূপে বাহির হইতে পারে, সেই প্রকার স্বর লইয়া সংগীত হয়। সংগীত-ব্যবহারে স্বর সচরাচর 'সুর' নামে কথিত হইয়া থাকে।*

সুরের বিভিন্ন ওজনের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু কণ্ঠে যত গুলি স্বর নির্গত হয় তত্তাবতেরই যে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে। একটী সুর উচ্চারণ করিয়া, তাহা হইতে ক্রমশঃ চড়িয়া, কিম্বা নামিয়া যাইলে, কতক দূরে এমন একটী সুর বাহির হয়, যেটী ঐ প্রথম সুরের সহিত উত্তম রূপে মিলিয়া যায় ও এক রূপ শুনায়; এই দ্বিতীয় সুরটীকে প্রথম সুরের উচ্চ বা খাদ "সমপ্রকৃতিক" বলা যায়। অসংখ্য ওজন বিশিষ্ট সুরের অসংখ্য নাম দেওয়া অসম্ভব বশতঃ, অসংখ্য ওজন শ্রেণীকে এক সুর হইতে তাহার যাবতীয় খাদ বা উচ্চ সমপ্রকৃতিক সুর পর্য্যন্ত বিভাগ করিয়া, তাহারই এক ভাগস্থ সুর কএকটির যে নাম দেওয়া যায়, অন্যান্য ভাগস্থ সুর সমূহেরও সেই নাম দেওয়া গিয়া থাকে। সংগীতে উক্ত এক ভাগ মধ্যে স্বভাবতঃ সাত সুরের অধিক ব্যবহার হয় না; সেই সাত সুরের নাম—সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি। ঐ নাম গুলি ষড্‌জ (খরজ), ঋষভ (রিখব), গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ (নিখাদ), এই কয়টী শব্দের আদ্যক্ষর।

নি-এর পর যে অষ্টম সুর, সেটী প্রথম সুরের উচ্চ সমপ্রকৃতিক জন্য তাহার নাম আবার সা; নবম সুর দ্বিতীয় সুরের সমপ্রকৃতিক জন্য তাহার নাম রি; দশমের নাম গ, ইত্যাদি। আবার ঐ প্রথম সা-এর নিম্নে যে সুর, সেটী উক্ত সপ্তম সুর নি-এর সমপ্রকৃতিক জন্য তাহার নাম নি, তন্নিম্নে ধ, প, ইত্যাদি। কোন সুরের সমপ্রকৃতিক সুরকে তাহার উচ্চ বা খাদ 'অষ্টম' নামে কহা যায়, যেমন সা-এর অষ্টম সা, রি-এর অষ্টম রি, ইত্যাদি।

উক্ত সাত সুরের সমষ্টি নাম 'সপ্তক'। কণ্ঠ যথেষ্ট মার্জ্জিত হইলে তিন সপ্তক পরিমিত পর পর উচ্চ ২১টী সুর নির্গত হইতে পারে। হিন্দু সংগীতের তাবৎ কার্য্য ঐ তিন সপ্তকের মধ্যেই হইয়া থাকে। ঐ তিন সপ্তককে 'মন্দ্র', 'মধ্য' ও 'তার', এই তিন নামে কহা যায়; উহাদিগকে ভাষা কথায় উদারা, মুদারা, তারা বলে।

* বাঙ্গালা ভাষায় স্বর ও সুর, এই দুই শব্দের পৃথক অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতি আবশ্যক। স্বর বলিলে কেবল আওয়াজ বুঝায়, যেমন কণ্ঠস্বর, বংশীস্বর, ইত্যাদি; সুর বলিলে সা রি গ ম বুঝায়। ইংরাজীতে যেমন টোন্ ও নোট; এই দুই এর ঐ রূপ ভিন্নার্থ।

বর্ণাত্মক, অর্থাৎ *সার্গম, স্বরলিপিতে তিন সপ্তকের তিন সা, কিম্বা তিন রি, তিন* গ, ইত্যাদিকে পৃথক করার জন্য, সাত স্বরের নামের নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র (১) এক লিখিয়া মন্দ্র সপ্তকের সংকেত হয়, যথা—স$_{১}$ র$_{১}$ গ$_{১}$ ইত্যাদি ; সাত স্বরের কেবল শাদা নাম লিখিয়া মধ্য সপ্তকের সংকেত হয়, যেমন—স র গ ইত্যাদি ; সাত স্বরের নামের উপরদিকে ক্ষুদ্র (^{১}) এক লিখিয়া তার সপ্তকের সংকেত হয় ; যথা—স^{১} র^{১} গ^{১} ইত্যাদি। উক্ত তিন সপ্তকের স্বাভাবিক পর্য্যায় এইরূপ :—

স$_{১}$ র$_{১}$ গ$_{১}$ ম$_{১}$ প$_{১}$ ধ$_{১}$ ন$_{১}$ স র গ ম প ধ ন স^{১}, র^{১} গ^{১} ম^{১} প^{১} ধ^{১} ন^{১} স^{২}।

বাদ্য যন্ত্রে তিন সপ্তকাপেক্ষাও অধিকতর স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিন সপ্তকের অধিক স্বর সার্গম স্বরলিপিতে লিখা প্রয়োজন হইলে, স্বরাক্ষরের উপরে ও নিম্নে ঐ অঙ্কসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই বিভিন্নতা হইবে, যেমন তার-সপ্তকের উপরের সপ্তকে স^{২} র^{২}, ইত্যাদি ; এবং মন্দ্র-সপ্তকের নীচের সপ্তকে ন$_{২}$ ধ$_{২}$ ইত্যাদি। সার্গম স্বরলিপিতে স্বরাক্ষরে আ-কার ই-কার দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু উচ্চারণ কালে সর্ব্বদাই স-কে সা, র-কে রি, ও ন-কে নি বলিতে হইবে।

নিম্ন স্বর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ স্বর উচ্চারণ করাকে আরোহণ অথবা অনুলোম কহে, যথা—সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা^{১} ; এবং উচ্চ স্বর হইতে ক্রমশঃ নিম্ন স্বর উচ্চারণ করাকে অবরোহণ অথবা বিলোম কহা যায়, যথা সা^{১}-নি ধ-প-ম-গ-রি-সা।

কণ্ঠ প্রস্তুতের সময় একবারে ঐ তিন সপ্তক সাধা উচিত নয়, আর তাহা পারাও যাইবে না। প্রথমতঃ এক সা হইতে তাহার উচ্চ সা^{১} পর্য্যন্ত এক অষ্টম সাধিবে, তাহার পর ক্রমশঃ উহার নিম্নে প$_{১}$ পর্য্যন্ত, এবং উপরে ম^{১} কিম্বা প^{১} পর্য্যন্ত সাধিতে চেষ্টা করিবে। এই দুই অষ্টম পরিমিত স্বর উত্তম সাধনা হইলে সকল প্রকার গানই গাওয়া যাইবে। বাস্তবিক কোন গানেই ১৫ স্বরের অধিক কখন প্রয়োজন হয় না। ইহা সাধনার পর যাহার কণ্ঠের সামর্থ্য থাকিবে, তিনি মন্দ্র ও তার সপ্তকের বাকী কএকটী স্বর ক্রমে নির্গত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু তাহার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।

তার সপ্তকের ম-এর উপরের স্বর গুলি বাহির করিবার সময় প্রায়ই কণ্ঠে এক প্রকার সরু কৃত্রিম স্বর বাহির হয়, তাহাকে "টাকী" স্বর (ফলসেটো) কহে। কণ্ঠস্থ বাক্-তন্তুদ্বয়ের সূক্ষ্ম কিনারা-মাত্র কম্পিত হইয়া টাকী স্বর উৎপন্ন হয়। উহা সঙ্গীতে ব্যবহার্য্য নহে। যাহার কণ্ঠে টাকী না করিলে সহজ স্বরে অতি উচ্চ স্বরগুলি বাহির হয় না, তাহার সেই সকল স্বর সাধা ক্ষান্ত দেওয়া উচিত।

অনেক কণ্ঠে দুই অষ্টম পরিমিত স্বরও সুন্দররূপে নির্গত হয় না; কিন্তু অল্পে অল্পে অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে কণ্ঠের ওজন সীমা বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যে খাদ ও উচ্চ স্বর সহজে বাহির হইবে না, তাহার জন্য জেদাজিদি করা উচিত নহে; তাহা করিলে, কণ্ঠের অধিকতর মিষ্ট যে মধ্য স্বরগুলি, তাহা বিকৃত হইয়া যাইবে।

উচ্চ স্বরগুলি কখনই প্রবল রবে উচ্চারণ করিবে না, তাহা করিলে গলায় কাসি হইয়া স্বর ভাঙ্গিয়া যাইবে, ও নিম্ন স্বরগুলি পর্য্যন্তও বিকৃত হইয়া পড়িবে। অতএব আরোহণের সময় সবল হইতে ক্রমে মৃদু উচ্চারণ করিবে, তাহা হইলে উচ্চ স্বরগুলি মোলায়েম হইবে; এবং অবরোহণের সময় ক্রমে সবলে উচ্চারণ করিবে। স্বর সাধনের উদাহরণাবলি ২য় ভাগে সাধন প্রণালীর মধ্যে দ্রষ্টব্য।

সা হইতে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চড়াইলে রি, গ, ম, প্রভৃতি স্বর উৎপন্ন হয়; কণ্ঠে সেই পরিমাণগুলি এরূপ অভ্যাস করিতে হইবে যে সা স্বর ঠিক রাখিয়া, জিজ্ঞাসা মাত্র যে কোন স্বর বিশুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষমতা হয়; তাহা হইলে স্বরলিপি দেখিয়া যত ইচ্ছা গান শিক্ষা করা যাইতে পারিবে।

লেখা পড়া শিখিতে অগ্রে যেমন বর্ণমালা পরিচয়ের প্রয়োজন, সংগীত শিক্ষা করিতে হইলে ইহার বর্ণমালা যে সা-রি-গ-ম, তাহার পরিচয় নিতান্ত আবশ্যক। শিশুরা কিম্বা চাষা লোকেরা না পড়িয়া যেমন মুখে মুখে ভাষা শিক্ষা করে, সঙ্গীতও সেই রূপ মুখে মুখে শেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে গান কি গত সহজে বিশুদ্ধ হয় না, এবং বিদ্যাও জন্মে না। অনেক বড় বড় ভারতীয় কালাবঁত্ গায়কের সারগম জ্ঞান নাই; কেননা পূর্ব্বাপর মুখে মুখেই সংগীত শিক্ষার রীতি প্রচলিত। অতি অল্প সংখ্যক গায়কেই গানের সারগম বলিতে পারেন; সুতরাং কি উপায়ে যে স্বর জ্ঞান হয়, তাহাও তাঁহারা শাকরেদদের উপদেশ করিতে পারেন না। শাকরেদগণ তোতা পাখীর ন্যায় অনুকরণ করিয়া গান শিক্ষা করে, তজ্জন্য কেবল গান গাওয়া ভিন্ন সংগীতের আর আর বিষয়ে লোকের জ্ঞান হয় না।

এই গ্রন্থের স্বরসাধনের উদাহরণ সমস্ত অভ্যাস করিলে, স্বরজ্ঞান জন্মিবে। প্রথমতঃ গুরুর নিকট মুখে মুখে নকল করিয়া সারগম উচ্চারণ শিখিতে হইবে; তিনি সা-এর পর যেমন যেমন ওজনে রি-গ-ম প্রভৃতি উচ্চারণ করিবেন, তাহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া, অবিকল সেই ওজন অনুকরণ করতঃ কণ্ঠে অভ্যাস করিয়া লইলে, তবে পুস্তক দেখিয়া স্বর সাধন করা সম্ভব ও সহজ হইবে। সারগমের ওজনের নিয়ম পর পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইতেছে।

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ—স্বরগ্রাম ও স্বরান্তরের নিয়ম।

কর্ণে যত দূর খাদ ও উচ্চ ধ্বনি অনুভব করা যায়, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য ধ্বনি উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এক আশ্চর্য্য কৌশলে শব্দের ঐ জঙ্গল হইতে কএকটী মাত্র সুস্পষ্ট ও মনোহর সুর নির্ব্বাচিত হইয়া সঙ্গীতে ব্যবহার হইতেছে। সেই কৌশল এই :—যে সকল সুরে সঙ্গীত হয়, তাহাদের মধ্যে একটী সুরকে প্রধান করিয়া লইয়া, তাহারই অনুশাসনে ও সম্বন্ধ নির্ব্বিশেষে অন্যান্য সুর সকল উদ্ভাবিত করিলে, কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বশে এমন কএকটী সুর ঐ প্রধান সুরের নিকটে উঠিয়া দাঁড়ায়, যে কেবল তাহারাই উহার সম্পর্কাধীন হইয়া উহার অনুবর্ত্তী হয়। সেই কএকটী সুরের সংখ্যা অধিক নহে, ছয়টী মাত্র। এই জন্য ঐ প্রধান সুরের নাম সঙ্গীত শাস্ত্রকর্ত্তা পুরাকালের আর্য্য ঋষিগণ "ষড়্‌জ" * রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা হইতে অপর ছয়টী সুর উৎপন্ন হয়। স ঐ শব্দের আদ্যক্ষর,—ব্যবহার বশতঃ মূর্দ্ধন্য ষ স্থানে দন্ত্য হইয়া গিয়াছে. কেননা হিন্দুস্থানী লোকে সকল স-ই দন্ত্য উচ্চারণ করে। সা-এর অনুবর্ত্তী সুরগুলিকে রি-গ-ম-প-ধ-নি নামে কহা যায়, তাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে।

খরজ অর্থাৎ সা-এর সহিত রি গ ম প্রভৃতির সম্বন্ধ রক্ষার্থ, ইহাদের প্রত্যেককে সা হইতে এক এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চড়াইয়া উচ্চারণ করিতে হয়। খরজ হইতে রি, গ, ম, প্রভৃতি ছয় সুরের ওজনের, অর্থাৎ উচ্চতা কিম্বা নিম্নতার যে ব্যবস্থা, তাহাকে "স্বর-গ্রাম" কহে। সা হইতে ছয় সুরের ওজনের প্রকার ভেদে গ্রাম নানা প্রকার হয়। একই প্রকার গ্রামে সা-এর ওজন অনেক প্রকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সা-এর সম্বন্ধে রি গ ম প্রভৃতির আপেক্ষিক ওজন কখনই পরিবর্ত্তন হয় না।

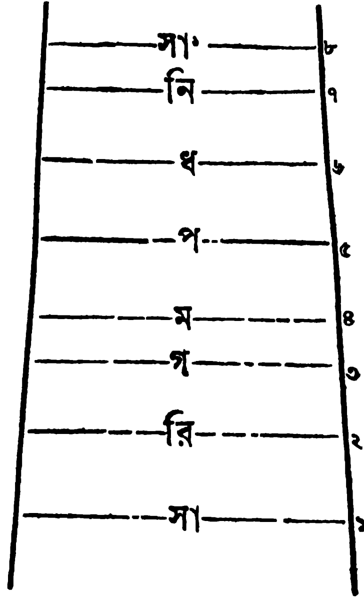
এক সুর হইতে আর একটী সুরের উচ্চতা, কিম্বা নিম্নতার যে দূরতা অর্থাৎ ভিন্নতা, তাহাকে সুরের 'অন্তর' বলা যায়। এক অষ্টম পরিমিত, যেমন সা হইতে সা[১]

---

* ভাষা কথায় ইহাকে খরজ বলা যায়, কারণ হিন্দুস্থানী লোকে ষ-কে খ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

পর্য্যন্ত, আট সুরের মধ্যগত সাতটী অন্তরে একটী গ্রাম হয়। সেই সাতটী অন্তর পরস্পর সমান নহে, তদ্বিষয় নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

স্বরগ্রামের আটটী স্বভাবিক সুর পর পর সমান উচ্চ নহে; সা হইতে রি, বা রি হইতে গ যে পরিমাণে উচ্চ, গ হইতে ম, এবং নি হইতে সা১ উহার প্রায় অর্দ্ধ উচ্চ:—পার্শ্বে দেখ। সেতার যন্ত্রের পর্দ্দার নিয়ম দেখিলে আরও হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই প্রকার অন্তর বিশিষ্ট গ্রামকে, অর্থাৎ যে গ্রামের তৃতীয় ও সপ্তম অন্তর প্রায় অর্দ্ধ তাহাকে "স্বাভাবিক গ্রাম" কহে।



আবার সা হইতে রি যে পরিমাণে উচ্চ, রি হইতে গ তত উচ্চ নয়, কিঞ্চিৎ কম উচ্চ, প হইতে ধ-এর উচ্চতা, রি হইতে গ-এর ন্যায়; ম হইতে প-এর, ও ধ হইতে নি-এর উচ্চতা সা হইতে রি এর ন্যায়। অতএব গ্রামস্থ সাতটী অন্তর তিন প্রকার; বৃহদন্তর, মধ্যান্তর ও ক্ষুদ্রান্তর; স ও রি-এর মধ্যে এবং ম ও প, ও ধ ও নি-এর মধ্যে বৃহদন্তর; রি ও গ-এর মধ্যে, এবং প ও ধ-এর মধ্যে মধ্যান্তর; গ ও ম-এর মধ্যে, এবং নি ও সা১-এর মধ্যে ক্ষুদ্রান্তর। সুবিধার জন্য উক্ত বৃহৎ ও মধ্যান্তরকে সচরাচর পূর্ণান্তর, এবং ক্ষুদ্রান্তরকে অর্দ্ধান্তর কহা যায়। এই অর্দ্ধান্তরের স্থান ভেদে গ্রাম ভেদ হয়; কিন্তু পাঁচটী পূর্ণান্তর ও দুইটী অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট গ্রাম ব্যতীত অন্য প্রকার গ্রাম সঙ্গীতে ব্যবহার হয় না। ঐ প্রকার অন্তর বিশিষ্ট গ্রামের সাধারণ নাম "পূর্ণস্বারিক" (ডায়াটনিক) গ্রাম, অর্থাৎ যাহাতে পূর্ণ স্বরই অধিক।

গ্রামের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে অর্দ্ধান্তর স্থাপন করিলে এক প্রকার গ্রাম হয়; প্রথম ও পঞ্চম স্থানে স্থাপন করিলে আর এক প্রকার গ্রাম হয়; তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে দিলে আর এক প্রকার; দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্থানে দিলে আর এক প্রকার; এই রূপে নানা প্রকার গ্রাম প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু কখনই ঐ দুইটী অন্তর পর পর, যেমন ১ম ও ২য় স্থানে, কিম্বা ৩য় ও ৪র্থ স্থানে, এরূপ ব্যবহার হয় না; কারণ

সে প্রকার গ্রাম সুশ্রাব্য নহে। আধুনিক সঙ্গীতে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের পৃথক নাম ব্যবহার নাই। চলিত কথায় উহাদিগকে সচরাচর "ঠাট্" * কহা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঠাট হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাগ † উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন কোন সঙ্গীততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতে বলেন, যে ঐ সকল গ্রাম নূতন নহে, স্বাভাবিক গ্রামেরই প্রকার ভেদ মাত্র। সে বিষয় এই গ্রন্থের বিচার্য্য নহে। বস্তুতঃ স্বাভাবিক গ্রামই সকলের মূল; উহা শুনিতে অধিকতর মিষ্ট, ও তজ্জন্য জগদ্ব্যাপ্ত; চীন, পারস্য, আমেরিকা, ইউরোপ, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচলিত, কেননা উহা উচ্চারণ করা সহজ ও স্বাভাবিক, এবং উহা সঙ্গীততত্ত্বের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রে 'ষড্‌জ', 'মধ্যম', ও 'গান্ধার নামে তিন প্রকার গ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; তাহার বিস্তারিত বিবরণ ১২শ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

স্বাভাবিক গ্রামের বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র, এই তিন প্রকার অন্তরের যথার্থ আনুপাতিক পরিমাণ কোন সরল অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইদানীং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উহাদের পরিমাণ যে সরল অঙ্কে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা গ্রামিক স্বরের মধ্যগত অন্তর সমূহের আনুপাতিক পরিমাণ পরিষ্কার বুঝা যায়। গ্রামকে, অর্থাৎ খরজ ও তাহার অষ্টম স্বরের মধ্যগত অন্তরকে, তিপ্পান্নটী সূক্ষ্ম অংশে বিভাগ করিলে ঐ পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহারই ৯ অংশ গ্রামের বৃহদন্তরে, ৮ অংশ মধ্যান্তরে, এবং ৫ অংশ ক্ষুদ্রান্তরে পড়ে ‡। পার্শ্বে গ্রামের সমস্ত অন্তরের যথা যোগ্য পরিমাণ দেওয়া গেল।

খরজ—সা
৫
নিখাদ—নি
৯
ধৈবত—ধ
৮
পঞ্চম—প
৯
মধ্যম—ম
৫
গান্ধার—গ
৮
রিখব—রি
৯
খরজ—সা

খরজের সহিত তাহার অষ্টমের সম্পূর্ণ মিল, তাহার পর প-এর মিল, তাহার

* বাদ্য যন্ত্রের সারণা অর্থাৎ পর্দ্দা সকলকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অন্তরে স্থাপন করিলে পর্দ্দা শ্রেণীর যে বিভিন্ন অবস্থা হয়, তাহাকে ঠাট বলে।

† রাগ ও রাগিণী উভয় অর্থেই রাগ শব্দ ব্যবহার হইবে।

‡ জেনেরাল পেরনেট টম্‌সন, ডাক্তার ক্রচ্, গ্রেহাম্ কারোএন্ প্রভৃতি ইংলণ্ডের সঙ্গীত বিশারদ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্বর-গ্রামকেঐ প্রকারে বিভাগ করিয়া স্বরান্তরের আনুপাতিক পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।

পর ম-এর, তাহার পর গ-এর, তাহার পর ধ-এর মিল। রি ও নি-এর সহিত খরজের মিল নাই।

স্বরগ্রামস্থ আট সুরের মধ্যবর্ত্তী সাতটী অন্তর যে পরস্পর সমান নয়, তাহা হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও বুঝিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহারা গ্রামকে দ্বাবিংশতি "শ্রুতি" নামে ২২টী ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করিয়া, তাহারই চারি চারি শ্রুতি তিনটী বৃহদন্তরে, তিন তিন শ্রুতি দুইটি মধ্যান্তরে, এবং দুই দুই শ্রুতি দুইটী ক্ষুদ্রান্তরে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বাভাবিক অন্তরগুলির ন্যায্য পরিমাণ ৪, ৩, ও ২ নহে; কারণ ঐ পরিমাণানুসারে সুর উচ্চারিত হইলে সবই বেসুরা হইয়া যায়, সুর সকলে পরস্পর মিল থাকে না, মিল না থাকিলে সুশ্রাব্য হয় না। সুরের মিল অমিল গণিত দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করা যায়। ঐ সকল শ্রুতির বিস্তারিত বিবরণ ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

কোন সুরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সুরকে তাহার দ্বিতীয় সুর কহে, যেমন সা হইতে রি দ্বিতীয় সুর। সঙ্গীতে সচরাচর দুই প্রকার দ্বিতীয় সুর ব্যবহার হয়; পূর্ণান্তর ব্যবহিত দ্বিতীয়, যেমন—সা হইতে রি, কিম্বা রি হইতে গ, এবং অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত দ্বিতীয়, যেমন—গ হইতে ম। কোন সুর হইতে এক সুর ব্যবহিত যে সুর, তাহাকে উহার তৃতীয় সুর কহে, যেমন—সা-এর তৃতীয় গ। তৃতীয় সুরও দুই প্রকার: 'বৃহৎ তৃতীয়', ও 'ক্ষুদ্র তৃতীয়', দুইটী পূর্ণান্তর ব্যবহিত যে সুর, তাহাকে বৃহৎ তৃতীয় বলে: যেমন—সা হইতে গ, কিম্বা ম হইতে ধ, কিম্বা প হইতে নি, এবং একটী পূর্ণান্তর ও একটি অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত যে সুর, তাহাকে ক্ষুদ্র তৃতীয় বলা যায়: যেমন—রি হইতে ম, কিম্বা গ হইতে প, কিম্বা ধ হইতে সা।

ইউরোপীয় সংগীতের মতে খরজ হইতে তৃতীয় সুরের বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব ভেদে গ্রাম ভেদ হয়; যে গ্রামের গ বৃহত্তৃতীয়, তাহাকে ইউরোপীয় মতে 'বৃহৎ গ্রাম' (মেজর স্কেল) বলে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক গ্রাম বলি, এবং যে গ্রামের গ ক্ষুদ্র তৃতীয়, তাহাকে 'ক্ষুদ্র গ্রাম' (মাইনর স্কেল) বলে। সা হইতে গ্রামের উত্থাপন হইলে, তাহাকে 'স্বাভাবিক বৃহৎ গ্রাম' বলে; এবং ধ হইতে গ্রাম উত্থাপিত হইলে, তাহাকে 'স্বাভাবিক ক্ষুদ্র গ্রাম' বলে। পূর্ব্বে গ্রামের যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই বৃহৎ গ্রাম। পার্শ্বে ক্ষুদ্র গ্রামের চিত্র প্রদত্ত হইল। বস্তুতঃ সঙ্গীতের সকল প্রকার গ্রামই ঐ দুই গ্রামের অন্তর্গত। হিন্দু সঙ্গীতের নানাবিধ রাগের নিমিত্ত যে বহু প্রকার ঠাট ব্যবহার হয়, তাহারা সকলেই ঐ দুই গ্রামের অন্তর্গত।

ধ—৮
প—৭
ম—৬
গ—৫
রি—৪
সা—৩
নি১—২
ধ১—১

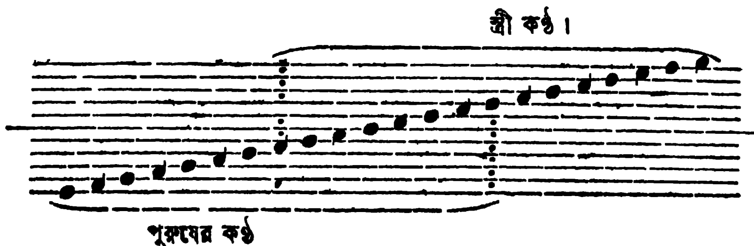
বাস্তবিক উক্ত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যতীত সঙ্গীতে আর পৃথক গ্রাম নাই ; এই জন্য ইউরোপের সঙ্গীতবিদ্‌গণ অধিক গ্রাম স্বীকার করেন না।

বর্ত্তমান ও পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে স্বর লিখিবার যে সকল সংকেত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সার্গম স্বরলিপির ব্যবহার্য্য, অর্থাৎ তাহাকেই সার্গম স্বরলিপি বলা যায়। এই গ্রন্থে আরও যে এক প্রকার স্বরলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাকে সাংকেতিক স্বরলিপি বলে, তাহাতে যে প্রকার সংকেতে স্বর সকল লিখিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে সুরের সঙ্কেত।

সঙ্গীতের স্বর নিম্ন হইতে পর পর উচ্চ হইলে সোপান-শ্রেণীর ন্যায় তাহার উপমা হয় ; ইহা ১৪ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব যে স্বরলিপি ঐ সোপানের অনুরূপ তাহাই সঙ্গীতের যথার্থ উপযোগী। সাংকেতিক স্বরলিপিতে স্বরের উচ্চ নীচতা সোপানের ন্যায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। তজ্জন্য উপর্য্যুপরি কতকগুলি রেখা সিঁড়ির আকারে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাব নাম "মঞ্চ"। মঞ্চের রেখায়, ও রেখান্তবকের মধ্যবর্ত্তী ঘবে বিন্দু স্থাপন পূর্ব্বক স্বরের সংকেত করা হয়। ২য় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, মানব কণ্ঠে তিন অষ্টম পরিমিত বাইশটী স্বর নির্গত হয়, সেই বাইশটী স্বর একত্রে অঙ্কিত করিতে হইলে এগারটী রেখা-বিশিষ্ট মঞ্চের রেখায় ও মধ্যবর্ত্তী ঘরে ২২টী বিন্দু স্থাপন পূর্ব্বক ঐ তিন অষ্টম সংকেতিত করা যায়। যথা :—

আরোহণ গতি।
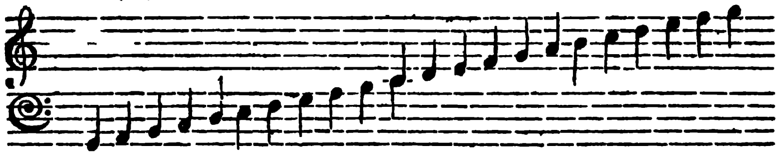


একটী গানে সচরাচর যত গুলি স্বর ব্যবহার হয়, তাহা লিখিবার জন্য পাঁচ

রেখা বিশিষ্ট মঞ্চই যথেষ্ট। উক্ত বৃহৎ মঞ্চের মধ্য-স্থানীয় ৬ষ্ঠ রেখাটী উঠাইয়া লইলে, ঐ বৃহৎ মঞ্চ দ্বি-খণ্ড হইয়া দুইটী পাঁচ রেখাবিশিষ্ট মঞ্চ পাওয়া যায়; তাহার নিম্ন ভাগকে খাদ মঞ্চ, এবং উপরের ভাগকে উচ্চ মঞ্চ কহা যায়। ঐ দুই মঞ্চ পৃথক চিনিবার জন্য তাহাদের আদিতে দুইটী সংকেতাক্ষর লিখিত থাকে; তাহাদের নাম "কুঞ্চিকা"। তাহাদের আকৃতি, যথা—

খাদ কুঞ্চিকা। উচ্চ কুঞ্চিকা।

খাদ ও উচ্চ মঞ্চে ঐ দুই কুঞ্চিকা যোগ করত যথাক্রমে তিন অষ্টম স্বর লিখিলে এইরূপ হয়, যথা:—

আরোহণ।
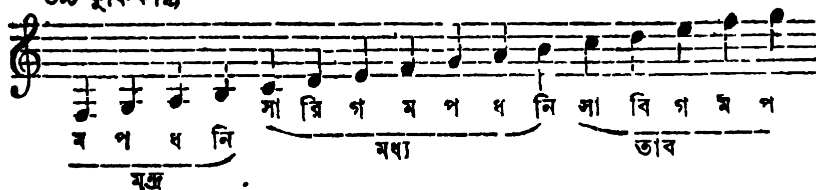


প ধ নি সা রি গ ম প ধ নি সা রি গ ম প ধ নি সা রি গ ম প

সকল লোকের কণ্ঠের ওজন সমান নয়, কেহ খাদে গায়, উচ্চে গাইতে পারে না, কেহ উচ্চে গায়, খাদে গাইতে পারে না। পুরুষের স্বর খাদ; স্ত্রীলোক ও বালকের স্বর উচ্চ, ইহা প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন ওজন-বিশিষ্ট কতকগুলি কণ্ঠে একত্রে গাইতে অতিশয় অসুবিধা; এইজন্য ভারতবর্ষে বহু লোক মিলিয়া একতানে (কোরাসে) গান করার প্রথা অধিক প্রচলিত নাই; বিশেষ উচ্চ অঙ্গীয় যে কালাবঁতী গান, তাহাতে কোবাস একেবারেই নাই। ইউরোপে কোরাসে গান করার যথেষ্ট প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহার কারণ এই: ইউরোপীয় কোরাস গানের প্রণালী ভারতীয় কোরাস হইতে অনেক ভিন্ন, ভারতীয় কোরাস একতান মাত্র, ইউরোপীয় কোরাস একই ছন্দে বহুতান সম্মিলিত। বিভিন্ন লোকের স্বর যেমন বিভিন্ন; ইউরোপীয় কোরাস গানে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন স্বরেই একত্রে গান করে, অর্থাৎ যাহার স্বরের যে ওজন, সে সেই ওজনেই গান ধরিয়া একত্রে গায়। ভারতবর্ষীয় কোরাস গানে বিভিন্ন লোকের স্বর বিভিন্ন ওজন-বিশিষ্ট হইলেও, সকলকে একই ওজনে গাইতে হয়; ইহাতে অনেকের বিশেষ কষ্ট হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ ইউরোপীয় সঙ্গীত এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত হইয়াছে যে, কোরাসে একই গান বিভিন্ন ওজনে

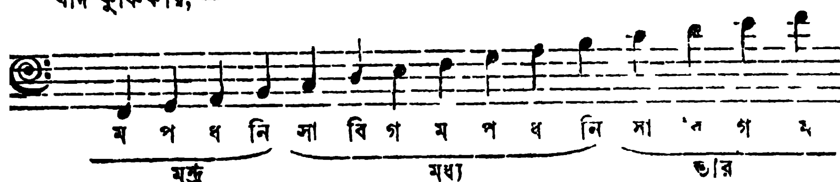
গীত হয়, অথচ অসঙ্গত শুনায় না, বরং অতীব জম্‌কাল শুনায়; ইহাতে কোন গায়কেরই অসুবিধা হয় না; প্রত্যুত কোরাসের প্রত্যেক গায়কেই নিজ নিজ কণ্ঠের সামর্থ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন হইতে কতক বহু মিলের (হার্মনির) উৎপত্তি হইয়াছে।

ঐ সকল প্রয়োজন বশতঃ ইউরোপের সাঙ্কেতিক স্বরলিপি স্বরের বিভিন্ন ওজনের পরিচায়ক করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহাতে লিখিত সুরের ওজন নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথমতঃ, পুং কণ্ঠ ও স্ত্রী কণ্ঠের বিভিন্নতাই প্রধান। স্ত্রী কণ্ঠ সাধারণতঃ পুং কণ্ঠের এক অষ্টম উচ্চ। ইউরোপীয় সঙ্গীতে পুং কণ্ঠের জন্য খাদ কুঞ্চিকাযুক্ত মঞ্চ, এবং স্ত্রী কণ্ঠের জন্য উচ্চ কুঞ্চিকাযুক্ত মঞ্চ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গানে যে দুই অষ্টম সচরাচর ব্যবহার হয়, তাহা খাদ এবং উচ্চ কুঞ্চিকাযুক্ত প্রত্যেক মঞ্চেই পাওয়া যায়। যথা:—

উচ্চ কুঞ্চিকায়,—



খাদ কুঞ্চিকায়,—



প্রচলিত হিন্দু সঙ্গীতে বিভিন্ন কণ্ঠের বিভিন্ন ওজনের যখন কোন বিচার ও ব্যবহার করা হয় না, তখন হিন্দু সঙ্গীত লিখিতে একটীমাত্র কুঞ্চিকা ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য উচ্চ কুঞ্চিকাই বিশেষ উপযোগী, কেন না সেতার, এস্রার, বেয়ালা, বংশী, কর্ণেট, ক্লারিনেট, প্রভৃতি অনেক যন্ত্রের সঙ্গীত ঐ কুঞ্চিকা যোগেই লিখিত হইয়া থাকে। উহা দেখিয়া বয়স্ক পুরুষে এক অষ্টম খাদে গাইবে; স্ত্রীলোকে ও বালকে উচ্চ অষ্টমেই গাইবে।

উচ্চ কুঞ্চিকাযুক্ত মঞ্চে লিখিত সুর সকল সুবিধার সহিত চিনিবার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে, যথা :—

রেখা। ঘর।

গ প নি রি ম ম ধ সা গ

পরিচয় পরীক্ষার্থ উদাহরণ।

উচ্চ মঞ্চের বাহিরে অতিরিক্ত রেখা যোগে যে সকল সুর লিখা যায়, তাহাদের নাম যথা,—

পরীক্ষার্থ উদাহরণ।

প ধ নি সা

ম প ধ নি সা রি

উচ্চ মঞ্চে সুর সকল স্বাভাবিক পর্য্যায়ে পরপর শ্রেণীবদ্ধ হইলে এইরূপ হয়,—

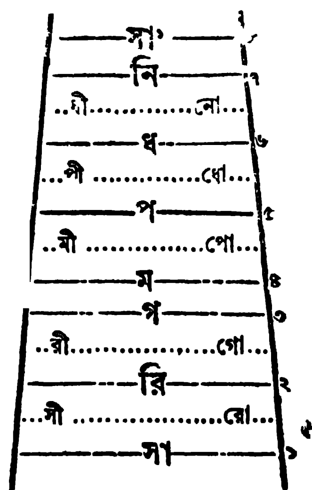
মুদারা। তারা।

উদারা।

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ—কোমল ও কড়ি সুরের বিবরণ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে গ্রামের যে সাতটী অন্তরের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইল, সেই অন্তর বিশিষ্ট সুর সমূহকেই "স্বাভাবিক" সুর কহে। গ্রামের বৃহৎ ও মধ্য, এই দুই পূর্ণান্তরের মধ্যে আরও সুর উচ্চারণের স্থান পাওয়া যায়; সেই সকল সুরকে বিকৃত অর্থাৎ কড়ি ও কোমল সুর কহা যায়, তদ্দ্বারা প্রত্যেক পূর্ণান্তর প্রায় দুই অর্দ্ধান্তরে বিভক্ত হইয়া থাকে।
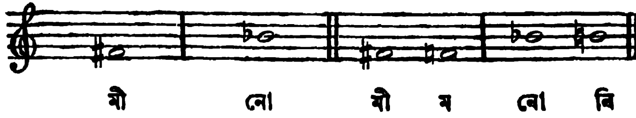
কড়ির সংস্কৃত তীব্র; অতএব সাগম স্বরলিপিতে কড়ির সঙ্কেত তীব্রের ঈ-কার (ী), এবং কোমলের সঙ্কেত ও-কার (ো) স্থির করা গেল; ইহারা প্রয়োজন মত সুরের অক্ষরে প্রযুক্ত হইবে: যেমন সী কিম্বা মী লিখিলে, কড়ি-সা ও কড়ি-ম বুঝাইবে; এবং রো কিম্বা নো লিখিলে, কোমল-রি ও কোমল-নি বুঝাইবে।



পার্শ্বস্থ চিত্রে বিন্দুময়ী রেখা দ্বারা কড়ি কোমল সুরের স্থান, ও সরল রেখা দ্বারা স্বাভাবিক সুরের স্থান নির্দ্দেশিত হইল। সা ও রি-এর মধ্যবর্ত্তী যে সুর, তাহাকে কোমল-রি বা কড়ি-সা বলে; রি ও গ-এর মধ্যবর্ত্তী সুরকে কোমল-গ বা কড়ি-রি; ম ও প-এর মধবর্ত্তী সুরকে কোমল-প বা কড়ি-ম, প ও ধ-এর মধ্যবর্ত্তী সুরকে কোমল-ধ বা কড়ি-প; এবং ধ ও নি-এর মধ্যবর্ত্তী সুরকে কোমল-নি বা কড়ি-ধ বলা যায়।

সাংকেতিক স্বরলিপিতে কড়ির চিহ্ন এই (♮) প্রকার, এবং কোমলের চিহ্ন এই (*b*) প্রকার। ইহারা মঞ্চস্থ—সুরসূচক বিন্দুর বামদিকেই স্থাপিত হইয়া

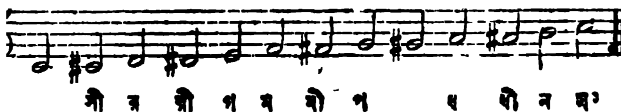
থাকে। বিকৃত স্বরকে প্রকৃতস্থ করার, অর্থাৎ যে স্বরকে একবার তীব্র অথবা কোমল করা হইয়াছে তাহাকে স্বভাবস্থ করার, এই (♮) সংকেত। যথা :—



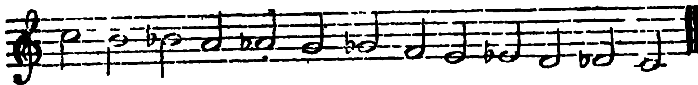
উক্ত পার্শ্বস্থ চিত্রে দৃষ্ট হইবে যে, গ ও ম, এবং নি ও সা১-এর মধ্যে বিকৃত স্বর নাই; তাহার কারণ এই যে, উহারা পরস্পর অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত। গ ও ম-এর মধ্যগত ক্ষুদ্রান্তরের মধ্যে স্বর উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তত সূক্ষ্মান্তরিত স্বরের পার্থক্য তুলনা বিনা সহসা কাণে উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য সঙ্গীতে তাহার ব্যবহার নাই; এই হেতু কড়ি-গ কিম্বা কোমল-ম, এবং কড়ি-নি বা কোমল-সা প্রচলিত নাই। কড়ি-গ ও কড়ি-নি বলিলে স্বভাবতঃ ম ও সা বুঝায়, এবং কোমল-ম ও কোমল-সা বলিলে গ ও নি বুঝায়।

পাঁচটী বড় অন্তরের মধ্যেই পাঁচটি বিকৃত স্বর ব্যবহার হয়, এইটী সাধারণ নিয়ম। সা ও প-এর বিকৃত নাম আধুনিক হিন্দু সংগীতে ব্যবহার ছিল না; কিন্তু এক্ষণে হইবে। বিকৃত স্বর এরূপ ভাবে সঙ্গীতে ব্যবহার হয় যে, তাহাতে গ্রামের যে স্থানে হউক, পাঁচটী পূর্ণান্তর ও দুইটী অর্দ্ধান্তর থাকিবেই, তাহার অন্যথা হয় না। সাতটী স্বাভাবিক ও পাঁচটী বিকৃত, এই প্রকার বারটী স্বরের অধিক সঙ্গীতে ব্যবহার হয় না; অর্থাৎ সঙ্গীতে যত প্রকার স্বর ব্যবহার হয়, তাবতই ঐ বারটীর অন্তর্গত। গ্রামের মধ্যে ইহাদিগকে পরপর স্থাপন করিলে, খরজের অষ্টমটী লইয়া বারটী ক্ষুদ্রান্তর (অর্দ্ধান্ত) বিশিষ্ট তেরটী স্বর হয়। যে গ্রামে এই প্রকার তেরটী স্বর ধরা যায়, তাহাকে "অচল-স্বারিক" গ্রাম, অথবা অচল ঠাট * (পৃ. ৩৮ দ্রষ্টব্য) কহে। যথা :—

কড়ি সহকারে আরোহণ :—



কোমল সহকারে অবরোহণ † :—



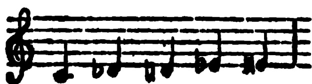
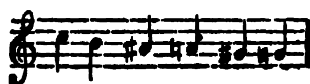
কড়ি কোমল করার সাধারণ উপায় এই :—কোন স্বর হইতে অর্দ্ধান্তর পরিমাণ চড়াইলে, তাহার কড়ি হয়, যেমন সা হইতে অর্দ্ধ স্বব চড়াইয়া উচ্চারণ করিলে কড়ি সা হয়, এবং কোন স্বর হইতে অর্দ্ধান্তর নামাইলে, তাহার কোমল হয়, যেমন রি হইতে অর্দ্ধ স্বর নামাইয়া উচ্চারণ করিলে কোমল-রি হয়। ইহাতেই জানা যাইবে যে, যে স্বরটী কোন নিম্ন স্বরের কড়ি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই অব্যবহিত উচ্চ স্বরেব কোমল নহে, কারণ কোন পূর্ণান্তরই গ্রামিক অর্দ্ধান্তরের ঠিক দ্বিগুণ নহে। এই হেতু সা-এর কড়ি যে স্বর, প্রকৃত পক্ষে তাহাই রি-এর কোমল নহে, দুই এক শ্রুতিব (অংশেব) কমি বেশী, অর্থাৎ যেমন, কড়ি-সা হইতে রি-কোমল এক অংশ উচ্চ। অন্যান্য স্বরের কড়ি কোমলও ঐ রূপ। ইহা পার্শ্বে প্রদর্শিত হইতেছে। ফলতঃ কার্য্যের সুবিধার জন্য ঐ সূক্ষ্ম বিভিন্নতা ধরা হয় না, অর্থাৎ নিম্ন স্বরের কড়িকেই তদুচ্চ স্বরের কোমল বলিয়া ব্যবহার হয়। কি রূপে অর্দ্ধান্তবে কড়ি কোমল হয়— তাহার আদর্শ কি—ক্রমে বলিতেছি।

কত খানি চড়াইলে ও নামাইলে কড়ি কোমল হয়, হিন্দু সঙ্গীতে তাহার কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম এপর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ হয় নাই। ওস্তাদদিগেব যাঁহার যে রূপ শিক্ষা,

---

১ বীণ যন্ত্রেব পর্দ্দা শ্রেণী মম্ অথবা গালা দ্বাবা এমন ভাবে আটা থাকে যে, উহারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারে না, সেই হেতু বিকৃত স্বরের জন্যও আব কতকটা পর্দ্দা উহাতে আবদ্ধ থাকাতে সেই ঠাটের 'অচল ঠাট' নাম হইযাছে। আবও, সেতারাদি যন্ত্রের পর্দ্দা সকল সচল, অর্থাৎ অনায়াসেই ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করা যায়, এই হেতু কড়ি কোমলের জন্য পৃথক পর্দ্দা ঐ সকল যন্ত্রে সচরাচর থাকে না। কড়ি কোমলের প্রযোজন হইলে স্বাভাবিক স্বরের পর্দ্দা উপব নীচ কবিয়া কড়ি কোমল করা যায়। কড়ি কোমলের জন্য পৃথক পর্দ্দা বর্ত্তমান থাকিলে কোন পর্দ্দাই আর সবাইবার আবশ্যক হয় না, এই জন্য কড়ি কোমলের পর্দ্দা বিশিষ্ট ঠাটের 'অচল ঠাট' নাম হইযাছে।

† অচল-স্বারিক গ্রামের উদাহরণদ্বয়ে আরোহণে কড়ি এবং অবরোহণে যে কোমল দেখান হইয়াছে, তাহাতে ফলের বিভিন্নতা অতি অল্পই, কেননা যে নিম্ন স্বরেব কড়ি, সেই উচ্চ স্বরের কোমল, এবং তজ্জন্য উহাদের উচ্চারণও একই প্রকাব। পরন্তু ঐ প্রকার করিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, আরোহণে এবং অবরোহণে কেবল কড়ি, কিম্বা কেবল কোমল দিয়া লিখিলে, স্বাভাবিকের চিহ্ন অধিক ব্যবহার করিতে হয় যথা—


কিম্বা


অভ্যাস ও রুচি, তিনি তদনুসারে বিকৃত করিয়া গান। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ সমূহেও তদ্বিষয় কিছুই পরিষ্কার রূপ পাওয়া যায় না। ফলতঃ এক্ষণে কড়ি কোমল স্বরের ওজন পরিমাণের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করার সময় উপস্থিত, নতুবা গান শিক্ষার কাঠিন্য দূরীকৃত হইতেছে না। ইহার একটী যুক্তিযুক্ত নিয়ম অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, গ্রামের পূর্ণান্তরের মধ্যেই বিকৃত স্বর ব্যবহার হয়, অর্দ্ধান্তরের, অর্থাৎ যেমন গ ও ম-এর, মধ্যবর্ত্তী কোন স্বর গানে কখনই ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে এক প্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে, অর্দ্ধান্তর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অন্তর-ব্যবহিত স্বর সঙ্গীতে কখন ব্যবহার্য্য নহে। অতএব গ্রামের অর্দ্ধান্তরই—যেমন গ হইতে ম-এর কিম্বা নি হইতে সা-এর অন্তর—কোন স্বর হইতে তাহার কড়ি কিম্বা কোমলের অন্তরের আদর্শ। এই নিয়ম অতীব ন্যায়সঙ্গত বোধ হয়, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যন্ত্র সঙ্গীতে ঐ নিয়মই প্রচলিত, তাহার প্রমাণ বীণ, সেতার, ও এস্রারে উত্তম রহিয়াছে। নায়কী (প্রথম) তারে যে যে পর্দ্দায় উদারার ধ ও কোমল নি হয়, যুড়ীর (দ্বিতীয়) তারে সেই সেই পর্দ্দায় উদারার গ ও ম নির্গত হয়; এবং তাহারই পর নি ও সা-এর পর্দ্দায় যুড়ীর তারে উদারার কড়ি-ম ও প নির্গত হয়। অতএব এই প্রকারে কড়ি কোমলের ন্যায্য ও স্বাভাবিক পরিমাণ স্থিরীকৃত হওয়ার উৎকৃষ্ট উপায় রহিয়াছে।

বিশুদ্ধ অচল-ঠাটা		
		—সা'
		—নি
ধী-	-নো	
		—ধ
	-ধো	
পী-		
		—প
মী-	-পো	
		—ম
		—গ
	-গো	
রী-		
		—রি
সী-	-রো	
		—সা

গ হইতে ম কিম্বা নি হইতে সা যে পরিমাণে উচ্চ, সা হইতে কোমল-রি, কিম্বা রি হইতে কোমল-গ সেই পরিমাণে উচ্চ হইবে; অর্থাৎ সা-কে গ-বৎ মনে করিয়া তাহা হইতে ম-এর ন্যায় চড়াইলে কোমল-রি হইবে; রি হইতে কোমল-গ, প হইতে কোমল-ধ, ধ হইতে কোমল-নিও ঐ প্রকার নিয়মে উচ্চ হইবে। প-কে সা-বৎ মনে করিয়া তাহা হইতে নি-এর ন্যায় নামাইলে কড়ি ম হইবে; কিম্বা গ-কে ধ-বৎ মনে করিয়া তাহা হইতে নি-এর ন্যায় চড়াইলেও

কড়ি-ম হয়। সেই রূপ ধ-কে সা-বৎ মনে করিয়া তাহা হইতে নি-এর ন্যায় নামিলে কড়ি-প হইবে; কড়ি-সা, কড়ি-রি, ও কড়ি-ধ উচ্চারণেরও ঐ নিয়ম; অর্থাৎ রি, গ, ও নি-এর প্রত্যেককে সা-বৎ মনে করিয়া, তাহা হইতে নি-এর ন্যায় অর্দ্ধ স্বর নামিলে কড়ি-সা, কড়ি-রি, ও কড়ি-ধ হইবে। কোমল-রি হইতে কোমল-গ পূর্ণান্তর, তাহা ম হইতে প-এর ন্যায়,—অর্থাৎ কোমল-রি-কে ম-বৎ মনে করিয়া, তাহা হইতে প-এর ন্যায় চড়াইলে, কোমল-গ হইবে। কোমল-ধ হইতে কোমল-নিও ঐ রূপ। সা১ হইতে কোমল-নি উচ্চারণ কালে, সা-কে প-বৎ মনে করিয়া, তাহা হইতে ম-এর ন্যায় নামিলে কোমল নি হইবে, ম হইতে কোমল-গ নামিতেও ঐ রূপ, অর্থাৎ ম-কে প-বৎ মনে করিয়া তাহা হইতে ম-এর ন্যায় নামাইলে কোমল-গ হইবে। কোথায় কড়ি স্বর এবং কোথায় বা কোমল স্বর ব্যবহার হয়, তাহার নিয়ম ১৭শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অস্মদ্দেশীয় কোন কোন সঙ্গীতবিৎ লোকের এরূপ ভ্রান্ত সংস্কার যে, অর্দ্ধান্তর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অন্তর বিশিষ্ট স্বর হিন্দু সঙ্গীতে ব্যবহার হয়। এই সংস্কারের হেতু এই:—প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসমূহে গ্রামভেদ বুঝাইবার জন্য স্বরগ্রামকে ২২ শ্রুতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে; সংস্কৃত 'সঙ্গীতপারিজাত' কর্ত্তা এই শ্রুতির প্রত্যেকেতেই এক একটী স্বর স্থাপন পূর্ব্বক কাহাকে তীব্র, অতিতীব্র, তীব্রতম, কাহাকে কোমল, অতিকোমল, কোমলতম, বলিয়া কেবল বর্ণাড়ম্বর মাত্র করিয়াছেন, উহাদের ব্যবহারের স্থল দেখান নাই। আরো ঐ সকল গ্রন্থে গ ও ম-এর মধ্যে এবং নি ও সা-এর মধ্যে চারি চারি শ্রুতি নির্দ্দেশ করাতে, ঐ দুই অন্তর বৃহদন্তর হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে সঙ্গীতের ব্যবহার্য্য স্বর অবশ্যই স্থান পায়; এবং সেই স্বরকে তীব্র গ বা কোমল-ম, কিম্বা তীব্র-নি বা কোমল-সা বলাতে, একালের লোকের কাজেই ভ্রম হয় যে, তীব্র-গ হইতে ম-এর অন্তর হয়ত অর্দ্ধান্তর অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর।

সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যে ১২ প্রকার বিকৃত স্বরের কথা লিখা আছে, তাহার ৬টী গ ও ম, এবং নি ও সা-এর মধ্যগত অন্তরদ্বয়ের মধ্যে, এক এক শ্রুতি অন্তরে স্থাপিত করা হইয়াছে; ইহাতে কাজেই লোকের ভ্রম হয়। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতে গ হইতে ম, এবং নি হইতে সা-এর অন্তর বৃহৎ নহে,—ক্ষুদ্র—অর্থাৎ অৰ্দ্ধান্তর। অতএব আধুনিক সঙ্গীতে ক্ষুদ্রতর অন্তরের—অর্থাৎ সিকি স্বরের—ব্যবহার মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। সিকি স্বরের ব্যবহার সহজ সাধ্য নহে; কয়টা কাণের এরূপ ক্ষমতা হয় যে, ঐ প্রকার সূক্ষ্ম স্বরের প্রভেদ বিনা তুলনায় উপলব্ধি করিতে পারে? বিশেষ সিকি স্বর মিষ্ট ও তৃপ্তিজনকও হয় না; বরং উহার ব্যবহারের গান যথেষ্ট বেসুরা মত শুনায়। হিন্দুস্থানী

গানে অতিরিক্ত মিড়ের ব্যবহার বশতই মিড়ের সময় সিকি স্বর হইল বলিয়া ভ্রম হয়।

অনেক সঙ্গীত-বিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরও এই সংস্কার যে, ভারতীয় সঙ্গীতে সিকি স্বরের ব্যবহার হয়। তাঁহারা বিদেশী লোক; তাঁহাদের ঐ সংস্কার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তাঁহারা ভারতীয় গানের প্রচুর মিড ও গমক প্রভৃতির মধ্য হইতে স্বরসকল স্পষ্ট চিনিয়া লইতে না পারাতেই ঐ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। হার্মোনিয়মাদি যন্ত্রে ভারতীয় গীতাদি রীতিমত বাদিত না হওয়াতেই যে হিন্দু সঙ্গীতে সিকি স্বরের বর্ত্তমানতা প্রমাণিত হয়, তাহা নহে। ঐ সকল যন্ত্রের স্বর সুমধুব বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ নহে; ইহা ইউরোপীয় সঙ্গীতবেত্তাবাও স্বীকার করেন। আরও বিশেষ এই যে, উহাতে মিড হয় না, সুতরাং অশুদ্ধ এবং মিড হীন পর্দ্দায় কি প্রকারে ভারতীয় গান রীতিমত বাজিবে? ঐ অশুদ্ধতায় বহুমিল (হার্মনি) যুক্ত ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিশেষ হানি হয় না। ইউরোপের সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ ইচ্ছা ও যুক্তি করিয়া পিয়ানো, হার্মোনিয়ম্ প্রভৃতি যন্ত্রে স্বরসকল কিছু কিছু অশুদ্ধ, অর্থাৎ উচ্চ নীচ করতঃ, যথাসাধ্য সমান অন্তর (ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্ট্) বিশিষ্ট করিয়া লইয়াছেন, নতুবা বহুমিল, খবজ-পবিবর্ত্তন, এবং মুহুর্মুহু যড্জ-সংক্রমণ (ট্রান্সিশান্) প্রভৃতির জটিল কার্য্য সহজ-সাধ্য হয় না।

প্রাচীন হিন্দু গীতে যে সিকি স্বরেব ব্যবহার ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। বরং না থাকারই অনেক আনুষঙ্গিক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকাব সিংহভূপাল "সঙ্গীতসময়সাব" নামক গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"তে তু দ্বাবিংশতির্নাদা ন কণ্ঠেন পরিস্ফুটাঃ।
শক্যা দর্শয়িতুং তস্মাদ্বীণায়াং তন্নিদর্শনম্॥"*

অর্থাৎ শ্রুতি সকল বীণা যন্ত্র ভিন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য। আবও ঐ সকল প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে যে ১২ প্রকার বিকৃত স্বরের বর্ণনা আছে, তাহার একটীও গ্রামের কোন দ্বিশ্রুতিক অন্তরে অর্থাৎ অর্দ্ধান্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন সঙ্গীতেও সিকি স্বরের ব্যবহার ছিল না। খরজ-পরিবর্ত্তন কার্য্যে স্বরসকল এক শ্রুতি উচ্চ নীচ করার প্রয়োজন হয়; এতদ্ভিন্ন এক শ্রুতি উচ্চ নীচ স্বরের অন্য ব্যবহার নাই:—যেমন ধ কে খরজ কবিলে তাহার বৃহৎ তৃতীয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক গান্ধাব, পাইতে সা-কে যতটুকু কড়ি করিতে হয়, নি-কে

* পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও বাবু সারদা প্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত সঙ্গীত রত্নাকর', ৪২ পৃষ্ঠা।

খরজ করিলে, তাহার রিখব পাইতে সা-কে অধিকতর কড়ি করিতে হয়। ফলতঃ এই দুই প্রকার কড়ি কখনই একত্রে পর পর ব্যবহার হয় না। এত সূক্ষ্ম বিচার সুরের উপপত্তি ও গণিতেরই অঙ্গ, কর্ত্তবের নহে। যাহা হউক, হিন্দু সঙ্গীতে খরজ পরিবর্ত্তন প্রথা এখনও প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং ঐ রূপ তীব্রতম সুরেরও এখন প্রয়োজন নাই।

বাঙ্গলা 'সঙ্গীতসার' ও 'কণ্ঠকৌমুদী' নামক গ্রন্থদ্বয়ে কোমল ও অতিকোমল ভিন্ন অধিক প্রকার বিকৃত সুর ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু অতিকোমলেরও প্রয়োজন ছিল না। যে সকল রাগে আরোহণে সর্ব্বদা কোন সুরের পর তৎপরবর্ত্তী কোমল সুরের ব্যবহার হয়,—যেমন সা-এর পর কোমল রি, প-এর পর কোমল ধ, ইত্যাদি—তথায় ঐ রি ও ধ অধিক কোমল বলিয়া বোধ হয়; এবং যেখানে ঐ রূপ আরোহণ নাই, কেবল ঐ কোমলের পর তন্নিম্নে স্বাভাবিক সুরে অবরোহণ, তথায় তত কোমল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ঐ প্রভেদ মানসিক, বাস্তবিক নহে।

ঔপপত্তিক বিচারে কড়ি কোমলের নানা প্রকার ভেদ গণ্য হয় বটে; কিন্তু কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যথেচ্ছাক্রমে অতিকড়ি ও অতিকোমলের ব্যবহার গ্রাহ্য যোগ্য নহে। ইহাতে কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, রচয়িতার ইচ্ছাই উদ্দেশ্য, রাগ রাগিণীর মধ্যে অন্য উদ্দেশ্য আবার কি? এ কথা এখন আর ন্যায়ানুগত হইবে না। হিন্দু সঙ্গীত আজিকার নহে; ইহা পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক উপকরণ ইহাতে বর্ত্তিয়াছে; কেবল তাহা বিধিবদ্ধ হওয়ারই অভাব। অতএব বিজ্ঞানের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সঙ্গীতে আর গ্রাহ্য যোগ্য হইবে না। প্রাচীন প্রথা বলিয়া এক কথা উঠিতে পারে; কিন্তু তাহা তর্ক ও বিবাদেরই স্থল; তৎ সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত ভেদ হইতে পারে, অর্থাৎ পাঁচ জনে পাঁচ রকম বলিতে পারে। অতএব অলীক প্রাচীন প্রথার ভাণে, সত্য গোপন রাখিয়া, শিক্ষা ও কর্ত্তবের কাঠিন্য অকারণ বৃদ্ধি করা উচিত নহে।

স্বরগ্রামের মধ্যে কএকটী স্বাভাবিক সুর নব্য শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা প্রায়ই কঠিন হয়, ইহা দেখা যায়; যেমন রি, নি, ও ধ। আরোহণে নি, এবং অবরোহণে রি ও ধ বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা কঠিন হয়, অর্থাৎ ঐ ঐ সময়ে উহারা প্রায়ই কোমল হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, খরজের সহিত উহাদের মিলের সম্পর্ক অতি দূর। অতএব ঐ কাঠিন্য দূর হওয়ার এক সদুপায় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

নি প-এর সম্পর্কে উচ্চারিত হইলে বিশুদ্ধ হয়, কেননা নি প-এর বৃহত্তৃতীয়, অর্থাৎ পূর্ণ গান্ধার; অতএব প-কে সা মনে করিয়া, তাহা হইতে গ-এর ন্যায় চড়াইলে বিশুদ্ধ নি হইবে।

রি সতত একই নিয়মে উচ্চারিত হইলে বিশুদ্ধ থাকে না; উহা বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ম, প, ও ধ-এর সহিত মিল রাখিতে হয়; তাহাতে রি কখনও গ্রামের পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫৩ অংশের এক অংশ নিম্ন, কখন এক অংশ উচ্চ করিতে হয়। ম ও ধ-এর সম্পর্কে রি উচ্চারিত হইলে, তাহাকে এক অংশ নামাইতে হইবে, তখন রি সা হইতে ৮ অংশ উচ্চ হইবে; তাহা হইলে রি ম-এর পূর্ণ ধৈবত, কিম্বা ধ-এর পূর্ণ মধ্যম হইবে। কিন্তু প-এর মিলে উচ্চারিত হইলে, রি তাহার স্বাভাবিক তীব্র ভাবেই থাকিবে; কেননা সে অবস্থায় রি প-এর পূর্ণ পঞ্চম। ধ ও ম যে সকল রাগের জান (বাদী), অর্থাৎ অধিক ব্যবহার হয়, সেই সকল রাগে অবরোহণে ধ কিম্বা ম-এর পর রি উচ্চারণ সময়ে, ইহাকে এক অংশ নিম্ন করিতে হইবে।

ধ-স্বরও দুই ওজনে ব্যবহৃত হইবে: ম-এর মিলে উচ্চারিত হইলে উহার যাহা স্বাভাবিক ওজন, প হইতে ৮ অংশ উচ্চ, তাহাই থাকিবে; ম যে সকল রাগের জান, এবং যাহাতে কড়ি-ম নাই, তাহাতে ম-এর পর সর্ব্বদা ধ উচ্চারিত হইলে, উহা স্বাভাবিক নিম্ন ভাবেই থাকিবে; কারণ ঐ ধ ম-এর পূর্ণ গান্ধার। স্বাভাবিক রি-এর সম্পর্কে ধ উচ্চারণ করিতে হইলে, ধ-কে এক অংশ চড়াইয়া লইতে হয়, নতুবা ইহা রি-এর পূর্ণ পঞ্চম হয় না। যে সকল রাগে কড়ি ম ও প সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়, তাহাতেও ধ ঐ তীব্র ভাবে ব্যবহৃত হইবে; কারণ কড়ি-ম ও প সর্ব্বদা একত্রে গীত হইলে, তাহা স্বভাবতঃ নি ও সা-এর অন্তরের ন্যায় অনুভূত হয়, কেননা কড়ি-ম হইতে প-এর অন্তর নি হইতে সা-এর অন্তরের ন্যায় অর্দ্ধান্তর। অতএব প-কে খরজ মনে করিয়া ধ-কে ঐ খরজের রিখবের ন্যায় উচ্চ না করিলে স্বাভাবিক হয় না, তখন প হইতে ধ ৯ অংশ উচ্চ হয়। ধ-এর এই তীব্র ভাবের সহিত খরজের সুমিল না থাকাতেই, উহা স্বাভাবিক গ্রামে সন্নিবেশিত হয় নাই।

স্বাভাবিক গ্রামের রি ও ধ সম্বন্ধে উল্লিখিত রূপ ব্যবস্থা বিজ্ঞান ও যুক্তি, উভয় সম্মত হয় বটে, কিন্তু উহাতে এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, গ্রামের ৫৩টী সূক্ষ্ম অংশের এক এক অংশ উচ্চ ও নীচ যে কড়ি-ধ ও নিম্ন-রি, তাহা অনুধাবন পূর্ব্বক সাধনা করা সহজ সাধ্য নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা কঠিন নহে; কারণ, বিশুদ্ধ রূপ স্বরগ্রাম উচ্চারণের সাহায্যার্থ প্রথমে সর্ব্বদা এরূপ যন্ত্রের সংযোগে স্বরসাধনা করা

উচিত, যাহাতে গ্রামের সাত স্বরই পাওয়া যায়। সেই যন্ত্রে ধ বাজাইয়া তাহার সহিত মিল করিয়া রি উচ্চারণ করিলে, সেই রি সহজেই এক অংশ নিম্ন হইয়া পড়ে; এবং স্বাভাবিক রি বাজাইয়া তাহার মিলে ধ উচ্চারণ করিলে, সেই ধ সহজেই এক অংশ কড়া হইয়া পড়ে। প বাজাইয়া তাহার মিলে রি উচ্চারণ করিলে, সেই রি স্বভাবতই একাংশ কড়া হয়, এবং ম বাজাইয়া ধ উচ্চারণ করিলে, সেই ধ স্বভাবতই একাংশ নিম্ন হয়, ইত্যাদি। যন্ত্রে বাদিত অন্যান্য স্বরের সহিত মিলযোগ ভিন্ন স্বর-গ্রামের কোন স্বরই কাঁচা গায়কের পক্ষে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা সহজ সাধ্য নহে।

৫ম পরিচ্ছেদ :—স্বরলিপিতে সুরের স্থায়ী-কালজ্ঞাপক সংকেত।

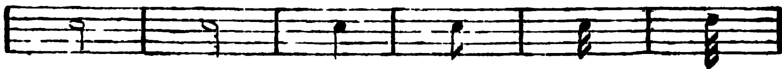
কণ্ঠে যে কোন স্বর উচ্চারণ করা যায়, তাহাতে কিছু না কিছু সময় ব্যয় হইয়া থাকে। সেই সময় বা কালকে মাপিবার জন্য যে একটী স্বল্পকাল আদর্শ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হয়, তাহার নাম "মাত্রা"। গানের প্রত্যেক স্বর ঐ আদর্শ কালের পরিমাণানুসারে কখন এক-মাত্র, কখন দ্বি মাত্র, কখন অর্দ্ধ-মাত্র, এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে স্থায়ী হইয়া থাকে, সাধারণতঃ হ্রস্ব কালকে লঘু, এবং দীর্ঘ কালকে গুরুকাল বলে। সার্গম স্বরলিপিতে সুরের ঐ প্রকার বিভিন্ন স্থায়িত্বের লিখন সঙ্কেত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

এক-মাত্র কাল স্থায়ী সুরের সংকেত এই রূপ (স :), অর্থাৎ সুরের গাত্রে দুই বিন্দু (কোলন্)। স :—: ইহার অর্থ দুই মাত্রা; স :—:—: ইহার অর্থ তিন মাত্রা, &দি; ঐ ক্ষুদ্র কসিদ্বারা পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘতা বুঝায়। (স, স :) ইহা দ্বারা দুইটী অর্দ্ধ মাত্রা বুঝায় অর্থাৎ একটী বিন্দুদ্বারা এক-মাত্র কালটী দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইল। স, স ইহা দ্বারা দুইটী সিকি মাত্রা বুঝায়, অর্থাৎ একটী কমা চিহ্ন দ্বারা অর্দ্ধ-মাত্র কালটী দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইল, তাহা হইলেই সিকি মাত্রা হইল। (স,স.স,স :) ইহা দ্বারা চারিটী সিকি মাত্রা বুঝায়, প্রত্যেক দুই সিকিতে একটী অর্দ্ধ মাত্রা পূর্ণ হয় বলিয়া, দুইটী সিকি মাত্রার পর কমা চিহ্ন না দিয়া, অর্দ্ধ মাত্রা জ্ঞাপক এক বিন্দু দেওয়া যায়; ঐ প্রকার দুই যোড়া সিকি মাত্রায় এক মাত্রা কাল পূর্ণ হওয়াতে, তথায় এক মাত্রা জ্ঞাপক কোলন্ চিহ্ন দিতে হয়।

যে স্থলে স্বরের গাত্রে কোন চিহ্ন না থাকিবে, তথায় অর্দ্ধ-সিকি অর্থাৎ দু-আনী মাত্রা, কিম্বা মাত্রার অষ্টমাংশ বুঝাইবে ; যথা (সস,) ইহাদ্বারা দুইটী একাষ্টমী অর্থাৎ দুইটী দু-আনী মাত্রায় এক চতুর্থ-মাত্রা কাল বুঝাইল। সস, স.স : ইহাতে দুই অষ্টমাংশ, একটী সিকি, ও একটি অর্দ্ধ মাত্রা বুঝাইল। কণ্ঠ-সঙ্গীতে মাত্রার অষ্টমাংশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ ব্যবহার হয় না, তজ্জন্য অষ্টমাংশের স্থানে কোন চিহ্ন প্রয়োগ হইবে না ; কেননা বহুবিধ সংকেত প্রয়োগে লিখন প্রণালী কেবল জটিল ও জবডজং হয় ; তাহা হওয়া উচিত নয়। যে স্থলে কোন নিমেষস্থায়ী স্বরের কাল পরিমাণ নিশ্চয় করা যায় না, তথায়ও ঐ রূপ মাত্রাচিহ্নহীন স্বরাক্ষর ব্যবহার হইবে।

খণ্ড মাত্রার আরো উদাহরণ যথা,—স-,স : ইহাতে একটী বার-আনী, অর্থাৎ তিন চতুর্থ, ও একটী সিকি মাত্রা ; স,স -: ইহাতে একটী সিকি ও একটী তিন চতুর্থ মাত্রা ; স,স,-,স : ইহাতে একটী সিকি, একটী অর্দ্ধ, ও একটী সিকি মাত্রা ; স.-,সস : ইহাতে একটী তিন চতুর্থ ও দুইটী একাষ্টম মাত্রা। স,-স স : ইহাতে একটী তিনাষ্টম অর্থাৎ ছয় আনী, একটী একাষ্টম, ও একটী অর্দ্ধ মাত্রা। উল্টা কমা (‘) চিহ্নদ্বারা মাত্রার তৃতীয়াংশ বুঝাইবে ; যথা স ‘স ‘স :, ইহা দ্বারা তিনটী এক তৃতীয় মাত্রা, বুঝাইল, স‘-‘স : ইহাতে একটী দুই তৃতীয় ও একটী এক তৃতীয় মাত্রা ; স‘স,- : ইহাতে একটী এক তৃতীয় ও একটী দুই তৃতীয় মাত্রা বুঝাইল। সাংকেতিক স্বরলিপিতে স্বরের ঐ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্থায়িত্বের লিখন সংকেত কিরূপ, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

সাংকেতিক স্বরলিপিতে মঞ্চস্থ স্বর-সূচক বিন্দুগুলির আকৃতিভেদে স্বরের স্থায়িত্ব ভেদ, অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘতার ভেদ হয়। স্বর সমূহের বিভিন্ন স্থায়ী কালের মধ্যে, ছয়টী স্থায়িত্বকে প্রধান করিয়া, সেই ছয় প্রকার স্থায়িত্বের ছয়টী বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের নাম ও আকৃতি যথা :—



মণ্ডল। বিশদ। মেচক। কৌণিক। দ্বিকৌণিক। ত্রিকৌণিক।

ঐ বর্ণ গুলির পুচ্ছ উপর নীচে, দুই দিকেই দেওয়া যায় ; যথা 𝅗𝅥 ♩ ♪. &c।

এবং কোণ-বিশিষ্ট উক্ত শেষ তিনটী বর্ণ একত্রে ব্যবহৃত হইলে, কোণের সংখ্যানুসারে স্থূল রেখারদ্বারা তাহাদিগকে পুচ্ছে পুচ্ছে যোগ করিয়া বন্ধকিত করা হয়, যথা :—



উক্ত কোণ-বিশিষ্ট বর্ণগুলি কোথায় ঐ প্রকার মোটা সরল রেখাদ্বারা সমকিত হইবে, এবং কোথায় বা পৃথক পৃথক থাকিবে, তাহার নিয়ম পর পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

উক্ত মণ্ডল, বিশদ, প্রভৃতি ছয়টী বর্ণের আনুপাতিক পরিমাণ এইরূপ, যথা :-

এক মণ্ডলে

দুই বিশদ,
কিম্বা

চারি মেচক,
কিম্বা

আট কৌণিক,
কিম্বা

ষোল দ্বিকৌণিক,
কিম্বা

বত্রিশ ত্রিকৌণিক।

উল্লিখিত কোন দুইটী বর্ণ যদি সমস্বর হয়, অর্থাৎ মঞ্চের উপর একই রেখা কিম্বা একই ঘরে স্থাপিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে যদি ছেদ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মস্তকে যে বক্র রেখা প্রয়োগ করা যায়, তাহার নাম "যোজক", যথা :—

এই প্রকার যোজিত উভয় স্বরের কাল পর্য্যন্ত কেবল একটী ধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত হইবে।

কোন বর্ণের পরে একটী ক্ষুদ্র বিন্দু স্থাপন করিলে, সেই বিন্দুতে ঐ বর্ণের অর্দ্ধকাল বর্ত্তিয়া বিন্দুযুক্ত বর্ণটী দেড়গুণ দীর্ঘ হয়, এবং দুইটি বিন্দু প্রয়োগ করিলে দ্বিতীয় বিন্দুতে প্রথমটীর অর্দ্ধকাল যোগ হইয়া, দ্বিবিন্দু যুক্ত বর্ণ পৌনে দুই গুণ দীর্ঘ হয়। যথা :—

:সা | —:

যে সকল অক্ষর দ্বারা গীতাদির মধ্যে ক্ষণিক নিস্তব্ধতা ব্যক্ত হয়, তাহাদিগকে "বিরাম" বলা যায়। বিরামও প্রধানতঃ ছয় প্রকার, যথা,—

মণ্ডল-বিরাম, বিশদ-বিরাম, মেচক-বিরাম, কৌণিক-বিরাম, দ্বিকৌণিক-বিরাম, ত্রিকৌণিক-বিরাম

মেচক বিরাম (একমাত্রা বিরাম) জন্য চিহ্নও ব্যবহার হয়। প্রকাশক।

বিরামের গাত্রে এক বা দ্বিবিন্দু প্রয়োগ করিলে, তাহাও দেড়গুণ, বা পৌনে দ্বি-গুণ দীর্ঘ হয়।

উল্লিখিত বর্ণ সমূহ দ্বারা স্বরের স্থায়ী কালের কেবল অর্দ্ধ-দ্বিগুণ ভাগের সংকেত প্রদর্শিত হইল। কালের তিন ভাগ লিখিবার জন্য, অর্থাৎ যেমন বিশদ, মেচক প্রভৃতিকে সমান তিন বা ছয় প্রভৃতি ভাগ করার জন্য যে নূতন ভিন্ন বর্ণ ব্যবহার হয়, তাহা নহে, কারণ অধিক চিহ্নে ও নামে স্বরলিপি অতিশয় জটিল ও দুরূহ হইয়া পড়ে। অতএব কালের তিন তিন ভাগ প্রদর্শনার্থ যে সংকেত অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা অতীব সরল।—বিশদের কালকে দুই ভাগ করিলে যেমন দুইটী মেচক লিখা যায়, তাহাকে তিন ভাগ করিলে তেমনি তিনটী মেচক লিখা যায়, মেচকের কালকে তিন ভাগ করিলে তিনটী কৌণিক লিখা যায়, কিন্তু সেই তিন বর্ণের মস্তকের বক্র রেখা-শীর্ষক একটী (৩) তিন লিখিয়া তিন ভাগের সংকেত করা হয়। যথা:—

ঐ সংকেতের সাধারণ ব্যাখ্যা এই যে, ঐ ৩ চিহ্নিত সমমাত্রিক বর্ণ ত্রয়ের দুইটীর কালে ঐ তিনটী বর্ণ সমান উচ্চারিত হইবে।

ইহাতে মেচকের একটী দুই তৃতীয়, ও এক তৃতীয় অংশ।

ইহাতে কৌণিকের একটী দুই তৃতীয় ও এক তৃতীয় অংশ।

এই প্রকার ৬ চিহ্নিত সম মাত্রিক বর্ণ ছয়টীর চারিটীর কাল মধ্যে ঐ ছয়টী বর্ণ সমস্থায়ী হইবে। ছয়টী দ্বিকৌণিক থাকিলে, একটী মেচকের কালে তাহা উচ্চারিত হইবে, ছয়টী কৌণিক থাকিলে, একটী বিশদের কালে তাহা উচ্চারিত হইবে, ইত্যাদি।

মাত্রার সমান পরিমাণানুসারে স্বরের বিভিন্ন স্থায়িত্ব পরিমাণের অভ্যাস করণার্থ নিম্ন লিখিত উপদেশের প্রতি প্রথম শিক্ষার্থীর মনোযোগ করিতে হইবে। প্রথমত, ভূমিতে অঙ্গুলীদ্বারা সহজে সমান সমান আঘাত দিয়া, তাহারই প্রত্যেক আঘাতকে এক মাত্রা রূপে গ্রহণ করিবে; সেই আঘাতের এক একটীর কালে যে স্বর উচ্চারিত হইবে, তাহা এক মাত্রা; তাহার দুইটীর কালে যে স্বর উচ্চারিত হয়, তাহা দুই মাত্রা; তিনটীর কালে উচ্চারিত স্বর তিন মাত্রা, এই রূপ বুঝিতে হইবে। দুই, তিন কিম্বা ততোধিক আঘাতের কাল পর্য্যন্ত একটী স্বর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম এই:—মনে কর, যদি সা শব্দের কালকে দুই কিম্বা তিন আঘাত পর্য্যন্ত স্থায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম আঘাতে সা বলিয়া, দ্বিতীয় আঘাতের উপর আ উচ্চারণ করিবে, যথা সা-আ, তাহা হইলে দ্বিমাত্রিক সা হইবে; আবার প্রথম আঘাতে সা উচ্চারিয়া, দ্বিতীয় আঘাতে আ, তৃতীয় আঘাতেও আ, যথা সা-আ-আ বলিলে, ত্রি-মাত্রিক সা হইবে। অতএব একাধিক আঘাতের কাল পর্য্যন্ত কোন অক্ষর স্থায়ী করিতে হইলে, প্রথমাঘাতে সেই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া, উহাতে আ-কার, ই-কার, উ-কার, বা ও-কার, যে কোন স্বর যুক্ত থাকে, পরবর্ত্তী আঘাতের সময় সেই সেই স্বরই কেবল উচ্চারিত হয়; যেমন তিন মাত্রিক রি, কিম্বা টু, কিম্বা গো বলিতে হইলে, রি-ই-ই, টু-উ-উ, গো-ও-ও, এই রূপ উচ্চারণ করিতে হয়।

অর্দ্ধ কিম্বা সিকি-মাত্রিক স্বর একটী কখন একাকী ব্যবহৃত ও উচ্চারিত হয় না, কেননা মাত্রা নিদর্শক আঘাত এক একবার ব্যতীত কখনই অর্দ্ধবার কিম্বা সিকিবার দেওয়া হইতে পারে না। একাঘাতের কাল মধ্যে দুইটি ধ্বনি সমান সমান কালে উচ্চারিত হইলে, তৎ প্রত্যেককে অর্দ্ধ মাত্রিক বলা যায়, এবং সমকাল স্থায়ী চারিটী ধ্বনি হইলে তৎ প্রত্যেকের নাম সিকি মাত্রিক হয়। সুতরাং মাত্রা ভগ্ন রূপে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক হইলে, দুইটী অর্দ্ধ মাত্রিক, কিম্বা চারিটী সিকি মাত্রিক, অথবা একটী অর্দ্ধ মাত্রিক ও দুইটী সিকি মাত্রিক, এই প্রকার বর্ণই একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছন্দের মধ্যে যে স্থলে কোন একটী ভগ্ন মাত্রিকের ব্যবহার হয়, তথায়, এক মাত্রার অবশিষ্ট কাল পূরণার্থ তৎকাল ব্যাপক আর একটী, বা তৎপরিমিত একাধিক ভগ্ন মাত্রিক অবশ্যই থাকে। যে স্থানে বর্ণের অকুলান হইতেছে, অথচ মাত্রা বা ছন্দ পূর্ণ হয় নাই, তথায় নিস্তব্ধতা দ্বারা অবশিষ্ট কাল টুকু পরিপূর্ণ করিতে হইবে; যথা স.: ইহাতে অর্দ্ধ মাত্রা সা, ও অর্দ্ধ মাত্রা নীরব বুঝিতে হইবে। সার্গম স্বরলিপিতে কমা, বিন্দু, ও কোলন সমূহের মধ্যবর্ত্তী স্থান শূন্য থাকিলে, তথায় তৎ কালানুসারে নীরবই থাকিতে হইবে।

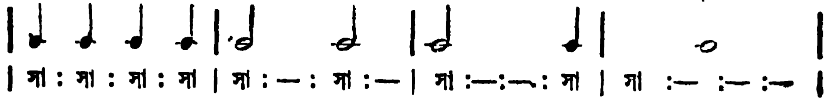
স্বরের স্থায়িত্বজ্ঞাপক পূর্ব্বলিখিত প্রধান ছয়টী বর্ণের কোন একটীকে মাত্রা রূপে গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন বর্ণের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে হয়। সচরাচর কোন গানে মেচক ও কোন গানে কৌণিক মাত্রা রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। যে স্থানে মেচক মাত্রা হয়, তথায় মণ্ডল হয় চতুর্মাত্রিক, বিশদ হয় দ্বি-মাত্রিক, কৌণিক হয় অর্দ্ধ-মাত্রিক, দ্বি-কৌণিক হয় সিকি-মাত্রিক, ইত্যাদি। যেখানে কৌণিক মাত্রা হয় তথায় বিশদ হয় চতুর্মাত্রিক, মেচক হয় দ্বি-মাত্রিক, দ্বি-কৌণিক হয় অর্দ্ধ-মাত্রিক, ইত্যাদি। কোথায় মেচক মাত্রা, ও কোথায় বা কৌণিক মাত্রা হয়, ইহা জ্ঞাপনার্থ গানের প্রথমেই কুঞ্চিকার পার্শ্বে ($\frac{২}{৪}$ $\frac{৩}{৮}$) এই প্রকার ভগ্নাংশের ন্যায় অঙ্ক লিখিত থাকিবে, তাহার বৃত্তান্ত তালের পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

সার্গম লিপির সহিত সাংকেতিক লিপির মাত্রার মিল দেখাইয়া, বিভিন্ন বর্ণের স্থায়িত্ব পরিমাণ করার অভ্যাসার্থ, নিম্নে কতকগুলি কাল-সাধন প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে কোথাও চারি, কোথাও তিন, কোথাও দুই মাত্রা অন্তরে ছেদ দ্বারা পদবিভাগ করা হইয়াছে। (১৪শ পরিচ্ছেদে পদবিভাগের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

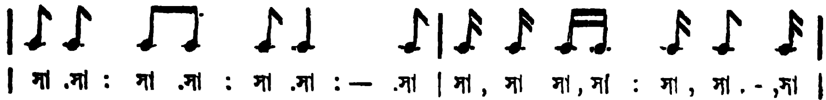
চতুর্মাত্রিক ও দ্বি-মাত্রিক ছন্দ।

মেচক মাত্রা :—

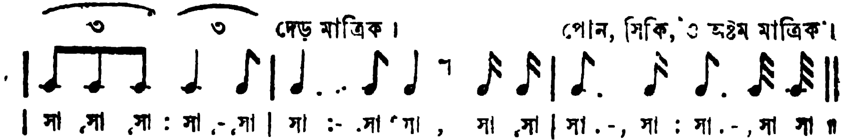
এক মাত্রিক। দ্বি-মাত্রিক। ত্রি-মাত্রিক। চতুর্মাত্রিক।



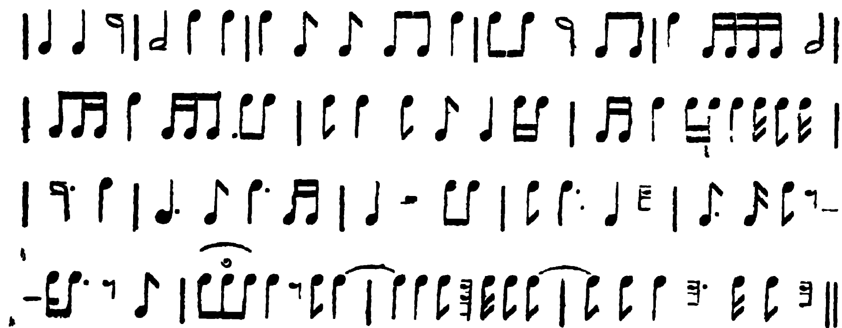
অর্দ্ধ মাত্রিক। সিকি মাত্রিক।



তৃতীয় মাত্রিক।



নিম্ন লিখিত সাধনের প্রত্যেক স্বরে —'লা'—এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের স্থায়িত্ব পরিমাণ কর।



না : না	না :-	না : না	- : না	না : -	- : -	না : না .না
.না .না : - .না	না.না : না.না	না : না.	না,না.না,না : না
না :- .না	না. -,না : না.-,না	: .না	না,না.না : না,না -,না
না :-.না,না	নানা,না.নানা,না : না. -,নানা	না-না.না : না
না.না.না ; না. - .না	না :- .	

ত্রিমাত্রিক ছন্দ।

নিম্ন লিখিত সাধন গুলিতে তিন তিন মাত্রা অন্তরে পদ বিভাগ করা হইয়াছে।

মেচক মাত্রা—
| সা :সা :সা | সা :— : সা | সা .সা : সা : - .সা | সা :—:— |

| সা : সা .সা : সা | সা : : সা | সা .সা : সা .সা : সা .সা | সা : — : ||

কৌণিক মাত্রা—
| সা : সা : সা | সা : - : সা | সা .সা .সা . . সা | সা :- ·- ||

নিম্ন লিখিত সাধন 'না' শব্দ যোগে উচ্চারিত হইয়া কালের পরিমাণ হইবে।

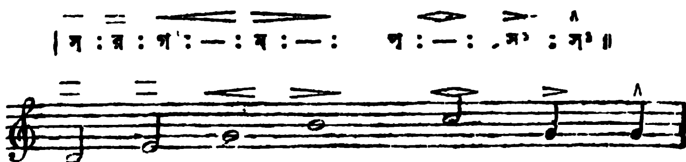
না : না : না	না : - : না	না . না :-	না :- :-	-- : না
না .না : না : না না	না. -- ,না : না.না : --	না : না : - .না
না . না , না : না .না .না : না .না .না	না : : .না
না : না : না.না.না.না	না .না.না : না :

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ :—গানের অলঙ্কার

সঙ্গীতের সমস্ত অলঙ্কার কণ্ঠভঙ্গী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সেই ভঙ্গী সুরের প্রবলতা ও মৃদুতার উপরই অধিক নির্ভর করে। ভঙ্গীহীন গান একঘেয়ে, এবং অতিশয় নীরস ও নিস্তেজ। যে বিচিত্রতা সঙ্গীতের জীবন, তাহা ঐ ভঙ্গী ব্যতীত সম্ভাবিত নহে। সেই ভঙ্গী গানের পদ্যের রস-ভাবের উপর নির্ভর করে। পাকা গায়ক মাত্রেই ভঙ্গী করিয়া গাইয়া থাকেন বটে। কিন্তু ওস্তাদেরা প্রায়ই নিরক্ষর জন্য উপযুক্ত স্থানে সুর প্রবল ও মৃদু করার রহস্য অবগত না থাকাতে তাহার নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাঁহার যে রূপ ইচ্ছা ও রুচি তিনি সেই রূপ করিয়াই গাইয়া থাকেন। ১১শ পরিচ্ছেদে এই বিষয় বিস্তারিত রূপে বিতর্কিত হইয়াছে।

আলোক ও ছায়া যেমন চিত্রের জীবন, উন্নত প্রকৃতির (আর্টিষ্টিক) গানেও তদ্রূপ সুরের 'আলোক' ও 'ছায়ার' বিশেষ প্রয়োজন; তাহা সুরের বলের তারতম্যের উপরই নির্ভর করে। সুরের বলভেদেরও সংখ্যা হইতে পারে না; তন্মধ্যে চারি প্রকার প্রধান; যথা—সমবল, এই = সংকেত; বর্দ্ধিত বল, এই ＜ সংকেত; হ্রস্ব বল, এই ＞ সংকেত; এবং স্ফীতি, এই ＜＞ সংকেত। ＜ ইহার তাৎপর্য্য মৃদু হইতে ক্রমশঃ বল বৃদ্ধি; ＞ ইহার তাৎপর্য্য প্রবল হইতে ক্রমশঃ মৃদু। স্ফীতনের অর্থ এই,—সুরকে প্রথমে মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমে বল বৃদ্ধি করতঃ মধ্যে বোলন্দ অর্থাৎ প্রবল করিতে হয়, তৎপরে আবার ক্রমে বল হ্রাস করতঃ মোলায়েম করিয়া, অতি মৃদু ভাবে শেষ করিতে হয়। সুরের স্ফীতন অর্থাৎ ফুলাই অতি মনোহর কার্য্য। কণ্ঠ সাধনার দোষে অনেক বিখ্যাত গায়কেও ঐ স্বর ভূষণটী আদায় করিতে পারেন না, এবং তাহার মর্ম্মও অবগত নহেন। ক্ষুদ্র এই ＞ কিম্বা এই ∧ চিহ্ন দ্বারা প্রস্বন, অর্থাৎ প্রবল স্বনন (accent) বুঝায়।

সুরের উল্লিখিত বল সূচক সংকেত সকল সার্গম ও সাংকেতিক উভয় স্বরলিপিতেই ব্যবহৃত হইবে। উহারা সুরের শিরোদেশেই সচরাচর আদিষ্ট হইয়া থাকে, যথা,—



সুরের বল ভাষার অক্ষর দ্বারাও সংকেতিত করা যায়,- অর্থাৎ বিভিন্ন বল বোধক শব্দের আদ্যক্ষর যোগে বল ভেদ লিখা যায়। যথা:—মৃদুর মৃ, প্রবলের ব, হ্রস্বের হ, ইত্যাদি। সুরের মস্তকে এই (ব) কিম্বা (*f*) প্রয়োগ দ্বারা সুরের প্রবলতা; (মৃ) কিবা (*p*) দ্বারা মৃদুতা*; (বৃ) দ্বারা বৃদ্ধি; এবং (হ) দ্বারা ধ্বনির হ্রাস বুঝাইবে। দুইটী (বব) কিম্বা (*ff*) দ্বারা অতীব প্রবল; দুইটি (মৃমৃ) কিম্বা (*pp*) দ্বারা অতীব মৃদু বা ক্ষীণ বুঝাইবে। মধ্যে বলের জন্য এই (ম) কিম্বা (*m*) সংকেত; (*mf*) দ্বারা মধ্য প্রবল; (*mp*) দ্বারা মধ্য মৃদু বুঝাইবে। এই সকল সংকেতও উভয় স্বরলিপিতে ব্যবহার হইবে। যথা—

ব *f* মৃ *p* বৃ.. হ. বব *ff* মৃমৃ *pp* ম *m* *mf* *mp*
স : স · গ : গ প . — : প : — . স৲ . স৲ : প : গ : ব : ব . স : — · স,

ব *f* মৃ *p* বৃ... হ.. বব *ff* মৃমৃ *pp* ম *m* *mf* *mp*

এতদ্ব্যতীত আর এক জাতি অলঙ্কার সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে আশ্, মিড়্, কম্পন, ও গিট্‌কারী কহে। ইহাদের সংস্কৃত সংজ্ঞা ব্যবহার নাই; সংস্কৃত গ্রন্থে ইহারা সকলেই "গমক"-এর প্রকার-ভেদ বলিয়া বর্ণিত আছে। (১২শ পরিচ্ছেদ দেখ।) উহাদের অর্থ ও সাধন নিয়ম নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

আশ্:—গানের কথার একটী অক্ষরে দুই বা ততোধিক সুর উচ্চারণ করাকে "আশ্" কহা যায়। সার্গম স্বরলিপিতে সুর সমূহের নিম্নে একটী সরল

| স . র : গ . গ
রা .... ম

বা · · ম, কা · · লী

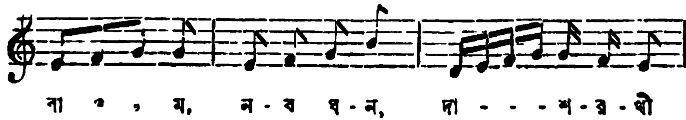
* বাঙ্গলা বর্ণাপেক্ষা *f* (*forte*), *p* (*piano*), *m* (*mezzo*), এই সকল ইতালীয় বর্ণ অধিক সুদৃশ্য জন্য ইহারাই আবশ্যক মত স্বরলিপিতে ব্যবহৃত হইবে।

প্রসিদ্ধ ইতালীয় ভাষায় *forte* (ফোর্তে) শব্দের অর্থ প্রবল, *piano* (পিয়ানো) অর্থ মৃদু, *mezzo* (মেদ্‌জো) শব্দের অর্থ মধ্য। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উহাদের মূল লাতিন ফোর্তিস্ (*fortis*), প্লানুস্ (*planus*), ও মেদিয়ুস্ (*medius*), এবং যথাক্রমে সংস্কৃত স্ফীত, পেলব (নরম), ও মধ্য, একই প্রাচীন ধাতু হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

রেখা আশের সংকেত। সংকেতিক স্বরলিপিতে স্বর সমূহের নীচে বা উপরে একটী বক্র রেখা প্রয়োগ দ্বারা উহা সংকেতিত হইয়া থাকে। যথা—

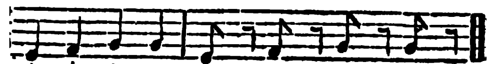
আশযুক্ত স্বর সমূহের মধ্যে মধ্যে কখন বিচ্ছেদ হইবে না; উহাদিগকে এক নিশ্বাসে লাগ্নিক রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। উক্ত উদাহরণে রা বর্ণ সা এ উচ্চারিত হইয়া, ঐ রা-এর আ-যোগে রি-গ উচ্চারণ হইবে। এই প্রকার যে অক্ষরে যে স্বর প্রযুক্ত থাকিবে, তৎ সহকারেই আশযুক্ত স্বর সকল উচ্চারিত হইবে।

সাংকেতিক লিপির কৌণিক দ্বিকৌণিক প্রভৃতি কোণ-বিশিষ্ট স্বরগুলি গানের একটী অক্ষরে, আশ যোগে, উচ্চারিত হইলে, তাহাদিগকে মোটা রেখা দ্বারা যমকিত করিয়া লিখিতে হয়; তখন আর পৃথক আশ চিহ্ন—বক্র রেখা—প্রয়োগ না করিলেও চলে।* যেখানে প্রত্যেক স্বর গানের প্রত্যেক অক্ষরে উচ্চারিত হয়, তথায় কোণ-বিশিষ্ট স্বরগুলি পৃথক পৃথক লিখিত হইয়া থাকে। যথা—



আশের বিপরীত "অলগ্ন" উচ্চারণ, অর্থাৎ প্রত্যেক স্বরোচ্চারণের পরই ক্ষণিক বিচ্ছেদ দেওয়া। তাহার সংকেত স্বরের মস্তকে এই প্রকার (!) তিলক বিন্দু চিহ্ন। তিলকযুক্ত স্বর অর্দ্ধ কাল মাত্র ধ্বনিত হইয়া বাকী অর্দ্ধ কাল নিস্তব্ধ থাকে; যথা—

| গ̇ : ম̇ | গ. : ম. |
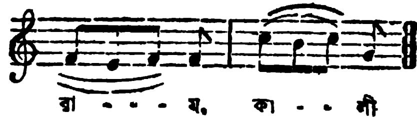


* কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্য সাংকেতিক লিপিতে গানের কথার জন্য গৎ লিখিবার সময় পৃথক আশ চিহ্ন—বক্র রেখা না দিলেও চলে। কিন্তু যন্ত্র সঙ্গীতের জন্য গতে, কোণগুলি যমকিত করা বা না করা, গৎ প্রকাশকের ইচ্ছাধীন। এরূপ স্থলে যমকিত কোণে আশ বুঝায় না। গতের অংশ বিশেষের ছন্দ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি স্বরের কোণ যমকিত করিয়া, গুচ্ছ করিয়া দেখানোর রীতি ইউরোপীয় সঙ্গীতে আছে। কিন্তু যন্ত্র সঙ্গীতের গতে আশ বুঝাইতে হইলে, আশ চিহ্ন (বক্র রেখা) দেওয়া ইউরোপীয় মতে আবশ্যক।

হিন্দুস্থানী সংগীতে অলগ্ন প্রায় ব্যবহার নাই।
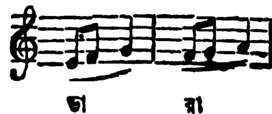
মিড়্:—অতি ঘন সংলগ্ন যে আশ, তাহাকে মিড় বলা যায়। তাম্বুরার
এই লিখার এই উচ্চারণ   এই লিখার   এই উচ্চারণ
তারে ঘা দিয়াই কাণে পাক দিলে, গোঁআও করিয়া ধ্বনি যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চ, কিম্বা নীচ হয়, তাহাই মিড়ের আওআজ। শৃগালের রবে মিড় প্রসিদ্ধ। মিড়েও এক অক্ষর যোগে দুই তিন স্বর উচ্চারিত হয়। সার্গম স্বরলিপিতে স্বরের নিম্নে দ্বিত্ব সরল রেখা মিড়ের সংকেত; এবং সাংকেতিক স্বরলিপিতে দ্বিত্ব বক্র রেখা মিড়ের সংকেত। যথা—

| স ন, : স . স |
রা .... ম



আশ হইতে মিড়ের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য অগ্রে মিড়ের মূল তত্ত্বানুসন্ধান করা যাউক:—বীণ ও সেতার যন্ত্রের বাদন হইতে মিড় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সারঙ্গী, এস্‌রার, সারবীণ, প্রভৃতি ছড় (ধনু) বিশিষ্ট যন্ত্রে; এবং সরোদ, রবাব, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি ছড়হীন যন্ত্রে মিড় কথার ব্যবহার নাই। বীণ ও সেতারে পর্দার উপর একাঘাতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর, আঙ্গুলী বিক্ষেপ দ্বারা স্পষ্ট ধ্বনিত হয় না; যেমন—

| স . ব : গ |
ডা ....



উক্ত প্রথম স্বর সা-এ মিজ্রাবের আঘাত জন্য, উহা যে প্রকার বলে রণিত হয়, রি ও গ-এর ধ্বনিতে সে বল আর থাকে না; ইহারা অতীব নরম ও ক্ষীণ হইয়া যায়। অতএব কণ্ঠে একাক্ষর যোগে ভিন্ন ভিন্ন স্বর যে ভাবে উচ্চারিত হয়, সেতারাদি যন্ত্রে কণ্ঠের ঐ কার্য্যের অনুকরণ করিতে হইলে, পর্দার উপর বাম হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা তার টানিয়া বিভিন্ন স্বর উৎপন্ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই;—এই রূপে তার টানার নামই "মিড়্"। ইহাতেও কণ্ঠের উল্লিখিত কার্য্যের যে অবিকল অনুকরণ হয়, তাহাও নহে। সেই হেতু বীণ ও সেতারে গলার অনুকরণে গান বাদন কখনই হয় না। সারঙ্গী, এস্‌রার, বেয়ালা প্রভৃতি ছড়-বিশিষ্ট যন্ত্রে অবিকল গলার অনুকরণে

গান বাধিত হইয়া থাকে। সেতারাদি যন্ত্রে উক্ত মিড়ের সহযোগে গানের সুরের কেবল আভাষ মাত্র প্রকাশিত হয়। সারঙ্গী, এস্‌রার প্রভৃতি যন্ত্রে অঙ্গুলীর ঘষিট্‌ (ঘর্ষণ) দ্বারা ঐ মিড়ের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ঐ প্রকার মিড় ও ঘষিট হইতে এই একটী বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এই যে, সা হইতে রি ঐ প্রকারে ধ্বনিত হইলে, ঐ দুই সুরের মধ্যগত অন্তরটীও ধ্বনিত হয়, অর্থাৎ সা হইতে সুর যেন রি-এ গড়াইয়া পড়ে, কিম্বা সা হইতে সুরকে যেন হিঁচিড়িয়া লইয়া রি-এ স্থাপন করা হয়। আশে তাহা হয় না। ছড়ের এক টানে বিভিন্ন অঙ্গুলী যোগে বিভিন্ন সুর ধ্বনিত করাকেই আশ্‌ বলা যায়। আশ্‌ হইতে মিড়ের ঐ প্রকার প্রভেদ। কিন্তু কণ্ঠে আশ্‌ হইতে মিড়ের প্রভেদ করা কঠিন কার্য্য; দীর্ঘস্বর ভিন্ন পার্থক্য পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হয় না। একাক্ষর যোগে কোন দুই সুর উচ্চারণ কালে প্রথমটী ফুলাইয়া দ্বিতীয়টী মধ্যম বলে উচ্চারণ করিলেও মিড়ের ন্যায় শুনায়। অতএব গানের স্বরলিপিতে মিড়ের সংকেত চিহ্ন রেখা না দিয়া আশের ন্যায় একটী রেখা এবং স্ফীতন ও মধ্য চিহ্ন প্রয়োগেও ঐ ফল হইতে পারে। যথা:—

mf
| গ : প : ম |
য়া - - - ম

mf
য়া - ম

আমার বিবেচনায় গানে মিড়ের জন্য পৃথক সংকেত না দিয়া ঐ প্রকার করিয়া লিখাই উচিত, কেন না সংকেত বৃদ্ধি করিয়া স্বরলিপি কঠিন করা উচিত নহে। কিন্তু সেতারাদি যন্ত্রের সংগীতে কার্য্যের প্রভেদ জন্য মিড়ের পৃথক সংকেত ব্যবহার না করিলে চলিতে পারে না। কণ্ঠে বিলম্বিত আলাপে ও বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদ গানে মিড়ের পৃথক সংকেত প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থলে নব্য শিক্ষার্থীদিগের প্রতি এই উপদেশ যে, তাঁহারা আলাপ ও গানে মিড়ের সংকেত দেখিয়া হতাশ না হন; প্রথমতঃ সেই সকল স্থান ঘন আশ্‌ যোগে উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে; তৎপরে যন্ত্রে কিম্বা অভ্যস্ত গায়কের মুখে রাগাদির আলাপ শুনিতে শুনিতে, আশ্‌ হইতে মিড়ের পার্থক্য যেটুকু হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সাধারণ বাঙ্গালা গানে আশ্‌ মিড়ের তত বিচার নাই, কারণ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা

বেয়ালার সঙ্গতে গান গাওয়ার অভ্যাস হওয়াতে, মিড় অপেক্ষা আশের ব্যবহার অধিক হইয়াছে; কেন না বেয়ালায় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলী দ্বারা বিভিন্ন স্বর ধ্বনিত হওয়াতে মিড়ের কার্য্য অত্যল্পমাত্র হয়। হিন্দুস্থানে কখন বেয়ালার ব্যবহার নাই; তথায় গানের সহিত সর্ব্বদা সারঙ্গী, সারিন্দা প্রভৃতির সঙ্গত হওয়াতে, হিন্দুস্থানী গানে মিড়ের ব্যবহার অধিক হইয়াছে; কারণ সারঙ্গী, সারিন্দা, সারবীণ প্রভৃতি পর্দা বিহীন যন্ত্রে স্বর সকল ঘষিট্ (মিড়) যোগে ধ্বনিত করাই সহজ; উহাতে পৃথক পৃথক, অলগ্ন ভাবে স্বর সকল বাদন করা অতিশয় কঠিন; এই হেতু সকল গানই ঘষিট্ যোগে বাদিত হইয়া থাকে। যন্ত্রের এই প্রকার প্রকৃতিগত ব্যবহারের বিভিন্নতাই ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় গানের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ার মূল কারণ।

কণ্ঠে কিম্বা যন্ত্রে মিড় ক্রিয়ার মধ্যে সিকি স্বর উৎপন্ন হয় বলিয়া অনেক সময় ভ্রম হয়। যেমন—ম-এর পর মিড় যোগে গ-ম উচ্চারণ করিতে, সম্পূর্ণ গ পর্য্যন্ত না নামিয়া কিছু বাকী থাকিতেই উজান মুখে আরোহণ করিয়া ম-এ অবস্থিতি করিলে, উচিত স্থান পর্য্যন্ত না নামিয়াই যে আরোহণ হইয়াছে, সেই দোষের জন্য কর্ণ বিরক্ত হয় না, কেন না তখন ইহা ম শুনিবার জন্যই ব্যগ্র থাকে; এদিকে পূর্ণ অর্দ্ধ স্বর উচ্চারণ না হওয়াতে সিকি কিম্বা এক-তৃতীয় স্বর যে উৎপন্ন হইল, কর্ণ তাহাতে আপত্তি না করাতে তাহাই ন্যায্য বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুত কণ্ঠের আলস্য বশতই ঐ প্রকার অশুদ্ধ কার্য্য সমূহের উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য সতর্ক থাকা উচিত।

কম্পন*:—এইটী গানের সুন্দর ভূষণ। স্বর কি প্রকারে কাঁপান যায়, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন, একই স্বর বারম্বার দ্রুত উচ্চারণ করিলে কম্পন হয়। ভয়ে অতিশয় অভিভূত হইয়া বাক্যোচ্চারণ করিলে স্বর-কম্পন হইয়া থাকে; কারণ তখন সর্ব শরীর থর থরায়মান হইয়া কম্পিত হওয়াতে, কণ্ঠস্বরও কাঁপিয়া যায়। অতএব স্বর কম্পনের রূপ অনুভবার্থ স্বরোচ্চারণ করিয়া বাহুদ্বয় দ্রুত সঞ্চালন করিলে জানা যাইবে, কণ্ঠস্বরও কেমন কম্পিত হয়। সেই প্রকার কম্পন, বাহু স্থির রাখিয়া কিসে কণ্ঠে বাহির হয়, তাহারই চেষ্টা নব্য শিক্ষার্থীর করিতে হইবে। বাহু সর্বদা সঞ্চালন করিলে, ঐ একটা মুদ্রা দোষ হইয়া যাইবে;

* কোন কোন আধুনিক বাঙ্গলা গ্রন্থে 'গমক' স্বরের কম্পন বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ন্যায়-সঙ্গত হয় না; কারণ সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে দেখা যায় যে, গমক কেবল কম্পন নহে,—আশও গমক, মিড়ও গমক, ঘষিটও গমক, গিটকারীও গমক, ইত্যাদি। ইহাতে আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে স্বরলিপির ব্যবহার ছিল না, থাকিলে আশ্, মিড়, ঘষিট, প্রভৃতির পৃথক সংজ্ঞা সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থাদিতে অবশ্যই পাওয়া যাইত।

তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। হিন্দুস্থানী গানে স্বর কম্পনের অধিক ব্যবহার বশতঃ গায়কের কম্পন সাধিতে সাধিতে শেষে অনেক কণ্ঠের এমন স্বভাব হইয়া যায় যে, কিঞ্চিৎ কম জোর, কিম্বা বয়োধিক হইলে, আর স্থির ভাবে স্বরোচ্চারণের ক্ষমতা থাকে না। ইহার বহু জীবিত দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। এই দোষের জন্যও সতর্ক হওয়া উচিত। অস্থির যে ধ্বনি, তাহাকেই কম্পিত সুব বলা যায়। কম্পিতাবস্থায় সুর একবার একটু (অর্দ্ধ স্বর) নামে, একবার একটু চড়ে, এই প্রকার যেন শুনায়। যেমন, সা-সুর কাঁপাইলে নি১-সা-নি১-সা এই প্রকার বারম্বার হয়, এই রূপ যেন অনুভূত হয়। পরন্তু একই সুর কোন স্বর (ভাউএল্) যোগে বারম্বার দ্রুত উচ্চারণ করিলেও সেই সুর কম্পিত মত হয়। অতএব স্বরলিপিতে, কতকগুলি দ্রুতগতি সমসুরে আশ-চিহ্ন যোগ করিলে, সহজেই কম্পনের সংকেত হইয়া থাকে। যথা—



স .স . স ,স

আ ....

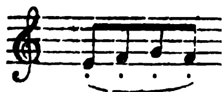
ঐ সংকেত সংক্ষেপ করণার্থ সুরের মস্তকে এই (ʬ) চিহ্ন প্রযোগেও কম্পনের সংকেত হয়। তাহার কার্য্য এই রূপ, যথা :—



ʬ
স = স

এই লিখার এই উচ্চারণ। এই লিখার এই উচ্চারণ।

গিট্‌কারী* ঃ—কতকগুলি দ্রুতগতি সুর আশ্ সহকারে উচ্চারণ করাকে গিট্‌কারী কহে। গিট্‌কারী দুই প্রকার ; শাদা, ও সগমক। টপ্পা ও ঠুংরীতে শাদা গিট্‌কারী ব্যবহার হয়, এবং ধ্রুপদ ও খেয়ালে সগমক গিট্‌কারী ব্যবহার হইয়া থাকে। কণ্ঠ যথেষ্ট মার্জ্জিত না হইলে সগমক গিট্‌কারী পরিষ্কার রূপে নির্গত হয় না। স্বরলিপিতে ইহার সংকেত সুরের মস্তকে বিন্দু ও আশ চিহ্ন ; যথা,—

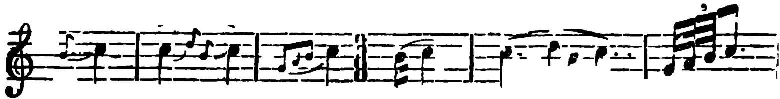


| গ . ম : প . ম |

* গিট্‌কারী হিন্দী শব্দ : ইহা গাঁট (গ্রন্থি) শব্দের রূপান্তর। সুর বাঁশের এক পাবের ন্যায়, শাদামত দীর্ঘ না হইয়া, সেই কালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সুর উচ্চারিত হইলে বাঁশের ঘন গাঁটের ন্যায় তাহার উপমা হয়, এই জন্য সেই কার্য্যের নাম 'গিট্‌কারী' হইয়াছে।

ইহাতে প্রত্যেক স্বর প্রস্বনিত অথচ সংলগ্ন ভাবে উচ্চারিত হইবে। সাধন প্রণালীতে গিট্‌কারী সাধনের যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটী আ, ই, উ, এ, ও, এই পাঁচটী স্বর যোগে সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে হইবে। এক এক বারে এক একটী স্বর সহকারে প্রথমে ধীরে, পরে ক্রমে দ্রুত সাধন করিবে। প্রথমে ব্যস্ত হইয়া দ্রুত সাধা অতি নিষিদ্ধ; তাহাতে শ্রম ব্যর্থ যায়, এবং কুফল হয়। হিন্দুস্থানী গানে কম্পন ও গিট্‌কারীর ব্যবহার অধিক থাকাতে, শৈশবাবধি উহা শুনিতে শুনিতে হিন্দুস্থানী লোকের কণ্ঠে ঐ সকল সহজে আদায় হয়, অধিক সাধনা না করিলে অস্মদ্দেশীয় লোকের উহা আয়ত্ত হয় না।

ভূষিকা ঃ—অনেক সময়ে কোন স্বরের পূর্ব্বে কিম্বা পরে এমন এক বা ততোধিক অতীব অল্পকাল স্থায়ী স্বর উচ্চারিত হয়, যাহাদের কাল পরিমাণের নিশ্চয়তা হয় না; সেই সকল নিমেষস্থায়ী স্বরকে "ভূষিকা" কহা যায়। সাংকেতিক স্বরলিপিতে ক্ষুদ্রতর বর্ণদ্বারা ভূষিকা লিখা যায়, যথা—



এই লিখার এই উচ্চারণ

যে কালের সংকেত যোগে ভূষিকা লিখিত হয়, সেই কালটী তালের মাত্রা সমষ্টির মধ্যে ধরা হয় না। সর্ব্বদা আশ* বা মিড্‌† যোগেই ভূষিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কতকগুলি ভূষিকা একত্র হইলে গিট্‌কারী হয়,—যেমন উপরে (গ) চিহ্নিত পদ। সার্গম স্বরলিপিতে মাত্রা চিহ্নহীন স্বর দ্বারা ভূষিকার উদ্দেশ্য সাধিত হয়; যথা— । মগ : ম। ঐ প্রথম ম-টী ভূষিকা।

* আশ্‌ আশা শব্দের রূপান্তর; একটী স্বরেই উচ্চারণ কার্য্য একেবারে নিবৃত্ত না হইয়া, আরো খানিক উচ্চারণ যে বাকি আছে, অর্থাৎ আশা আছে, সেই কার্য্যের নাম 'আশ' রাখা হইয়াছে।

† মিড্‌ হিন্দী শব্দ; ইহা মৃদ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন মাড়া (মর্দ্দন) শব্দের রূপান্তর,—যেমন ধান মাড়া, ঔষধ মাড়া ইত্যাদি। সাধারণ ব্যবহার বশতঃ বাদ্য যন্ত্রে তার ঘর্ষণের নাম 'মিড' হইয়াছে। অনেকে ভ্রম বশতঃ মিড়কে মূর্চ্ছনা বলেন। কিন্তু মূর্চ্ছনার অর্থ ভিন্ন, তাহা ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ—রাগ রাগিণীর উৎপত্তি বিষয়ক যুক্তি-বিচার।

ভারতবর্ষের কোন প্রাচীনতম বিষয়েরই বিশস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন বিষয়ের তত্ব মীমাংসা করিতে হইলে, অবস্থা সঙ্গত যুক্তিই একমাত্র উপায়; অতএব সেই রূপ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক রাগাদির উৎপত্তির বৃত্তান্ত স্থির করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতীয় সঙ্গীতের আদি রাগ-রাগিণী যে কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণেরাও উহাদের রচয়িতার অনুসন্ধান না পাইয়া, উহারা দেব-সৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ যেমন সংস্কৃত ভাষা ও তাহার বর্ণমালাকে দেব-দত্ত বলিয়াছেন, সঙ্গীতের আদি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধেও তদ্রূপ বলাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভাষা যেমন মানব সমাজে আদি কাল হইতে আপনা আপনিই মনুষ্যের জাতীয় শক্তি বলে সমুদ্ভুত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, আদি রাগ-রাগিণী গুলিও তদ্রূপ; অর্থাৎ উহাদিগকে কেহ ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়া রচনা করে নাই; পাঁচ রকম গাইতে গাইতে যে স্বর-বিন্যাস আদি গায়কের অধিক পছন্দ হইয়াছে, তাহাই তিনি সর্ব্বদা গাওয়াতে, তাঁহার সন্তানেরাও ঐ স্বর গাইতে শিক্ষা করে; এই রূপে ঐ স্বর-বিন্যাস বংশাবলী পর্য্যন্ত চলিয়া আইসে।

অনেকে ঐ কথা সম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু যাঁহারা ভাষার উৎপত্তি তত্ব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উহা অনায়াসেই বুঝিবেন, এবং প্রত্যয়ও করিবেন, সন্দেহ নাই। অনেক পক্ষী অতি সুন্দর গান করে, এবং কত রকম স্বর-ভঙ্গী করে; তাহা কে রচনা করিল, ও কে শিখাইল? কেহই নয়; ঈশ্বর-দত্ত কণ্ঠ থাকাতে প্রয়োজনানুসারে তাহারা আপনা আপনিই গায়। অতএব অবোধ পক্ষীবা যদি আপনি গাইতে পারে, সুবোধ মনুষ্য কেন না পারিবে?

ভারতবর্ষ অতি প্রকাণ্ড দেশ; ইহার ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বিভিন্ন সমাজ, অর্থাৎ জাতি। প্রত্যেক জাতির যেমন পৃথক ভাষা,—লোকে বলে "যোজনান্তর ভাষা," তেমনি বিভিন্ন সমাজ প্রচলিত গানের স্বর-বিন্যাসও পৃথক। সমাজের প্রথমাবস্থায় এক জাতির একটী স্বর-বিন্যাস ভাষার ন্যায় পুরুষানুক্রমে সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া,

সেই বিন্যাসটী অনুসারে ঐ জাতির সকল লোকেই গাইয়া থাকে। সেই পৈতৃক স্বর-বিন্যাস ব্যতীত কোন নূতন স্বর সেই প্রাচীন অনুন্নত সমাজে সমাদৃত হওয়া সম্ভব নহে, কেন না শিক্ষার নিয়ম ভাবে উহা অভ্যাস করা কঠিন। বালকে যেমন মাতা পিতার নিকট ভাষা শিক্ষা করে, তেমনি সর্ব্বদা শুনিতে শুনিতে মাতা পিতা যাহা গায়, সন্তানেরও তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই জন্য স্বর-বিন্যাসের সংখ্যাও সহসা বৃদ্ধি পায় না।

ভাষার দ্বারা যেমন ভিন্ন জাতীয় লোক চিনা যায়, গানের স্বর-বিন্যাসের দ্বারাও তেমনি চিনা যাইতে পারে; কেন না এক জাতির গানের স্বর অপর জাতির স্বর হইতে পৃথক। এখনও ইহার ভূরি প্রমাণ ভারতের অনুন্নত জনসমাজের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ঐ সকল সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনুধাবন সহকারে শ্রবণ করিলে, তবে জানা যায়; বাহির হইতে সহসা তাহা বুঝা যায় না। এমনও অনেক স্থানে দেখা যায় যে, সমাজের উন্নতি অনুসারে অনেক জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ও উৎসব বিষয়ক গানের স্বর পৃথক: যেমন বিবাহের স্বর এক প্রকার, অন্ন-প্রাশনের আর এক প্রকার, নবান্নের স্বর এক প্রকার, দোল যাত্রার আর এক প্রকার, ইত্যাদি। আবার নিতান্ত অনুন্নত সমাজের মধ্যে একই প্রকার স্বর-বিন্যাস সম্বলিত গান তাবৎ ক্রিয়াতেই ব্যবহৃত হয়,—যেমন পূর্ব্ব হিমালয়ের উপত্যকাবাসী মেচ জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত এক এক প্রকার স্বর-বিন্যাস এক একটী রাগ নামে অভিহিত হইয়াছে। আদিতে কোন প্রথম সঙ্গীত শাস্ত্রকার ঐ রূপ কয়েকটী স্বর-বিন্যাস সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের ছয়টীকে রাগ, ও ৩০ বা ৩৬টীকে রাগিণী বলিয়া, এবং তাহাদেব পৃথক পৃথক নাম দিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই আদি শাস্ত্রকার যে কে, তাহা এক্ষণে জানা যায় না। সঙ্গীতের নানা মত ভেদ আছে বটে, কিন্তু প্রায় সকল মতেই ছয়টী আদি রাগের কথাই শুনা যায়; কারণ ঐ আদি সংগ্রহকারের মতই ভাবী গ্রন্থকারগণ অবলম্বন করিয়াছেন।

এক্ষণে ঐ ছয় রাগ সুযোগ্য কালাবঁৎ ব্যতীত যে সে গাইতে পারে না; উহা আদি কালের অশিক্ষিত জনসমাজে যে কি প্রকারে গীত হইত, ইহার তাৎপর্য্য অনায়াসেই বুঝা যায়,—যেমন এক্ষণে বেদের ভাষা অতি দূরদর্শী সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশারদ পণ্ডিত ব্যতীত সকলে বুঝিতে পারে না; কিন্তু অতি প্রাচীন কালে ঐ ভাষা যাহাদের মাতৃ-ভাষা ছিল, তাহাদের মধ্যে সুবোধ অবোধ সকলেই উহা বুঝিত। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী কোন শাস্ত্রকারের সৃষ্ট নয়, উহা সংগ্রহ মাত্র। তাহার আরও প্রমাণ এই যে, প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বিভিন্ন মতে উহাদের মূর্ত্তির সামঞ্জস্য নাই; উহাদিগকে যিনি

যেরূপ শুনিয়াছেন, তিনি তদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন স্বর বিন্যাসকে আদি ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী বলিয়াছেন; কেহ কেহ আদি রাগিণী ৩০টী মাত্র বলিয়াছেন। একই রাগ বিভিন্ন গায়কে যে বিভিন্ন রকমে গায়, তাহা এখনও যেমন, পুরাকালেও তদ্রূপ ছিল; অতএব একই রাগ বিভিন্ন গায়কের নিকট হইতে বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইলে, কাজেই তাহার মূর্ত্তিরও বিভিন্নতা হয়।

লোকে যে বলে, নূতন রাগ কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা নহে। কৌশলী লোকে নূতন নূতন স্বর-বিন্যাস অনায়াসে রচনা করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই সকল স্বর-বিন্যাসে জাতিত্ব পরিচায়ক গুণ সহসা বর্ত্তে না বলিয়া, তাহাদিগের "রাগ" সংজ্ঞা হয় না; তাহাদিগকে কেবল নূতন স্বর-বিন্যাস মাত্র বলা যায়। এই জন্ত ইউরোপীয় সঙ্গীতকে রাগাত্মক বলা যায় না। কিন্তু যে জনসমাজে দুই একটী স্বর-বিন্যাস লইয়া পুরুষানুক্রমে সকলেই সকল বিষয়ক গান গায়, সেই স্বর-বিন্যাসই রাগ নামে বাচ্য হইতে পারে।

অনেক রাগ-রাগিণীর নাম দেশের নামে খ্যাত; তাহা যে সেই সেই দেশ হইতে সংগৃহীত, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। অধুনা সেই সেই স্বর-বিন্যাস তত্রত্য সাধারণ্যে প্রচলিত নাও থাকিতে পারে, কেন না ভাষা যেমন কালে পরিবর্ত্তন হয়, সাধারণ্যে গেয় স্বর-বিন্যাসও যে কালবশে পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি? কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে গানের বৈদর্ভী, লাটী, পাঞ্চালী, এই প্রকার নানা রীতির কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল রীতি বিদর্ভ, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

পুরাকালে যাহারা সঙ্গীত ব্যবসা করিত তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে স্বর-বিন্যাস সংগ্রহ করিয়া পুঁজি বৃদ্ধি করিত; তাহাদের সেই ব্যবসায় পৈতৃক ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল গায়কের নিকট হইতেই সঙ্গীত বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কেহ কখন নূতন রাগ রচনা করিয়া যে চালাইয়াছেন, তাহা প্রতীয়মান হয় না; সমস্তই সংগ্রহ। লোকে আমীর খস্রু, তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা ওস্তাদগণকে কোন কোন রাগের যে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে, তাহা নূতন রাগ নহে; প্রাচীন দুই তিন রাগ মিশ্রিত হইয়া সে সকল প্রস্তুত হইয়াছে।

রাগ-রাগিণী যে সহসা লোকে বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ—রাগাদির দেশগত জাতি বিশেষত্ব। নব্য শিক্ষার্থীরা যেমন বিদেশীয় ভাষার বাক্-ব্যবহার (ইডিয়ম্) সহজে বুঝিতে পারে না, রাগ-রাগিণীও তদ্রূপ; অনেক না শুনিলে মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম হয় না।

ভাষার ইডিয়ম্ ব্যাকরণের কোন গূঢ় সূত্রের উপর নির্ভর করে না; উহা বুঝিতে হইলে তত্তদ্ভাষীয় লোকের মুখে তাহাদের বাক্-ব্যবহার সর্ব্বদা শুনা প্রযোজন করে। বাক্-ব্যবহার শিক্ষা ও আয়ত্ত হইলেই যে ভাষাতেও পাণ্ডিত্য জন্মে, তাহা নহে; এতদ্দেশে অনেক ইংরাজের খান্‌সামা ও পাচকগণ সুন্দর ইডিয়ম্ অনুসারে ইংরাজী কহিতে পারে; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত বলা যায় না। সঙ্গীতেও সেই রূপ; রাগ-রাগিণী বিশুদ্ধ রূপে গাইতে পারিলেই যে সংগীত বিষয়ে পাণ্ডিত্য জন্মে তাহা নহে। আমাদের কালাবঁতী গায়কগণ তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থকর্ত্তাগণ রাগ অর্থে—"রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"—এইরূপ বলিয়াছেন *, অর্থাৎ যাহা শুনিলে মনোরঞ্জন হয়। এরূপ অর্থে স্বর-বিন্যাস মাত্রকেই রাগ বলিতে হয়, কিন্তু কেবল উহাই যে রাগের অর্থ নহে, রাগ অর্থে যে আরো বিশেষ তাৎপর্য্য আছে তাহা এ পর্য্যন্ত দেশী, বিদেশী, কোন লোকেই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিচারে রাগের সেই নিগূঢ় অর্থটী প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় ভাষায় রাগ অর্থে কোন শব্দ প্রচলিত নাই; তাহার কারণ এই যে, ইউরোপীয় সংগীতের প্রকৃতি এরূপ নয়, অর্থাৎ তথায় কেবল সংগৃহীত সুর লইয়া সংগীত চর্চ্চা হয় না।

আদি রাগ ছয়টীর অধিক কি নূ্যন না হওয়ার যুক্তি এই:—সে কালে সমাজের শৈশবাবস্থায় বৎসরের প্রত্যেক ঋতুর আদ্যোপান্ত কাল মধ্যে জনসমাজস্থ সকল লোকেই একই প্রকার স্বর-বিন্যাস অনুসারে যাহার যে গান ইচ্ছা গাইত; সুতরাং ছয় ঋতুর জন্য ছয় প্রকার স্বর-বিন্যাস ব্যবহৃত হইত। এই প্রথা এখনও অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। বার মাসের জন্য বার প্রকার স্বর-বিন্যাস ব্যবহার না হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত লোকের মনোবৃত্তি যেমন পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক, মাস পরিবর্ত্তনে সেরূপ হয় না। এক ঋতুতে যাহা সখ্ করিয়া ব্যবহার করা যায়, অন্য ঋতুতে তাহা পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা হয়,—বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন অবস্থা, এই জন্য ছয়টী রাগেরই প্রয়োজন; তাহার অল্প হইলে কোন একটী রাগ দুই ঋতুতে গাইতে হয়, তাহা অবস্থাসঙ্গত হয় না; আবার অধিক হইলে এক ঋতুতে দুইটী রাগ ব্যবহৃত হইতে থাকিলে কালক্রমে অল্প মিষ্ট রাগটী লোপ পাইয়া যায়। সংগীতের শৈশবাবস্থায় এই রূপই হইয়া থাকে। পরে ক্রমে যেমন উহার বয়োবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ লোকের সংগীত

* "যস্ত শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতিস্মৃতঃ॥" সোমেশ্বর।

চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে রাগেরও সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়; কেননা তখন নূতন নূতন স্বর-বিন্যাস ব্যবহারের স্পৃহা বশতঃ সংগীতপ্রিয় লোকে নূতন স্বর সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। এইরূপে ছয় রাগের পর পুরাকালের কিঞ্চিৎ উন্নত সমাজে আরও যে ছত্রিশ প্রকার নূতন স্বর-বিন্যাস সংগৃহীত হইয়াছিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাদের রাগিণী সংজ্ঞা দিয়াছেন।

অনেক সংগীতবিৎ লোকের এরূপ সংস্কার যে, রাগ হইতে রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে; ইহা নিতান্ত ভ্রম, এ কথার কোন অর্থ নাই। রাগিণীগুলি যদি রাগের রূপান্তর বা প্রকার-ভেদ (ভেরিএসন) হইত, তাহা হইলে ঐ কথা সঙ্গত হইত, কিন্তু রাগের সহিত রাগিণীদের সর্ব্বদা সেরূপ সম্বন্ধ নাই। এ বিষয়ে পর পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইতেছে। ক্রমে যখন আরো নূতন নূতন স্বর-বিন্যাস সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে উক্ত রাগের পুত্র ও পুত্রবধূ স্বরূপে উপরাগ ও উপরাগিণী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে যত রাগ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, সে সমস্তই ঐ আদি রাগের বংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৮ম পরিচ্ছেদঃ—রাগ-রাগিণীর বিবরণ।

সংস্কৃত শাস্ত্রে রাগাদির অনেক প্রকার মত দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ও পারস্যাদি ভাষা দক্ষ সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম জোন্স মহোদয় হিন্দু সংগীতের বিবিধ সংস্কৃত ও পারস্য গ্রন্থাদির যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন *। তিনি "তোফৎ-উল্‌ হিন্দ্‌" নামক প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থের প্রণেতা মির্জা খাঁর বর্ণনানুসারে বলিয়াছেন যে, হিন্দু সংগীতের চারিটী মত প্রধান :—ঈশ্বর বা ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হনুমন্ত মত, ও কল্লিনাথ মত। পরন্তু আধুনিক কিম্বা প্রাচীন হিন্দুস্থানে কখনও কোন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের মতানুসারে যে সংগীতালোচনা হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। কেননা ঐ সকল গ্রন্থের কার্য্যিক উপযোগিতা অতি অল্প। আরও, ভারতবর্ষে সংগীতের চর্চ্চা চিরকাল ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যেই অধিক। কিন্তু সংগীত ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা নাই, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে সংগীতের দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থাদির আলোচনা হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

ভারতবর্ষে সকল ব্যবসায়ই পৈতৃক, সংগীত ব্যবসায়ও সেইরূপ। অতএব এক এক বংশে পুরুষানুক্রমে সংগীতের যে প্রকার মত ও পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে, ওস্তাদ-দিগের মধ্যে তাহাই প্রবল। এই হেতু বিভিন্ন বংশীয় ওস্তাদদিগের সংগীত মত বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে সংগীতালোচনা বিভিন্ন প্রকার, ইহা এখনও যেমন, পুরাকালেও তদ্রূপ ছিল। এই কারণ বশতই শাস্ত্রপ্রণেতা সংগ্রহকারদিগের মতও পরস্পর ঐক্য নহে।

অধুনাতন প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা প্রাচীন সংগীত মত নিচয়ের সহিত তুলনা করিলে আশু ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অধুনা ঐ সংগীতে হনুমন্ত মতই প্রচলিত; কারণ হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ যাহাকে আদি ছয় রাগ

* এই মহাত্মা দেশ বিদেশ হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থের পুথী সংগ্রহ পূর্ব্বক, তাহা নকল করাইয়া কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহে রাখিয়াছেন। তিনি হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে এক চমৎকার সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন, তাহা "এসিয়াটিক রিসার্চেস" নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে নানাবিধ সংস্কৃত সঙ্গীত পুস্তকান্তর্গত বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ সার উইলিয়াম জোন্স এবং কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব আশ্চর্য্য অনুসন্ধান দ্বারা হিন্দু সঙ্গীতের নানা বিষয় সংগ্রহ পূর্ব্বক যদি গ্রন্থাদি না লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে অন্ধকারে থাকিতে হইত।

বলেন, তাহা হনুমন্ত মতানুযায়িক রাগ। ব্রহ্মার মতটী কৃত্রিম মত বলিয়া বোধ হয়। ১২শ পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের বিস্তারিত বিচার করা হইয়াছে।

"সংগীতসার" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় এবং তদীয় প্রধান শিষ্য রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় হনুমন্ত মতের কোন সংস্কৃত গ্রন্থ না পাওয়াতে, এতদ্দেশে হনুমন্ত মত প্রচলিত থাকা সম্বন্ধে তাঁহাদের কৃত সংগীত গ্রন্থে অস্বীকার করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মার মতানুযায়িক ছয় রাগকেই আদি রাগ বলিয়া গ্রহণ করিবার রীতি এতদ্দেশে প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পরন্তু যিনি যাহাকেই আদি রাগ ও আদি রাগিণী বলুন না কেন, তাহাতে প্রকৃত সংগীতালোচনার কোন বিভিন্নতা বা ব্যাঘাত হইবার কথা নহে। রাগ রাগিণী স্বর-বিন্যাস মাত্র, এবং তাহাদের জাতি ও নামাবলী কাল্পনিক। ভৈরব পরিবর্ত্তে বেহাগ, মালকৌশ পরিবর্ত্ত কল্যাণ, শ্রী পরিবর্ত্তে কানডা-কে আদি রাগ বলিলেই বা দোষ কি? উহা কেবল ঐতিহাসিক রহস্য মাত্র, অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্যগণ কাহাকেই বা আদি রাগ বলিতেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায় যে, আদি রাগের নিশ্চয়তা নাই। আর তাহা হইতেও পারে না, কারণ কোন্ স্বর-বিন্যাস যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও তাহার পূর্ব্বে আর কোন স্বর-বিন্যাস ছিল কি না, ইহা নিশ্চয় করে, কাহার সাধ্য? আর রাগের আদি অনাদিতে এমন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত নাই, যাহা সুস্থির না হইলে সংগীত চর্চ্চা অসম্ভব ও অশুদ্ধ হইবে।

লোকে বলে যে, আদি ছয় রাগ হইতেই ৩৬ রাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা যদি যথার্থ হইত, অর্থাৎ এক এক রাগের স্বর-বিন্যাসের অংশ ও ছায়া লইয়া যদি তত্তদ্ রাগিণী গুলি রচিত হইত, তাহা হইলে কোন্ কোন্‌টী যে আদি ছয় রাগ, তাহা মীমাংসা করার কতক প্রয়োজন হইত। কিন্তু ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী যে সেরূপ নহে, তাহা সংগীত নিপুণ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। অতএব আদি রাগ বিষয়ে বাদানুবাদ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মতের আদি রাগিণীর বর্ণনা হইতেছে :—

হনুমন্ত মতে আদি ছয় রাগ—১ ভৈরব, ২ শ্রী, ৩ মেঘ, ৪ হিণ্ডোল, ৫ মালকৌশ ও ৬ দীপক।

ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগ—১ ভৈরব, ২ শ্রী, ৩ মেঘ, ৪ বসন্ত, ৫ পঞ্চম ও ৬ নটনারায়ণ।

ভরত মতে আদি ছয় রাগ হনুমন্ত মতের ন্যায়, ও কল্লিনাথ মতের ছয় রাগ ব্রহ্মার মতের অনুযায়ী। নারদ সংহিতা মতে ছয় রাগ—মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্তক, হিন্দোল,

ও কর্ণাট। অন্য মতে অন্য প্রকার। আবার কোন মতে আদি রাগ বিংশতিটী—(১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

আদি রাগিণী সম্বন্ধেও ঐরূপ, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ; তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রাগোৎপত্তি সম্বন্ধে যে যুক্তি মীমাংসা স্থির করা হইয়াছে, উক্ত মত বিভিন্নতায় ঐ যুক্তির সম্পূর্ণ পোষকতা হইতেছে। ভরত ও হনুমন্ত মতে এক একটী রাগের পাঁচ পাঁচ রাগিণী ; ব্রহ্মা ও অন্যান্য মতে রাগের ছয় ছয় রাগিণী :—

হনুমন্ত মতানুযায়িক রাগিণী *।

ভৈরব-রাগের—ভৈরবী, সৈন্ধবী, বাঙ্গালী, বৈরাটী ও মধুমাধবী।
শ্রী-রাগের—মালশ্রী, মালবী, ধনশ্রী, বাসন্তী ও আসাবরী।
মেঘ-রাগের—সৌরটী, টঙ্কা, ভূপালী, গুর্জ্জরী ও দেশকারী।
হিন্দোল-রাগের—রামকলী, বেলাবেলী, ললিতা, পটমঞ্জরী ও দেশাখ্যা
মালকৌশ-রাগের—কুকুভা, খাম্বাবতী, গুণকলী, গৌরী ও তোড়ি।
দীপক-রাগের—দেশী, কামোদী, কেদারী, কর্ণাটী ও নাটিকা।

ব্রহ্মার মতানুযায়িক রাগিণী।

ভৈরব-রাগের—ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকেলী, গুণকেলী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী।
শ্রী-রাগের—মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়ী।
মেঘ-রাগের—মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারী।
বসন্ত-রাগের—দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, তোড়ি, ললিতা ও হিন্দোলী।
পঞ্চম-রাগের—বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী।
নট-রাগের—কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও হম্বীরা॥

---

* রাগিণীগণের নামের বানান সম্বন্ধে কিছুই স্থির নাই। বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন রূপে বানান করিয়াছেন ; যেমন কোন গ্রন্থে রামকেলী, কোন গ্রন্থে রামকলী, কোন গ্রন্থে রামকিরি, এ প্রকার দৃষ্ট হয়। ইহারা একই কিম্বা বিভিন্ন রাগিণী, তাহাও জানা যায় না।

অন্যান্য মতে রাগিণী অন্য প্রকার, তাহা ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। ঐ সকল রাগ-রাগিণীর অনেক অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। দীপক রাগের স্বর-বিন্যাস অবগত আছে, এমন গায়ক কি বাদক বহু কাল হইতে দেখা যায় না। আরও যদি পনর বিশ বৎসর ভারতবর্ষে স্বরলিপির ব্যবহার হইতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে রাগের মধ্যে ভৈরব ও মালকৌশ, এবং রাগিণীর মধ্যে ভৈরবী, রামকেলী, সৈন্ধবী, কেদারী, সৌরটী, দেশী, তোড়ি, ললিতা, হম্বীরা ও খাম্বাবতী ভিন্ন আর সকলে লোপ পাইত। এখনও যাহারা চলিত আছে, তাহাদের মূর্ত্তি প্রাচীন কাল হইতে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন রাগের ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহার রাগিণীনিচয় স্থিরীকৃত হয় নাই; কারণ রাগের সহিত রাগিণীগণের প্রাচীন কিম্বা আধুনিক স্বর-বিন্যাস তুলনা করিলে, ক্বচিৎ কোন রাগিণী তদীয় রাগের ছায়ার অনুরূপ দৃষ্ট হয়, যথা,—ব্রহ্মার মতানুযায়িক রাগিণীর মধ্যে রামকেলী ও বাঙ্গালী, এই দুইটী কেবল ভৈরবের সদৃশ, অবশিষ্টগুলি অনেক ভিন্ন; ত্রিবণী ও গৌরী, এই দুইটী মাত্র শ্রীর সদৃশ, মল্লারী ও সৌরটী, এই দুইটী কেবল মেঘের সদৃশ, বসন্তের কেবল ললিতা ভিন্ন আর সকল রাগিণী উহা হইতে অনেক পৃথক, পঞ্চমের কোন রাগিণী পঞ্চমের অনুরূপ নহে; নটের কামোদী ভিন্ন আর সকল রাগিণী নট হইতে পৃথক। হনুমন্ত মতেও ঐ রূপ; মালকৌশের ও হিন্দোলের কোন রাগিণী উহাদের অনুরূপ নয়।*

উল্লিখিত ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী ব্যতীত আরও যে সকল রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়' তাহাদিগকে উহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ অথবা উপরাগ ও উপরাগিণী বলে। রাগাদির পুত্র ও পুত্রবধূ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ। কোন মতে এক এক রাগের আট আট পুত্র, কোন মতে ছয়, কোন মতে সাত। সেই সকল পুত্র ও পুত্রবধূ, অর্থাৎ উপরাগ ও উপরাগিণীদিগের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন; কারণ তাহারাও রাগ-রাগিণীদের

* বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্নাকরে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—"যে যে রাগিণী যে রাগের ভার্য্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, সেই সেই রাগিণী সেই সেই রাগ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে।" ইহা নিতান্ত ভ্রম। গ্রন্থকার 'রাগ-রাগিণীর স্বর-বিন্যাসের' বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া, সাধারণ (পপুলার) ভ্রান্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ঐ রূপ লিখিয়াছেন।

স্বর-বিন্যাসের সাদৃশ্যানুসারে নিরূপিত হয় নাই, এবং সেই হেতু ঐ বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মতেরও পরস্পর ঐক্য নাই*। কালে কালে ক্রমে অসংখ্য রাগ-রাগিণীর ব্যবহার হইয়াছিল; স্বরলিপির প্রথা না থাকাতে তাহাদের তিন-চতুর্থেরও অধিক লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে অতি বড় ওস্তাদে দুই শত রাগের অধিক জানেন কি না সন্দেহ। বহুবিধ রাগ-রাগিণীর স্বর-বিন্যাস জানা থাকিলে স্বর-বিন্যাসের প্রকৃতির সাদৃশ্যানুসারে রাগ-রাগিণীদিগকে বিভিন্ন জাতিতে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার নহে। মুসলমান পাদসাদিগের দরবারে হিন্দু সঙ্গীতের সমূহ অনুশীলন হওয়া কালীন কতকগুলি রাগ-রাগিণী কতিপয় বিভিন্ন শ্রেণী বা জাতিতে বিভক্ত হয়; সেই শ্রেণী বিভাগ অতি উৎকৃষ্ট ও কার্য্যোপযোগী, ও তদ্দারা রাগ শিক্ষারও সুন্দর সুবিধা হয়; যেমন অষ্টাদশ কানড়া, ত্রয়োদশ তোড়ি, দ্বাদশ মল্লার, নব নট, সপ্ত সারঙ্গ। কিন্তু স্বরলিপি অভাবে ইহারাও স্থায়ী হইতে পারে নাই; অনেকের কেবল নামমাত্র রহিয়াছে।

১৮ কানড়া:—দরবারী, মুদ্রাকী, কৌশিকী, হোসেনী, সুহা, সুঘরাই, আড়ানা, সাহানা, বাগশ্রী, গারা,—ইহারা শুদ্ধ কানড়া; নাগধ্বনি কানড়া, টঙ্ক কানড়া, কাফী কানড়া, ও মিয়াকি জয়জয়ন্তী,—এই কয়টী মিশ্র কানড়া।

১৩ তোড়ি—দরবারী-তোড়ি, আশাবরী, গুর্জ্জরী, গান্ধারী, বাহাদুরী তোড়ি, নাচারী তোড়ি, লক্ষ্মী তোড়ি, দেশী তোড়ি,—ইহারা শুদ্ধ তোড়ি; খট তোড়ি, মুদ্রা তোড়ি, সুহা তোড়ি, সুঘরাই তোড়ি, ও জোয়ানপুরী তোড়ি,—ইহারা মিশ্র তোড়ি।

* সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ও সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তিজাল হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি তাঁহারকৃত সঙ্গীতসারে এরূপ লিখিয়াছেন—"এই ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণীর সহযোগে ষোড়শ সহস্র উপরাগ এবং উপরাগিণীর জন্ম হইয়াছিল।" যাহারা রাগাদির স্বর-বিন্যাসের প্রকৃতি সম্যগবগত নহে, তাহাদের ঐ রূপ ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নহে। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সঙ্গীতদক্ষ লোকের ঐ প্রকার সংস্কার থাকা আশ্চর্য্যের বিষয়। আদি রাগ-রাগিণীর সংযোগ ব্যতীতও অসংখ্য প্রকার নূতন রাগ রচিত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সঙ্গীত-জ্ঞান-জনিত বহু দর্শনাভাবেই ঐ প্রকার কুসংস্কার সমূহের জন্ম হয়, এবং প্রাচীন গ্রন্থকারগণের কাব্যিক ও রূপক বর্ণনাই ঐ সকল অনর্থের মূল। চিরকাল পৌরাণিক মত ধরিয়া থাকিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উন্নতি কখনই হইবে না। পরে এ বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা হইতেছে।

১২ মল্লার ঃ—মেঘ, সুরট, দেশ, গৌড়, জয়জয়ন্তী, ধুরিয়া মল্লার, সুরদাসী মল্লার, ইহারা শুদ্ধ মল্লার , নট মল্লার, নায়কী মল্লার, অরুণ মল্লার, মিয়া মল্লার ও জাজ মল্লার,—ইহারা মিশ্র মল্লার।

৯ নট ঃ—নটনারায়ণ অথবা বৃহন্নট, ছায়ানট, কেদার-নট, হাম্বীর-নট, কল্যাণ-নট, মল্লার নট, কামোদ-নট, আহীর-নট ও কদম্ব-নট।

৭ সারঙ্গ ঃ—বৃন্দাবনী সারঙ্গ, মধুমাধ সারঙ্গ, গৌর সারঙ্গ, সামন্ত সারঙ্গ, বড়হংস সারঙ্গ, শুদ্ধ সাবঙ্গ ও মিয়াকী সারঙ্গ।

অনেক ওস্তাদে বলেন, এবং তাহা যুক্তিসঙ্গতও বোধ হয় যে, ইমন, ভূপালী, শ্যাম, হেম-ক্ষেম ইহারা কল্যাণ জাতি , দেওগিরি, কোকভ, আলাহিয়া, সর্ফর্দা ইহারা বেলাবলি জাতি। ভৈরব তিন প্রকার,—আনন্দ ভৈরব, মঙ্গল-ভৈরব, ও শুদ্ধ ভৈরব ; শ্রী পাঁচ প্রকার,—শুদ্ধশ্রী, মালশ্রী, ধনশ্রী, জয়তশ্রী, শ্রীটঙ্ক, কেদারা তিন প্রকার,—শুদ্ধ কেদারা, জলধর কেদারা ও মারু কেদারা , বেহাগ তিন প্রকার,—শুদ্ধ বেহাগ, অরুণ বেহাগ ও বেহাগড়া , শঙ্করা তিন প্রকার,—শঙ্করা-অরুণ, শঙ্করা-ভরণ ও শঙ্করা করণ।

মারোয়া, পুরিয় , ত্রিবণ, জয়ন্ত,—ইহারা সম-প্রকৃতিক, মূলতানী, ভীম-পলাশী, ধানী, বাজবিজয়,—ইহারা সম-প্রকৃতিক, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, লুম,—ইহারা সম-প্রকৃতিক, সিন্দুরিয়া (সিন্দূড়া), সিন্ধু, কাফী, সম-প্রকৃতিক , ভৈরব, রামকেলী, বাঙ্গালী, কালাংড়া, যোগিয়া,—ইহারা সম-প্রকৃতিক, বিভাষ ও দেশকার সম-প্রকৃতিক , শঙ্করা ও বেহাগ—সম-প্রকৃতিক ; সোহিনী, বসন্ত ও হিণ্ডোল সম-প্রকৃতিক ; শ্রী, গৌরী, পুরবী, ববাটী, মালিগৌরা, সাজাগিরি,—ইহারা সম-প্রকৃতিক , বাগশ্রী, পটমঞ্জরী, আভীরী,—ইহারা সম-প্রকৃতিক ; পঞ্চম ও ললিত—সম-প্রকৃতিক, ইত্যাদি। সম-প্রকৃতিক রাগ-রাগিণীগুলি একই ঠাটে গীত হয় , তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

রাগ রাগিণী গুলি যে প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহ, উহাদের উক্ত সম-প্রকৃতিত্বই তাহার এক প্রমাণ। এমন রাগ প্রায় নাই, যাহার সদৃশ আর একটী রাগ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উক্ত সম-প্রকৃতি হওয়ার কারণ এই ঃ—মনে কর, রঙ্গপুর জেলায়, ইতর সাধারণের মধ্যে এক প্রকার স্বর-বিন্যাস (রাগ) প্রচলিত ; তাহার আশ-পাশ জেলায়,—যেমন বগুড়া, দিনাজপুর, কোচবিহার প্রভৃতি, যে সকল স্বর-বিন্যাস প্রচলিত, তাহারা ঐ রঙ্গপুরস্থ রাগ হইতে অতি অল্প স্বল্প ভিন্ন; অতএব ঐ সমস্ত জেলার বিভিন্ন স্বর-বিন্যাসের পরস্পর সাদৃশ্যানুসারে তাহাদিগকে এক জাতীয়, অর্থাৎ

সম-প্রকৃতিক বলা যাইতে পারে। ঐ সকল বিভিন্ন রাগের পার্থক্য এক জন বিদেশী লোকের সহসা উপলব্ধি হইবে না; একই রূপ বোধ হইবে। সেই প্রকার অতি প্রাচীন কালে উত্তর-পশ্চিম দেশস্থ যে জেলায় ভৈরব-রাগ প্রচলিত ছিল, মনে কর তাহার এক পার্শ্বস্থ জেলায় রামকেলী, অপর পার্শ্বে বাঙ্গালী, আর এক পার্শ্বে কালাংড়া, এইরূপ ভৈরবের সম-প্রকৃতিক রাগিণীসকল প্রচলিত ছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয়।

ফলতঃ রাগাদির সম-প্রকৃতিত্বের কারণ যাহাই হউক না কেন, উহাদের লোপ পাইবার মধ্যে একটী নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। পুরাকাল হইতে যত প্রকার রাগ-রাগিণী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সম প্রকৃতিক রাগের সংখ্যাই ক্রমে কমিয়া গিয়াছে, কেননা উহাদের পার্থক্য সহসা লোকের অনুধাবন না হওয়াতে, উহারা অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। যাহারা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার উপায় নাই। এক্ষণকার লুপ্তপ্রায় মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

ভৈরব, বাঙ্গালী রামকেলী ও ভটিয়ারী সম-প্রকৃতিক জন্য, বাঙ্গালী ও ভটিয়ারী ইদানীং লোপ পাইবার পথে দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ অতি অল্প গায়কেই উহাদিগকে জানেন। গুণকেলী কতক গৌরী কতক শ্রীর ন্যায়, ধন-শ্রী ও রাজবিজয় মুলতানীর ন্যায়, শ্যাম হাম্বীরের ন্যায়, দেশকার বিভাষের ন্যায়,—এই জন্য গুণকেলী, ধনশ্রী, রাজবিজয়, দেশকার লোপ পাইতেছে, ১৮ কানড়া, ১৩ তোড়ি, ১২ মল্লার, ৯ নট, ৭ সারঙ্গ, ইহাদের দুই তিন রকম ব্যতীত বাকী অতি অল্প গায়কেই জানেন। যে দুই এক জন অতি প্রাচীন গায়ক এখনও উহাদিগের স্বর-বিন্যাস অবগত আছেন, তাঁহারা দেহত্যাগ করিলে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও মার্গ সঙ্গীতের* ন্যায় দেব-লোকে গমন করিবে। অতএব এখনও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রথিতযশ প্রাচীন গায়ক-দিগের নিকট হইতে ঐ সকল রাগের যথার্থ বিশুদ্ধ স্বর বিন্যাস সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরলিপি-কৃত করিলে, উহারা স্থায়ী হইতে পারে। যিনি ইহা করিবেন, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ হিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা করিতে পারিল না। 'সঙ্গীতসার' ও 'কণ্ঠকৌমুদী' নামক গ্রন্থদ্বয়ে ঐ প্রকার কতকগুলি রাগের যে স্বর-বিন্যাস দৃষ্ট হয়, তাহা বিশুদ্ধ হয় নাই; কেননা উহা বিখ্যাত প্রাচীন কালাবঁৎদিগের মুখে ভিন্ন রূপ শুনা যায়।

* মার্গ সঙ্গীতের বিষয় ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সংকীর্ণ

প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থকারগণ রাগ-রাগিণীকে এক প্রকার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সংকীর্ণ। যে সকল রাগে অন্য কোন রাগ মিশ্রিত নাই, তাহাদিগকে শুদ্ধ ; যে সকল রাগ দুই রাগ মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাদিগকে সালঙ্ক ; এবং যে সকল রাগ তিন কি ততোধিক রাগ মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে সংকীর্ণ বলা হইয়াছে। কোন্ কোন্ রাগ এই তিনের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেক প্রকার মতভেদ।

এ বিষয়ে হিন্দুস্থানী ওস্তাদদিগের মধ্যে কি প্রকার মত প্রচলিত তৎসম্বন্ধে কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সাধারণতঃ লোকে রাগগুলিকে শুদ্ধ জাতীয়, রাগিণীগুলিকে সংকীণ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করে ; আবার অনেকে রাগগুলিকেও সংকীর্ণ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করে ; কেহ কেহ কানড়া, তোড়ি, মল্লার, নট, সারঙ্গ, গুর্জ্জরী, এই কয়টীকে শুদ্ধ রাগ বলে। এইরূপ এত প্রকার মতভেদ যে, সকলই যেন ছেলে-খেলার ন্যায় বোধ হয়। বস্তুতঃ অধুনা রাগ-রাগিণীগণকে ঐ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা বৃথা শ্রম, উহার কোনই ফল নাই।*

কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব তাঁহার কৃত হিন্দু সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থে সংকীর্ণ জাতীয় রাগের এক সুবৃহৎ তালিকা দিয়া, এক এক রাগ কি কি মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা

* প্রাচীন রাগ-রাগিণী যে কাহারও রচিত নহে, সকলই সংগ্রহ, প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ কর্তৃক রাগের উক্ত শ্রেণী-ভেদ ব্যাপারটী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আধুনিক কালে ঐ শ্রেণী-ভেদ দ্বারা সঙ্গীত চর্চ্চার কোন উপকার দর্শে না ; কেননা অধুনা ঐ শ্রেণী অনুসারে রাগাদি চেনা দুষ্কর ; এজন্য বহুকাল হইতে উহার ব্যবহার নাই। কিন্তু যে পুরাকালে রাগ-রাগিণীগণের প্রথম সংগ্রহ হয়, তখন ঐ শ্রেণী-ভেদের প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ হয় ; কারণ তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দুই তিন রাগ মিশ্রিত করিয়া গাইলে, সঙ্গীতবিদ্‌গণ তাহা সহজেই চিনিতে পারিত। মনে কর, ভৈরবের সহিত মেঘ মিশ্রিত করিয়া গীত হইলে, তাহা তখনকার শ্রোতা অনায়াসেই ধরিয়া দিতে পারিত, কেননা তখন রাগ সংখ্যা অল্প ছিল এবং যে কএকটি ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহারা তৎকালে জীবিত থাকাতে, অর্থাৎ তত্তদ্দেশীয় লোকের জাতীয় স্বররূপে বর্ত্তমান থাকাতে, তাহাদের মূর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান ছিল ; সুতরাং মিশ্রামিশ্র রাগ লোকে অনায়াসেই চিনিতে পারিত। কিন্তু আধুনিক কালে ঐ ভৈরব ও মেঘ মিশ্রণে উৎপন্ন তৃতীয় রাগটী এক মৌলিক রাগ বলিয়া বিবেচিত হইবে ; কেননা এক্ষণে ভৈরবের ও মেঘের সেই প্রাচীন মূর্ত্তি আর নাই, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এক্ষণে মিশ্র রাগাদির উৎপত্তি নিরাকরণ হওয়া অসম্ভব ; সুতরাং তদ্বিষয়ে নানা লোকে নানা প্রকার বলে। বস্তুতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থের নিয়ম সকল আধুনিক সঙ্গীতের উপযোগী নহে। সে কালে কোন নূতন রাগ দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনাকর্ষণ করিতে হইলে, গায়কগণ দুই তিন পুরানো প্রচলিত রাগের অংশ গ্রহণ একটা নূতন মূর্ত্তি উদ্ভাবন করিয়া গাইত ; কোন নূতন মৌলিক স্বর-বিন্যাস তখনকার সমাজে সমাদৃত হইত না।

লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা সংগীতসারে ও বাঙ্গালা সংগীতরত্নাকরেও উহার অনুকরণে এক এক তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সাহেব তদীয় তালিকায় আদি ছয় রাগকেও সংকীর্ণ জাতি মধ্যে ধরিয়াছেন, যথা :—হিন্দোল, তোড়ি, কানড়া ও পুরিয়ার সংযোগে ভৈরব-রাগ উৎপন্ন ; কল্যাণ, কামোদ, সামন্ত, ও বসন্ত সংযোগে মেঘ-রাগ উৎপন্ন। রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ কি রাসায়নিক যোগের ন্যায় যে, সংযুক্ত দ্রব্যের বর্ণ সংযুজ্যমান আদি দ্রব্য নিচয়ের বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে? ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও হাস্যকর কথা। বিশেষ আদি রাগোৎপত্তির যুগ যুগান্তর পরে অন্যান্য রাগ রাগিণীর জন্ম হইয়াছে। যাহা হউক, উইলার্ড সাহেব বিদেশীয় লোক, তাঁহার ভ্রান্তি মার্জ্জনীয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংগীতসারকর্ত্তা সংগীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ও বাচ বিচার না করিয়া অন্ধের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী সংগীত গ্রন্থকারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। সংগীতসারের শেষভাগে দৃষ্ট হইবে যে, আসাবরী, ভৈরবী ও গুর্জ্জরী সংযোগে কাফী উৎপন্ন, এই রূপ লিখিত হইয়াছে। ঐ তিনটী রাগিণীতেই রি ও ধ কোমল, কাফীর রি ও ধ তবে কোমল হইল না কেন? এই প্রকার অনেক অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি ঐ গ্রন্থে প্রবেশ করিয়াছে।

ঔড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কালের গ্রন্থকর্ত্তাগণ রাগ-রাগিণীর ব্যবহার্য্য স্বরের সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে আর এক প্রকার তিন জাতিতে বিভক্ত করিযাছেন, যথা,—ঔড়ব, খাড়ব (ষাড়ব), ও সম্পূর্ণ। এই বিভাগ কতক আবশ্যকীয় বটে। যে সকল রাগে স্বর-গ্রামের পাঁচটী মাত্র স্বর ব্যবহার হয়, দুইটী বর্জ্জিত থাকে, তাহাদিগকে ঔড়ব জাতীয় কহে ; যে রাগে গ্রামের ছয়টী স্বর ব্যবহার হয়, একটী বর্জ্জিত থাকে, তাহাকে খাড়ব কহে ; এবং যাহাতে সাত স্বরই ব্যবহার হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় কহে। আধুনিক সঙ্গীতে ঐ তিন জাতীয় রাগ কি কি প্রকার, তাহা পর পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

ঐ তিন জাতি সম্বন্ধেও প্রাচীন গ্রন্থকারগণের এবং আধুনিক ওস্তাদদিগের মধ্যে পরস্পর অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাগাদির উক্ত জাতিত্বের মূলে দোষ আছে, অর্থাৎ ঐ জাতি বিভাগ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে ; তাহা হইলে উহাতে লোকের মতভেদ কখনই হইতে পারিত না। প্রাচীন রাগ-রাগিণীগুলি যে এক এক দেশের জাতীয় গান, উক্ত ঔড়ব খাড়ব জাতিত্ব তাহার অন্যতর প্রমাণ। এক এক দেশীয় জন সাধারণের এ রূপ অভ্যাস যে, তাহারা

গ্রামের দুই একটী সুর উচ্চারণ করিতে পারে না। নেপাল ও ভুটান তরাইস্থ অরণ্য-বাসী মেচজাতির গানে কেবল সা-গ প-সা; এই কয়টী সুর মাত্র ব্যবহার হয়। ভাগলপুর বিভাগস্থ প্রদেশবাসী ইতর সাধারণ প-এর উপরে চড়িতে পারে না। নাগপুরিয়া ধাঙ্গড় কুলিরা গ-সুর উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহাদের জাতীয় সুর বৃন্দাবনিসারঙ্গ; তাহারা এই রাগের এমন সুন্দর ভাঁজে গান গায় যে, অপর দেশীয় শিক্ষিত গায়ক ভিন্ন তাহা আদায় করিতে পারে না। চীন দেশীয় গানে সাধারণতঃ ম ও নি ব্যবহার হয় না; পরিব্রাজকেরা বলেন, তথাকার প্রায় সকল গানই ঔড়ব জাতীয়। ইহার অর্থ এই যে, ম ও নি বর্জ্জন করিয়া গান করা চৈনদের জাতীয় অভ্যাস। সংগীতের অনুন্নত বাল্যাবস্থায় স্বরগ্রামের সমস্ত সাত সুর প্রকাশ পায় না; ইহা পৃথিবীস্থ বহু প্রাচীন ও আধুনিক অনুন্নত জাতির বিবরণে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। হিন্দু সংগীত অতীব প্রাচীন; অতএব পুরাকালের যে সকল জনসমাজ হইতে প্রাচীন রাগ-রাগিণীগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তত্রত্য লোকদিগের স্বরগ্রামের দুই এক সুর বাদ দিয়া গান গাওয়ার অভ্যাস ছিল; ইহাতেই ঔড়ব খাড়বের জন্ম।

ব্রহ্মা ও হনুমন্ত, উভয় মতের একত্রিত আটটী প্রচলিত রাগের মধ্যে শ্রী ও বৃহন্নট, এই দুইটী ব্যতীত আর সকলেই, কেহ ঔড়ব, কেহ খাড়ব। কোন গ্রন্থের মতে ভৈরব খাড়ব—রি বর্জ্জিত, কোন মতে ঔড়ব—রি ও প বর্জ্জিত; অর্থাৎ ভৈরব যে প্রাচীন জনসমাজের জাতীয় সুর ছিল, তত্রত্য লোকেরা রি ও প উচ্চারণ করিতে পারিত না, এই জন্যই ভৈরব ঔড়ব অথবা খাড়ব ছিল। কিন্তু পরে ক্রমে লোকের স্বরাভ্যাসের উন্নতির সহিত ভৈরবও সম্পূর্ণ জাতীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ যাহাদের রি ও প উচ্চারণ করা সহজ, তাহারা ভৈরবে রি ও প কেননা উচ্চারণ করিবে? উহাতে রি ও প ব্যবহার করা সম্বন্ধে ভৌতিক প্রতিবন্ধকতা কিছুই ছিল না, অর্থাৎ রি ও প উচ্চারণ করা অসম্ভব কি শ্রুতিকটু কার্য্য নহে; এই জন্যই আধুনিক কালে উহাতে রি, প ব্যবহার হইতেছে; তাহাতে ভৈরবের কিছুই অনিষ্ট হয় নাই। ইহাতে কেহ এরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, রি ও প বর্জ্জনে প্রাচীন কালে ভৈরবের যে অতি মনোহর রূপ ছিল, এক্ষণে তাহা নাই। ইহা কেবল তর্ক মাত্র; কেননা ইহার উত্তরে আর এক জনে এ রূপ বলিতে পারেন যে পুরাকালে ভৈরব বরং অঙ্গহীন ছিল, আধুনিক কালে উহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া অধিক মিষ্ট হইয়াছে। ভাল মন্দ দশের মুখে; সুন্দরকে যদি বিকৃত করিয়া কুৎসিত করা যায়, সর্ব্ব সাধারণে তাহা কখনই অনুমোদন করিবে না। ভৈরবে রি ও প ব্যবহার করিলে যদি তাহা কুৎসিত হইত, তাহা হইলে সাধারণে কখনই তাহা অনুমোদন করিত না। রাগের মনোহারিতা গায়কের মুখে; লোকের

যাহাতে মনোরঞ্জন হয়, রাগের পক্ষে সেই নিয়মই হক্, ও অপরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুস্থানী ললিতে প নাই, ও ধ স্বাভাবিক, কিন্তু বঙ্গদেশে সেই ললিত প ও কোমল-ধ বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ললিত মনোরঞ্জন বিষয়ে হিন্দী ললিতাপেক্ষা অল্প ক্ষমবান নহে, বরং অধিক, কারণ হিন্দুস্থানী তোড়ি ও ভৈরবী ব্যতীত, বাঙ্গালা ললিতের ন্যায় করুণ রসোদ্দীপক রাগিণী প্রায় দৃষ্ট হয় না।

পরন্তু ইতিহাসের জন্য প্রাচীন সামগ্রী অবিকৃত রাখাই উচিত, উহার বিকৃত হওয়া, ও ধ্বংস হওয়া, সমান কথা। ফলতঃ দুঃখের বিষয় এই যে, কালে রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত সংগীতের যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যগণ যে স্বর-বিন্যাস যোগে গান করিতেন, তাহাদের প্রাচীন মূর্ত্তিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রত্ন-তত্ত্বের (আর্কিয়লজি-র) মর্ম্ম ভারতীয় সংগীত ব্যবসায়ী লোকদিগের, ও তাহাদের শ্রোতৃবর্গের অবগত থাকা আশা করা যায় না, সুতরাং তাহারা প্রাচীন স্বর-বিন্যাস সকল এত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে যে, উহারা এক্ষণে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং স্বরলিপি অভাবে উহাদের প্রাচীন মূর্ত্তি রক্ষা পায় নাই।

ভারতীয় লোকের প্রাচীন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর আছে বটে, কিন্তু তাহা ইতিহাসপ্রিয়তা জনিত নহে, তাহা আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার ফল, অর্থাৎ "কে আবার বদ্‌লায়, যাহা আছে সেই ভাল"। এই জন্য ভারতীয় লোকদিগের নূতন সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রস্ফুটিত হয় নাই, এবং নূতনের প্রতি আস্থাও নাই। কিন্তু জনসমাজের রুচি ও অভ্যাসের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক, তাহা কেহই রোধ করিতে পারে না, তজ্জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন অভাবের উদ্ভব হয়। যে জাতি অলস, তাহারা সেই অভাব সকল সহ্য করিয়া থাকে, আর যাহারা শ্রমী ও যত্নশীল, তাহারা ত্বরায় অভাব মোচন পূর্ব্বক রুচি চরিতার্থ করে। ইদানীং নিরলস ইউরোপীয় লোকদিগের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়াতে, আমাদের আলস্য ত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং তৎসহিত নূতনত্বের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধাও কমাইতে হইতেছে। এই সুযোগে যাহাতে আমাদের জাতীয় উন্নতির সোপানও নির্ম্মিত হয়, তাহার চেষ্টা করা সকলেরই উচিত।

৯ম পরিচ্ছেদঃ—রাগ-রাগিণী গাওয়ার সময় ও ঠাট প্রভৃতি নিরূপণ।

রাগ-রাগিণী সকল দিন রাত্রের এক এক নির্দিষ্ট সময়ে গান করার বিধি যে নিতান্ত কাল্পনিক, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। স্বরের বিভিন্ন বিন্যাসের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্বর দিবারাত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে না গাইলে আশানুরূপ ফলোৎপাদন হয় না। স্বরের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করা, এবং শ্রোতার মনে সেই ভাবের উদ্রেক করাই সংগীতের মূল উদ্দেশ্য, সেই সকল ভাব বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্ত করার সহিত সময়ের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রাতঃকালে গাইয়া যে ভাব ব্যক্ত করা হইল, রাত্রে গাইলে কি সেই ভাব ব্যক্ত হইবে না? অবশ্যই হইবে। তবে গায়ক ও শ্রোতার মনের অবস্থার উপর সংগীতের ফল নির্ভর করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল লোকেরই মানসিক অবস্থা সমান নহে। একই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মনের অবস্থা যদি এক রূপ হইত, তাহা হইলে মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করণার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইত। তবে সমাজস্থ হইয়া থাকিতে হইলে, সকল কার্য্যেরই এক একটী সময় স্থির করিয়া লইতে হয়। যেমন শাদা কথায়, স্নানাহারের সময় সংগীত ভাল লাগে না, এই প্রকার যাহা কিছু প্রভেদ। কিন্তু আবার অভ্যাসে আর এক স্বভাব হইয়া উঠে, যেমন ইংরাজেরা রাত্রে ব্যাণ্ড্ বাদ্য শুনিতে শুনিতে খানা খায়। স্নানের সময় তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে অনেক স্বাধীন অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তির গান শোনা অভ্যাস থাকে। কিন্তু সকল লোকেরই ঐ প্রকার অভ্যাস থাকা সম্ভব হয় না। দিন রাত্রের মধ্যে দুইটী বস্তুর প্রভেদ অধিক কার্য্যকর,—আলোক ও উত্তাপ। পরন্তু উন্নত সমাজস্থ সুশিক্ষিত সভ্য লোকে আলোক ও উত্তাপের ব্যতিক্রমের সহিত মনের অবস্থার ব্যতিক্রম হইতে দেন না; সুতরাং নির্দ্দিষ্ট স্বর-বিন্যাসের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখারও তাঁহার প্রয়োজন হয় না।

খ্যাতনামা সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সন্দেহ করিয়াও স্থির করিতে পারেন নাই যে, প্রাচীন হিন্দু সংগীতঃবক্তারা ইহা জানিতেন কি না যে, ধ্বনি পরিচালক বায়ু উষ্ণ হইয়া তরল হইলে, ধ্বনির গতি দ্রুত হয়; এবং শীতল হইয়া গাঢ় হইলে, ধ্বনির গতি মন্দ

অর্থাৎ শ্লথ হয়। প্রাচীন আর্য্য গায়কগণ ইহা জানিলেই বা কি হইত? উহাতে সুরের তৃপ্তি প্রদায়িনী শক্তির যে কোন ব্যতিক্রম হয় না, তাহা ধ্বনি বিজ্ঞানে স্পষ্ট প্রকাশ আছে। কথায় বলি, শীতের সময় রি-এর পর ম অপেক্ষা কি রি-এর পর গ অধিক মিষ্ট, এবং গ্রীষ্মের সময় গ-এর পর ম অপেক্ষা কি গ-এর পর রি অধিক মিষ্ট শুনায়? কিম্বা আলোকের সময় ম-এর পর প অপেক্ষা কি ম-এর পর ধ অধিক মিষ্ট, এবং অন্ধকারের সময় প-এর পর ধ অপেক্ষা কি প-এর পর ম অধিক মিষ্ট শুনায়? এরূপ বিশ্বাস যে হাস্যকর, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

পৌত্তলিক সংস্কারাবিষ্ট গায়কগণ রাগের সময় নির্দ্দেশের এক চমৎকার পৌরাণিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, রাগ-রাগিণীগণ এক এক দেবতা, তাঁহাদিগকে যখন তখন আহ্বান করিলে, তাঁহারা শুনিতে পারেন না, তাঁহাদের সাবকাশানুসারে আহ্বান করিলে, তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া গায়ক ও বাদককে প্রভূত রঞ্জন-শক্তি প্রদান করেন; এই জন্যই অসময়ে কোন রাগ গাইলে তাহা সুরস হয় না। বিশ্বাস করিতে পারিলে রাগাদির সময় নিরূপণের উল্লিখিত ব্যাখ্যা ভিন্ন উপযুক্ততর ব্যাখ্যা নাই।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় আধুনিক সভ্য সমাজে, কি স্বাধীন, কি পরাধীন, উভয় অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে সন্ধ্যার পর সংগীতালোচনার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। অধুনা যে সকল চাকুরে লোক হিন্দু সংগীতালোচনা করেন, কুসংস্কার দোষে কিম্বা প্রাচীন প্রথার অনুরোধে তাঁহাদের প্রাতঃকালীয় রাগাদির চর্চ্চা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না, ইহা নিতান্ত অন্যায়, ও দুঃখের বিষয়। রাগের সহিত সময়ের যে কোন সম্বন্ধ নাই, যে সকল প্রাচীন সংগীত-গ্রন্থকার রাগাদির সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মতের ঘোরতর অনৈক্যই উহার প্রমাণ। 'সংগীত পারিজাতে' ভূপালী প্রাতে, ও ভৈরবী সর্ব্বদা গাইতে বিধি আছে, ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে ইমন প্রাতে এবং ভৈরবী রাত্রে গাওয়ার প্রথা শুনা যায়, কোন মতে ললিত, রামকেলী, তোড়ি সায়ংকালে গাওয়ার বিধি আছে*। ইহা আমাদের ও হিন্দুস্থান

* "ছায়া গৌড়ী তথা চান্যা ললিতা চ তথা মতা।
মল্লারিকা তথা ছায়া গৌরী তু তোড়িকাহ্বয়া।
গৌড়ী মালব-গৌড়শ্চ রামকিরী তথৈব চ।
এতে রাগা বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ।
সায়মেষান্তু গানেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।" সংগীতসারসংগ্রহ।

প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।' ফলতঃ প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাগ ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গান করার বিধি থাকিলেও, যে দেশে যে ব্যবহার, তাহাই প্রসিদ্ধ* ; এবং রাজাজ্ঞায় ও যাত্রা নাট্যাভিনয় প্রভৃতিতে রাগাদি অসময়ে গীত হইলেও দোষ হয় না †। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন গ্রন্থকারগণও রাগাদির সময় নিরূপণ তত বিশ্বাস করিতেন না ; তবে কি না প্রাচীন প্রথার বিপক্ষতাচরণ করাও তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই প্রথার মূল কি? অনেকেই সংস্কৃত নাটকে পড়িয়াছেন যে, প্রাচীন কালে রাজাদিগের প্রাসাদে প্রহরে প্রহরে বৈতালিকদিগের গান ও বাদ্য হইত ; এক্ষণে সেই রীতি কেবল দেবালয়াদিতে দৃষ্ট হয়। দিন দিন প্রতি প্রহরে গান বাদ্য করিতে হইলে, এতাধিক নূতন নূতন রাগ সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্য পুরাকালের সংগীত ব্যবসায়ীরা কৌশল করিয়া এক এক সময়ের জন্য এক এক রাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাতে অমিষ্ট রাগ, কিম্বা কোন রাগ অতিশয় পুরাতন ও দূষিত হইলেও, যথোচিত সময়ে গীত হইলে কেহ আপত্তি করিতে পারিত না ; শুনিতেই হইত। এই রূপ করিয়া রাগ-রাগিণীর সময় নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এই প্রকার সময়ের অনুরোধেই, অতীব প্রাচীন কালীয়, ও অনেক অমিষ্ট রাগ এ কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। এক এক রাগ চিরকালই এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাওয়া ও শুনা অভ্যাস হওয়াতে, অন্য সময়ে সেই রাগ গীত হইলে তত সুরস বোধ হয় না। অভ্যাস অতি প্রবল ব্যাপার ; অভ্যাসে নূতন স্বভাবের উৎপত্তি হয়। অনেকে বলেন যে, ভৈরবের সহিত প্রাতঃকালের কোন সম্বন্ধ যদি নাই, তবে তাহা বৈকালে কি রাত্রে গাইলেও প্রাতঃকাল মনে হয় কেন? ইহার কারণ স্মৃতি উদ্দীপনা (অ্যাসোসিএশন)। কোন দুইটী দ্রব্য বা কার্য্য সর্ব্বদাই একত্রে দেখা কি শুনা অভ্যাস হইলে, তাহার একটীকে দেখিলে কি শুনিলে অপরটী স্মৃতিপথে উদিত হয়, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম। কথায় বলে—"ঢাকে কাটি পড়িলে চড়ুকের পিঠ সড সড করে", ইহারও কারণ স্মৃতি-উদ্দীপনা। আমরা ক্রন্দন ধ্বনির সহিত সর্ব্বদাই মুখ ম্লান ও চক্ষে জল দেখি, সেই জন্য কোথাও রোদন শুনিলে, ম্লান মুখ ও সজল নয়ন মনে উদয় হয়। স্বভাবের এই নিয়ম নিবন্ধন অন্য সময়ে ভৈরব শুনিলেও মনে প্রাতঃকালের ভাব

* "এবম্ বিধাচারে গীতকালঃ সমীরিতঃ।
যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈ গীতং বিজ্ঞস্তথাচরেৎ॥" সঙ্গীত নির্ণয়।

† "রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞয়াং কালদোষো ন বিদ্যতে।" নারদ সংহিতা।

উদয় হয়; পূরবী শুনিলে সন্ধ্যার ভাব উদয় হয়, ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আর কোনই কারণ নাই। অধুনাতন হিন্দুস্থানে প্রচলিত কোন্ কোন্ রাগাদির নিরূপিত সময় কি কি, তাহারা কোন্ জাতীয়, এবং কোন্ ঠাটে গেয়, তাহা নিম্নে বর্ণানুক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রচলিত রাগাদির সময়, ঠাট ও জাতি।

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত
আড়ানা ...	রাত্রি ২য় প্রহর †	কোমল গ ও নি ...	সম্পূর্ণ	
আভীরি ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল গ ও নি ...	ঐ	
আসাবরী ...	দিবা ২য় প্রহর	কোমল রি গ, ধ ও নি ..	ঐ	
আলাহিয়া ...	দিবা ২য় প্রহর	স্বাভাবিক ...	ঐ	
ইমন (সর্ব্বপ্রকার) §	রাত্রি ১ম প্রহর	কড়ি ম ...	ঐ	
ইমন-কল্যাণ ...	রাত্রি ১ম প্রহর	দুই ম ‡ ...	ঐ	
কল্যাণ	রাত্রি ১ম প্রহর	কড়ি ম ...	ঐ	
কানড়া (সর্ব্বপ্রকার)	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	কোমল গ ও নি ...	ঐ	
কামোদ ...	রাত্রি ১ম প্রহর	কোমল নি ...	ঐ	
কালাংড়া ...	দিবা ১ম প্রহর	কোমল রি ও ধ ...	ঐ	
কেদারা ...	রাত্রি ১ম প্রহর	দুই ম ...	ঐ	
কোকব ...	দিবা ২য় প্রহর	স্বাভাবিক ...	ঐ	
খট্ ...	দিবা ১ম প্রহর	কোমল রি ও ধ, দুই গ ও নি	ঐ	

* এই ঠাটের সহিত মৎ প্রণীত প্রথম মুদ্রিত 'সেতার শিক্ষা' গ্রন্থে লিখিত রাগাদির ঠাটের কোন কোন স্থানে অনৈক্য হইবে, কারণ ঐ পুস্তক লিখিবার কালীন আমার অনুসন্ধানের ত্রুটি ছিল।

† তিন তিন ঘণ্টায় এক এক প্রহর। প্রথম প্রহর উষা হইতেই আরম্ভ।

‡ দুই ম-এর অর্থ কড়ি ও স্বাভাবিক ম, দুই নি-এর অর্থ কোমল ও স্বাভাবিক নি; দুই গ এর অর্থও ঐ।

§ অর্থাৎ ইমনের সহিত যে যে রাগ মিশ্রিত হয়, যেমন ইমন-ভূপালী।

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত।
খাম্বাজ ...	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	দুই নি ...	সম্পূর্ণ	
গান্ধারী ...	দিবা ২য় প্রহর	কোমল রি, গ, ধ ও নি	ঐ	
গারা ...	রাত্রি ২য় প্রহর	দুই নি	ঐ	
গুণকেলী ...	দিবা ২য় প্রহর	কোমল রি ও ধ ও দুই ম	ঐ	
গুর্জ্জরী ...	দিবা ২য় প্রহর	কোমল রি, গ, ধ ও নি ...	ঐ	
গৌড় ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ ও নি ...	ঐ	
গৌর-সারঙ্গ ...	দিবা ২য় প্রহর	দুই ম ...	ঐ	
গৌরী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ ও দুই ম	ঐ	
চৈতা গৌরী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ ...	ঐ	
ছায়ানট ...	রাত্রি ১ম প্রহর	স্বাভাবিক ...	ঐ	
জয়জয়ন্তী ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল নি ও দুই গ ...	ঐ	
জয়শ্রী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ, কড়ি ম ...	ঐ	
জয়ন্ত ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও কড়ি ম ...	ষাড়ব	
জিলফ ...	রাত্রি ২য় প্রহর	দুই নি ...	সম্পূর্ণ	
ঝিঁঝোটী ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল নি ..	ঐ	
তিলক-কামোদ ..	রাত্রি ২য় প্রহর	দুই নি	ঐ	
তোড়ী (সকল প্রকার)	দিবা ২য় প্রহর	কোমল রি, গ, ধ ও নি	ঐ	
ত্রিবণ ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ, কড়ি ম ...	ঐ	
দরবারী তোড়ী ...	দিবা ২য় প্রহর	ঐ রি, গ, ধ ও নি, কড়ি ম	ঐ	
দরবারী কানড়া ...	রাত্রি ১ম প্রহর	কোমল গ, ধ ও নি ...	ঐ	
দেওগিরি ...	দিবা ২য় প্রহর	স্বাভাবিক ...	ঐ	
দেশাক ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ, দুই নি ...	ঐ	

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত।
দেশ ...	রাত্রি ২য় প্রহর	দুই নি	সম্পূর্ণ	
দশকার ...	দিবা ১ম প্রহর	স্বাভাবিক	খাড়ব	ম
ধনশ্রী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ, কড়ি ম ...	সম্পূর্ণ	
নট (সকল প্রকার) ...	রাত্রি ১ম প্রহর	স্বাভাবিক	„	
নটকিন্দ্র ...	রাত্রি ১ম প্রহর	স্বাভাবিক	„	
নিশাসাগ ...	রাত্রি ১ম প্রহর	দুই নি	„	
পঞ্চম ...	দিবা ২য় প্রহর	কোমল রি	খাড়ব	প
পটমঞ্জরী ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ ও নি ...	সম্পূর্ণ	
পরজ ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল রি, কড়ি ম ...	„	
পাহাড়ী ...	রাত্রি ২য় প্রহর	দুই নি	„	
পিলু	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	কোমল ধ ও গ ...	„	
পূরবী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও দুই ম ...	„	
পুরিয়া ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও কড়ি ম ...	খাড়ব	প
পুরিয়া-ধনশ্রী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ, কড়ি ম ...	সম্পূর্ণ	
বসন্ত ...	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	কোমল রি ও দুই ম ...	খাড়ব	প
বাগশ্রী ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ ও নি ...	সম্পূর্ণ	
বাঙ্গালী ...	দিবা ১ম প্রহর,	কোমল রি ও ধ ...	„	
বাহার	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ ও নি ...	„	
বারোয়াঁ ...	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	দুই গ, দুই নি ...	„	
বিভাষ ...	দিবা ১ম প্রহর	স্বাভাবিক ...	খাড়ব	ম
বৃন্দাবনীসারঙ্গ ...	দিবা ২য় প্রহর	স্বাভাবিক ...	ঔড়ব	গ ও ধ
বেলাবলী ...	দিবা ২য় প্রহর	দুই ম ...	সম্পূর্ণ	

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত।
বেহাগ ...	রাত্রি ২য় ও ৩য় প্রহর	দুই ম	ঔড়ব	রি ও ধ
বেহাগড়া ...	রাত্রি ৩য় প্রহর	দুই নি	খাড়ব	রি
বৈরাটী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ, কড়ি ম ...	সম্পূর্ণ	
ভাটিয়ারী ...	দিবা ১ম প্রহর	কোমল রি ও ধ ...	„	
ভামপলাশী ...	দিবা ৩য় প্রহর	দুই গ, কোমল নি ...	„	
ভূপালী ...	রাত্রি ১ম প্রহর	স্বাভাবিক	ঔড়ব	ম ও নি
ভৈরব ...	দিবা ১ম প্রহর	কোমল রি ও ধ, দুই নি ...	সম্পূর্ণ	
ভৈরবী ...	দিবা ১ম ও ২য় প্রহর	কোমল রি, গ, ধ ও নি ...	„	
মধুমাধসারঙ্গ ...	দিবা ২য় প্রহর	দুই নি	ঔড়ব	গ ও ধ
মল্লার (সকল প্রকার)	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	দুই নি	সম্পূর্ণ	
মারোয়া ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি, কড়ি ম	খাড়ব	প
মারু ...	রাত্রি ১ম প্রহর	স্বাভাবিক	সম্পূর্ণ	
মালকোশ ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ, ধ ও নি	ঔড়ব	রি ও প
মিয়া-মল্লার ...	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ ও নি	সম্পূর্ণ	
মালশ্রী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কড়ি ম	ঔড়ব	রি ও ধ
মালি-গৌরা ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি, কড়ি ম	সম্পূর্ণ	
মুলতানী ...	দিবা ৩য় ও ৪র্থ প্রহর	কোমল রি গ ও ধ, দুই ম	„	
মেঘ ...	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	স্বাভাবিক	খাড়ব	ধ
যোগিয়া ...	দিবা ১ম প্রহর	কোমল রি ও ধ	সম্পূর্ণ	
রাজবিজয় ...	দিবা ৩য় প্রহর	কোমল গ ও নি	„	
রামকেলী ...	দিবা ১ম প্রহর	কোমল রি ও ধ, দুই নি	„	
ললিত ...	রাত্রি ৪র্থ প্রহর	কোমল রি	খাড়ব	প

রাগ	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত।
ললিতাগৌরী ...	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ, দুই ম ...	সম্পূর্ণ	
লুম	রাত্রি ২য় প্রহর	স্বাভাবিক ...		
শঙ্করা	রাত্রি ২য় প্রহর	দুই ম ...		
শঙ্করাভরণ	রাত্রি ২য় পধর	দুই ম ...		
শুক্লবেলাবলী	রাত্রি ১ম প্রহর	দুই নি ...		
শ্যাম .	রাত্রি ১ম প্রহর	দুই ম ...		
শ্রী রাগ .	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ, কড়ি ম		
শ্রীটঙ্ক .	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ		
সর্ফর্দা .	দিবা ২য় প্রহর	দুই নি ...		
সাজগিরি .	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ও ধ	খাড়ব	
সারঙ্গ (সং . [illegible]	দিবা ২য় প্রহর	দুই নি ...	সম্পূর্ণ	
সাহানা .	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল নি ও গ		
সিন্ধু .	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল নি ও গ		
সুবট .	রাত্রি ১ম ও২য় প্রহর	দুই নি ...		
সিন্দুড়া .	রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর	কোমল গ ও নি		
সুরমল্লার .	রাত্রি ২য় প্রহর	দুই নি ...	খাড়ব	গ
সোহিনী .	রাত্রি ৩য় ও ৪র্থ প্রহর	কোমল রি ...	খাড়ব	প
হাম্বীর .	রাত্রি ১ম প্রহর	দুই ম ...	সম্পূর্ণ	
হিন্দোল .	রাত্রি ২য় ও ৩য় প্রহর	কড়ি ম ...	ঔড়ব	রি ও প

আধুনিক ঔড়ব খাড়ব রাগের বর্জ্জিত সুর সম্বন্ধে ওস্তাদদিগের মধ্যে এই এক নিয়ম প্রায় দেখা যায় যে, যে রাগের যে সুর বর্জ্জিত, তাঁহারা অবরোহণে সেই সুর সংক্ষেপে অলঙ্কার স্বরূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

মেঘ, সুরট, দেশ, গৌড় প্রভৃতি মল্লার জাতীয় কয়েকটী রাগ বর্ষা ঋতুর যে কোন সময়ে গাওয়া যায়। বসন্ত, হিন্দোল ও বাহার বসন্ত কালের সকল সময়ে গীত হইতে পারে। কাফী হিন্দুস্থানীয়দিগের দোলোৎসবের রাগিণী; উহা শ্রীপঞ্চমী হইতে দোলোৎসব সাঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত সকল সময়েই গীত হইয়া থাকে। ইমন পারস্য রাগ; আমীর খশ্রু ইহা ভারতবর্ষে প্রচারিত করেন। ইমনের সহিত অনেক রাগ মিশ্রিত হইয়াছে, যেমন ইমন-পুরিয়া, ইমন-ভূপালী, ইমন-বেলাবলী, ইমন-বেহাগ, ইমন-কল্যাণ, ইমন-ঝিঁঝোটী বা ইম্‌নী, ইত্যাদি। তুরস্ক দেশ হইতেও রাগ সংগৃহীত হইয়াছিল; যেমন তুরস্ক তোড়ি, তুরস্ক গৌড়, এই প্রকার নাম সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রচলিত নাই। বাহার, আলাহিয়া, সর্ফর্দা, সাজগিরি, সাহানা, আডানা, সোহিনী, সুহা, সুঘরাই, জিলফ, মারু, এই কয়েকটী রাগ মুসলমানদিগের সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। পিলু, বারোয়াঁ, লুম, ঝিঁঝোটী, মারু, এই কয়েকটী অল্প দিন হইল সংগৃহীত হইয়াছে; কোন সংস্কৃত গ্রন্থেই ইহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; এবং ইহাদের প্রকৃতি অতি ক্ষুদ্র, অর্থাৎ ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এখনও সম্পূর্ণ রূপে বর্দ্ধিত ও প্রস্ফুটিত হয় নাই; এবং ইহাদের গান করিবার সময়ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পিলু অধুনা হিন্দুস্থানে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ঝুলন-যাত্রার সময় গীত হইয়া থাকে।

গ্রহ-স্বর ও ন্যাস-স্বর

অনেকের এ রূপ ভ্রান্ত সংস্কার যে, প্রত্যেক রাগ স্বরগ্রামের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বর হইতে উত্থাপিত হয়, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্বরেই সমাপ্ত হয়। এই সংস্কারের মূল এই যে, সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসমূহে "গ্রহ-স্বর" ও 'ন্যাস-স্বর" নামক দুই প্রকার স্বরের উল্লেখমাত্র, তাহাদের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—যে স্বর হইতে রাগ উত্থাপিত হয়, তাহার নাম গ্রহ-স্বর, এবং যে স্বরে রাগ সমাপ্ত হয়, তাহার নাম ন্যাস-স্বর। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাগের উত্থাপন ও শেষ, এটী মনগড়া কথা; কারণ প্রাচীন কালের গীত হইতেই রাগ-রাগিণী বাহির হইয়াছে; রাগ-রাগিণী কখন পৃথক্ সৃষ্ট নহে যে, রচয়িতা কর্ত্তৃক তাহাদের উত্থাপন ও সমাপ্তি নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে; তাহা হয় নাই। গীতেরই উত্থাপন ও সমাপ্তি স্বরগ্রামের কোন স্বর নির্ব্বিশেষে নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রয়োজনসিদ্ধ বটে। এই হেতু সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের মধ্যেও ঐ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ

রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে গ্রহ-স্বর ও ন্যাস-স্বর উল্লেখ করেন; কেহ গীত সম্বন্ধে গ্রহ-স্বর বর্ণনা করেন,—অর্থাৎ যে সুর হইতে গীত আরম্ভ হয়, তাহাই গ্রহ-স্বর; এবং যে সুরে গীত শেষ হয়, তাহাই ন্যাস-স্বর (১২শ পরিচ্ছেদে ঐ বিষয়ের প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। আমার মতে ঐ শেষোক্ত বিষয়ই যুক্তি ও ব্যবস্থা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—"ভজ ভজরে মন কৃষ্ণ" নামক চৌতালে ইমন-কল্যাণের হিন্দী ধ্রুপদ সা হইতে আরম্ভ হয়, এবং রি-এ সমাপ্ত হয়; "আনন্দী জগবন্দী" নামক ঐ তালে ঐ রাগের ধ্রুপদ প হইতে উত্থাপিত হইয়া সা-এ সমাপ্ত হয়; "আল্লা মাডি আরজ শুনিয়ে" নামক ইমন-কল্যাণের খেয়াল নি হইতে উত্থাপিত হইয়া সা-এ শেষ হয়; "ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা" নামক দাওয়ান মহাশয় (রঘুনাথ রায়) কৃত ইমন-কল্যাণের খেয়ালটী রি হইতে আরম্ভ হইয়া সা-এ সমাপ্ত হয়, ইত্যাদি। ঐ সকল উত্থাপন ও সমাপ্তি স্থানান্তরিত হইলে ব্যাভিচার ঘটে।

রাগ-রাগিণ্যাদির গঠন ও অবয়ব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের উত্থাপন ও সমাপ্তি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সুরে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ঠাটে উহারা গীত হয়, তাহার প্রত্যেক সুর হইতেই রাগাদি উত্থাপিত হইতে পারে। যেমন ইমন-কল্যাণ রাগ সা হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, রি হইতেও পারে, গ হইতেও পারে, কড়ি ম হইতে, প হইতে, ধ হইতে, ও নি হইতেও আরম্ভ হইতে পারে। সকল রাগ রাগিণী সম্বন্ধেই ঐ নিয়ম। কেবল যে রাগে যে সুর বর্জ্জিত, অর্থাৎ ব্যবহার হয় না, সেই সুর হইতে সেই রাগ উত্থাপিত হইতে পারে না। কেহ ঐ কথার বিরুদ্ধে এই মাত্র তর্ক করিতে পারেন যে, ইমন-কল্যাণ কেবল সা হইতে কিম্বা রি হইতে, কিম্বা নি হইতে, এইরূপ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সুর হইতে আরম্ভ হয়; অন্যান্য সুর হইতে উত্থাপিত হইলে, উহার প্রকৃত মূর্ত্তির ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু বাস্তবিক কার্য্যে সে রূপ হইতেছে না; কারণ যাহারা ইমন-কল্যাণ রাগকে প্রকৃষ্টরূপে চিনিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে সকল সুর হইতেই উত্থাপিত করিয়া উহার মূর্ত্তি অবিকৃত রাখিতেছেন। ইহার পরিষ্কার প্রমাণ গানে; ধ্রুপদ হউক, বা খেয়াল হউক, একই রাগের ভিন্ন ভিন্ন গান সর্ব্বদাই বিভিন্ন সুর হইতে উত্থাপিত হইতেছে, অথচ তাহাতে রাগও ঠিক থাকিতেছে। উল্লিখিত প্রসিদ্ধ কয়েকটী গান তাহার দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে যেমন বলিলাম যে পূর্ব্বকালের গায়কগণ গান হইতে রাগ বাহির করিয়া, তাহার আলাপ * সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই আলাপে সকল রাগই সা হইতে উত্থাপন করা

* ১০ম পরিচ্ছেদে আলাপের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

ও সা-এ শেষ করার প্রথা হইয়া গিয়াছে। কেবল এই স্থানে এই একটী মাত্র নিয়ম অধুনা নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাদী, সম্বাদী ইত্যাদি।

অনেকের আরও এক সংস্কার এই যে, রাগের মধ্যে বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী নামক চারি প্রকার স্বর ব্যবহার হয়, যদ্দ্বারা রাগের মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। এই সংস্কারেও অনেক ভ্রম লক্ষিত হয়; এবং ইহারও মূল সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ। রাগের মধ্যে যে স্বর অধিক বার ব্যবহার হয়, সেই স্বরকে বাদী বলা হইয়া থাকে; তদপেক্ষা কম সংখ্যক স্বরকে সম্বাদী, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যককে অনুবাদী; এবং নিতান্ত অল্প সংখ্যক, কিম্বা অব্যবহার্য্য, বা রাগভ্রষ্টকর স্বরকে বিবাদী বলা হইয়া থাকে। "সঙ্গীতসার", "ছয় রাগ", প্রভৃতি বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থে বাদী বিবাদী প্রভৃতির ঐ প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় *। কিন্তু সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থাদিতে বাদী সম্বাদী প্রভৃতির ব্যাখ্যা উহা হইতে অনেক প্রভেদ, তাহা ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। কিন্তু যে কোন ব্যাখ্যাই হউক, কোন ব্যাখ্যারই অনুরূপ বাদী সম্বাদী স্বর তাবৎ রাগের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সোমেশ্বর নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার বলেন যে, রাগের মধ্যে যে স্বর অধিক ব্যবহার হয়, তাহাকে অংশ অর্থাৎ বাদী স্বর বলে। ইহাতে আপাততঃ এই বোধ হয় যে, মালকৌশ ও কেদারা রাগিণীতে যেমন ম, ঝিঁঝোটীতে গ, কালাংড়ায় প, বিভাষে ধ, এই প্রকার স্বরগুলিই বাদী। কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময়ে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। মনে কর, যে ব্যক্তি কেদারা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, তিনি ম অল্প ব্যবহার করিয়াও উহার মূর্ত্তি সুপ্রকাশ করিতে পারেন। সকল রাগেই ঐরূপ হইতে পারে। কোন স্বর অধিক ও অল্প ব্যবহার করা, সে গায়কের ইচ্ছাধীন। ফলতঃ সে যাহা হউক, কেদারায় যে প্রকার ম, ঝিঁঝোটীতে গ, এই প্রকার অবস্থাপন্ন স্বর কয়টী রাগে পাওয়া যায়? প্রচলিত রাগের মধ্যে যে কয়টীতে পাওয়া যায়, তাহাই উপরে বলা হইয়াছে, ঐরূপ রাগ আর অধিক পাওয়া দুষ্কর।

অনেকে মনে করেন যে, সকল প্রকার মল্লারে, বাহারে, ভৈরবে, ভীমপলাশীতে, মেঘে ও ললিতে ম বাদী; বেহাগ, পুরিয়া, হিন্দোল, জয়ন্ত ও গৌর সারঙ্গ,

---

* বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও ঐ মতের অনুবর্ত্তী। তিনি ইং ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ইংরাজী পত্রিকা "কলিকাতা রিভিউতে" তাঁহার কৃত হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধে, বাদীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে গ বাদী; ইমন, ইমন-কল্যাণ, কল্যাণ, কামোদ, যোগিয়া. শ্রী, রামকেলী, মুলতানী সকল প্রকার তোড়ি, সাহানা, ও আড়ানা, ইহাদের মধ্যে প বাদী; হাম্বীরে ও আলাহিয়াতে ধ বাদী; এবং ছায়ানটে, বৃন্দাবনী সারঙ্গে, ও কানড়ায় রি বাদী। কিন্তু ইহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই; কারণ অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞ লোকে অন্য প্রকারও বলিতে পারেন।' আমি বলিব ইমন-কল্যাণে প বাদী; আর এক জনে বলিবে, গ নহে কেন? উহাতে প যেমন প্রয়োজনীয়, গও তদ্রূপ; নিও তদ্রূপ, কড়ি-ম পর্য্যন্ত তাদৃশ প্রয়োজনীয়। সুনিপুণ রাগজ্ঞ লোকে ঐ কএকটা সুরই ইমন-কল্যাণে অধিক বার ব্যবহার করিয়া গাইতে পারেন অথচ রাগভ্রষ্ট হইবে না। অদূরদর্শী, কাঁচা লোকের সে ক্ষমতা কখনই হইবে না। অতএব বাদী সম্বাদীর ঐ নিয়ম বিজ্ঞানের নিয়মানুরূপ পাকা নহে। উহা যে মনগড়া নিয়ম, তাহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। ঐ প্রকার বাদী বিবাদী সম্বন্ধীয় সূত্র সকল সংগীত ব্যাকরণের বিষয়ীভূত বটে। ব্যাকরণ যেমন ভাষা শিক্ষার সাহায্যকারী, সংগীত ব্যাকরণও তেমনি সংগীত শিক্ষার সাহায্যকারী হওয়া উচিত। কিন্তু প্রাচীন কালের কথা বলা যায় না, আধুনিক কালে উক্ত বাদী সম্বাদী ধরিয়া কেহ কখন রাগ শিক্ষা করে নাই ইহা নিশ্চয়। বরং শিক্ষা কালে বাদী সম্বাদীর উল্লেখ করিলে রাগ শিক্ষার সাহায্য হওয়া দূরে থাক, যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়, কেননা রাগের মধ্যে বাদী সম্বাদী সুরের নিশ্চয় হয় না। সংস্কৃত গ্রন্থেও বাদী সম্বাদী সম্বন্ধে নানা মত।

বিবাদী সুর সম্বন্ধে অনেকের সংস্কার এই যে, যে রাগে যে সুর বর্জ্জিত, তাহা সেই রাগের বিবাদী সুর;—যেমন বৃন্দাবনী সারঙ্গে গ, বেহাগে রি, মালকৌশ ও হিন্দোলে রি ও প, ইত্যাদি। কিন্তু বাদী বিবাদী প্রভৃতি চারি প্রকার সুরই যখন প্রত্যেক রাগে প্রয়োজনীয় বলিয়া সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণনা আছে, তখন ঐ প্রকার বর্জ্জিত সুরকে বিবাদী বলা সঙ্গত হয় কৈ? সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ বিবাদীর তাৎপর্য্য ভিন্ন রূপ লিখিয়াছেন; তাহা ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। সম্বাদী অনুবাদী সম্বন্ধে এ স্থানে আর অধিক কথা উত্থাপন করিব না। ১২শ পরিচ্ছেদে উহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে বিচার হইবে।

কেহ কেহ রাগের বাদী সুর প্রমাণার্থে গানের, কিম্বা সেতারাদিতে আলাপ বাদনের সঙ্গে সঙ্গে, সুর দেওয়ার যন্ত্রে, বিভিন্ন সুর বাজাইয়া দেখিতে বলেন যে, যে সুর বাজাইতে থাকিলে, তাহা রাগের সহিত মিশে ও অধিক মিষ্ট শুনায়, তাহাই সেই রাগের বাদী। কিন্তু ইহাতে এক ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে, তাহা অনেকে জ্ঞাত নহে।

গায়কে যে তাম্বুরার সহিত গীত গান, এবং যন্ত্রী যে যন্ত্রে আলাপ বাদন করেন, তাহাতে সর্ব্বদা সা, এবং কখন কখনও প স্বর সচরাচর ধ্বনিত হইতে থাকে। অতএব গানের কিম্বা বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্বর দিতে হইলে, সে স্বর ঐ সা ও প-এর সহিত মিশে, তাহা ভিন্ন অন্য স্বর কখনই মিষ্ট লাগে না। সা-এর সহিত গ ও প বাজাইলে সুশ্রাব্য হয়, মও সা-এর সহিত উত্তম মিশে, রি প-এর সহিত বাজিলে মিষ্ট হয়, সা-এর সহিত হয় না। এ অবস্থায় গ, ম ও প, এই কয়টী মাত্র স্বর রাগগণের বাদী দাঁড়ায়। কিন্তু অনেকে এইরূপ করিয়া প্রায়ই আধুনিক কালে রাগাদির বাদী স্বর বাহির করিতেছে; সেই জন্য কেবল গ, ম ও প অধিকাংশ রাগের বাদী বলিয়া ধরা হয়; এবং রি ও ধ অতি অল্প রাগের বাদী হয়। নি ও কড়ি কোমল স্বর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, কেননা উহারা সা-এর সহিত মিশে না বলিয়া, কোন রাগের সঙ্গেই উহাদিগকে বাজান হয় না, সুতরাং উহারা বাদীও হইতে পারে না। কোন কোন লোকের এরূপ ভ্রান্তিও আছে যে, নি বেহাগের বাদী, এবং কোমল রি গৌরী ও ভৈরবীর বাদী। যাহাই হউক, উপর্য্যুক্ত ব্যবস্থা যখন সংস্কৃত গ্রন্থের লক্ষণানুযায়িক হয় না, তখন উহা গ্রাহ্যযোগ্যও হইতে পারে না।

পরন্তু এতদ্দেশীয় নব্য সংগীতবিদ্‌গণ যদি এরূপ তর্ক করেন যে, বাদী বিবাদীর উল্লিখিত তাৎপর্য্য গ্রহণে রাগ-রাগিণীর শিক্ষার কতক সাহায্য হইলেও হইতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থের লক্ষণানুযায়িক গোলযোগ পূর্ণ ব্যাখ্যায় আমাদের প্রয়োজনই বা কি? ভাষাবিৎ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, এরূপ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে যে, কোন শব্দের অর্থ প্রাচীন কালে একরূপ ছিল, এখন তাহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইতেছে। বাদী সম্বাদী সম্বন্ধেও ঐরূপ করিলে ক্ষতি কি? ভাল কথা, ইহাতে আমার আপত্তি নাই। অতএব এ অবস্থায় রাগাদির বাদী সম্বাদী নিরাকরণ করার এক সদুপায় বলিতেছি। উপরে যে সকল রাগের বাদী স্বর নিরাকৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন রাগ সম্বন্ধে এই নিয়ম:—যে রাগ সম্পূর্ণ জাতীয়, ও স্বাভাবিক ঠাটে গেয়, কিম্বা গ ব্যতীত অন্যান্য স্বর যাহাতে কোমল, তাহার বাদী স্বর গ, কিম্বা প; গ বাদী হইলে প সম্বাদী, এবং প বাদী হইলে গ সম্বাদী, ইহা সাধারণ নিয়ম; অন্যান্য স্বর ঐ রাগে অনুবাদী। সম্পূর্ণ জাতীয় রাগে বিবাদী স্বর নাই। স্বাভাবিক ঠাটে গেয়, কিম্বা গ ও ম ব্যতীত অন্যান্য স্বর যাহাতে বিকৃত, এমন খাড়ব ও ঔড়ব জাতীয় রাগে প বর্জ্জিত হইলে, তাহাতে গ কিম্বা ম বাদী, ধ কোমল না হইলে, সম্বাদী। যে রাগে যে স্বর বর্জ্জিত, সেই তাহার বিবাদী স্বর ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রি, কিম্বা ম, কিম্বা ধ, কিম্বা নি বর্জ্জিত রাগে গ কিম্বা প বাদী: ম বাদী হইলে ধ সম্বাদী, এবং প বাদী হইলে রি সম্বাদী। গ বর্জ্জিত

রাগে কড়ি ম ব্যবহার হইতে দেখা যায় না। কড়ি কোমল স্বর কখন বাদী সম্বাদী হইতে পারে না। যে রাগে গ কোমল, তাহাতে ম কিম্বা প বাদী ; ম বাদী হইলে স্বাভাবিক ধ সম্বাদী ; এবং প বাদী হইলে স্বাভাবিক রি সম্বাদী। ইহারা কোমল হইলে সে রাগ সম্বাদী হীন হইবে। ঐ নিয়ম এ প্রকার রাগের পক্ষে অনুপযোগী হইবে, যাহাতে গ ও প ভিন্ন অন্য কোন স্বাভাবিক স্বর অধিক বার ব্যবহার হয় ; সে স্থলে সেই অধিক বার ব্যবহৃত স্বরই সেই রাগের বাদী হইবে, ইহা সাধারণ বিধি।

রাগ-রাগিণী স্বর-বিন্যাসের উদাহরণ মাত্র, অতএব তাহার কখনই সীমা হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে যে রাগ শুনিতে পাওয়া যায়, উপরে সেই গুলিরই সময়, ঠাট প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইল। 'সঙ্গীতসার' কর্ত্তা গোস্বামী মহাশয়ও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা 'সংগীত রত্নাকর' নামক গ্রন্থে প্রচলিত ও অপ্রচলিত, সকল প্রকার রাগেরই উল্লেখ করিতে, এবং তাহাদের সময় ও ঠাট পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে, গ্রন্থকার ক্রটি করেন নাই। সেই সকল ঠাট যে বিশুদ্ধ, তাহার প্রমাণ কি ? কিন্তু অপ্রচলিত রাগাদির সেই সকল ঠাট শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হউক, তাহাদের গান সংগ্রহ করা যখন এক প্রকার অসম্ভব, তখন তাহাদের কেবল ঠাটমাত্র জানিয়া লোকের কি উপকার হইবে ? ঐ গ্রন্থে প্রচলিত রাগেরও যে রূপ ঠাট লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রায়ই অশুদ্ধ, যেমন ভৈরবী ও তোড়িতে রি স্বাভাবিক ; যোগিয়া ও মুলতানীতে রি ও ধ স্বাভাবিক ; বিভাষ ও হিন্দোলে ধ কোমল, পুরবীতে গ, ও জয়-জয়ন্তীতে রি কোমল ; ইত্যাদি। এই প্রকার কত ভুল আর দেখাইব! ঐ গ্রন্থে ঐতিহাসিক ভ্রমেরও কমি নাই ; তাহার এক উদাহরণ দিতেছি। গ্রন্থকার উপক্রমণিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন, "নায়ক গোপাল গাড়া, পুরবী, গৌরী, বসন্ত, তোড়ি, গুণকেলী, ষট, দেশকার প্রভৃতি কতকগুলি রাগিণী প্রস্তুত করেন।" বসন্ত এক মতে আদি রাগ ; গৌরী, তোড়ী, গুণকেলী ইহারা আদি রাগিণী ; কোন্ যুগযুগান্তর হইতে ইহারা চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের প্রাচীনত্বের সহিত তুলনা করিলে নায়ক গোপালকে যেন গতকল্যের লোক বলিয়া বোধ হয় * ; গ্রন্থকার এ বিষয় স্বপ্নেও একবার মনে করেন নাই। এই প্রকার অনেক অযৌক্তিক বিবরণ ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকারদিগের সংগীত পুস্তক লিখিয়া

* নায়ক গোপাল আমীর খস্রুর সহসময়ী ; ১০ম পরিচ্ছেদে ধ্রুপদের বিবরণে ইহা দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ করার সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তর্কের স্থলে উহারা বলিতে পারেন যে, হিন্দু সংগীতে এত প্রকার মত আছে, তাহাতে কি শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ, ইহা কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে ? এক মতে যাহা অশুদ্ধ, অন্য মতে তাহা শুদ্ধ। ইহাই যদি আমার উক্ত সমালোচনার উত্তর হয়, তাহা হইলে সংগীত পুস্তকাদি লিখিবারও প্রয়োজন নাই, সংগীত শিক্ষা করিতে গুরূপদেশেরও প্রয়োজন নাই। স্বাভাবিক কণ্ঠ থাকিলে নিজে নিজেই এক প্রকার করিয়া গলা সাধিয়া, যাহা ইচ্ছা গাইয়া বলিলেই হয় যে, এই এক প্রকার সংগীত মত প্রাচীন কালে ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা কখনই হইতে পারে না, এক্ষণে বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে সমুদয় সুশিক্ষিত ওস্তাদ দিগের মতের পরস্পর যথেষ্ট ঐক্য রহিয়াছে। সেই মতের সংগীত গ্রন্থেরই আমাদের প্রয়োজন।

উপরে প্রচলিত রাগ-রাগিণীর যে প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম, সংগীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের মতের সহিত তাহা অনেক স্থলে অনৈক্য হইবে, কেননা তাঁহার বিষ্ণুপুরের মত, আমি সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী মতানুসারেই লিখিতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে বনবিষ্ণুপুরে হিন্দুস্থানী সংগীতের যেরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্যত্র হয় নাই। কিন্তু "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়া এক্ষণে বিষ্ণুপুরের কায়দা ও মত হিন্দুস্থানীয় খাস কায়দা ও মত হইতে অনেক ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ভিন্ন হইয়া "যে দেশের যা," তাহা অপেক্ষা সুতরাং অনেক নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অতএব বিষ্ণুপুরের পৃথক্ মত পরিপোষণ ও বলবান করণার্থ অধ্যাপক গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীতসার গ্রন্থে প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের মতের সহিত উক্ত মত ঐক্য করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু প্রায়ই গোঁজা মিলন দিতে হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন সংগীতের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ন্যায় কল্পতরু, যিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন, সংগীতসারে রাগালাপের মধ্যে অনেক স্থানেই গ্রন্থকর্ত্তা প্রাচীন সংগীত মতের মঞ্জুরী দর্শাইয়াছেন। কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে তিনি ঐ রূপ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, যেমন বিভাষ, ভূপালী, কুকুভা, সোহিনী, সাহানা ইত্যাদি, তাহাদের বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যদি লোকে অমান্য ও অবিশ্বাস করে, তখন তিনি কি বলিবেন ? প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সোমেশ্বর কৃত 'রাগবিবোধ' নামক গ্রন্থ বোধ হয় অনেক আধুনিক ; তাহার মত আধুনিক সংগীত মতের সহিত অনেক বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় সোমেশ্বরের মত ত্যজ্য করিয়া, যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের মত গ্রহণে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী

ওস্তাদেরা ললিতে প স্বর ব্যবহার করেন না, সোমেশ্বর সেই রূপই বলিয়াছেন; কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ঃ সোমেশ্বরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া 'সঙ্গীত দর্পণ'-এর মত প্রামাণ্য করিয়াছেন, কেননা ইহার সহিত তাঁহার ব্যবহার্য্য বিষ্ণুপুরের মত ঐ ললিত সম্বন্ধে ঐক্য হয়। ললিতে প বাদ দিলে তাহা বসন্ত হইতে কিরূপে পৃথক্ হয়, ইহা যে তিনি সন্দেহ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! কেননা প-বর্জ্জিত ললিতেব এক মূর্ত্তি, ও প-বর্জ্জিত বসন্তের আর এক মূর্ত্তি। "সিন্দুরিয়া" নামক একটী রাগ পাঞ্জাব দেশে অতিশয় প্রচল, যাহাকে আমরা ভুল ক্রমে "সিন্দুড়া" বলি, উহা সিন্ধু (সৈন্ধবী) হইতে যে অনেক পৃথক, তাহা অনুসন্ধান না করিয়া গোস্বামী মহাশয় সংগীতসারে সিন্ধুর আলাপের নিম্নস্থ টীকায় বলিয়াছেন যে, 'বস্তুতঃ এই দুইটী রাগিণীতে পরস্পর অতি অল্প প্রভেদ দেখা যায়।" এই জন্য তিনি সিন্দুবার আলাপ লিখিতে চেষ্টাও করেন নাই। তিনি সংগীতসারে বেহাগ, শঙ্করা, জয়েৎ, সাজগিরি ও মুলতানি, এই কএকটী রাগে কড়ি-নি-এর ব্যবহার দেখাইয়াছেন, ইহা যে তাঁহার ভ্রান্তি, তাহা ৪র্থ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। প্রাচীন সংগীতে কড়ি-নি-এর ব্যবহার হইতে পারিত, কারণ সে কালে শুদ্ধ নি হইতে সা-এর অন্তর পূর্ণান্তর ছিল, আধুনিক সংগীতে নি হইতে সা-এর ব্যবধান অর্দ্ধান্তব, অতএব ঐ নি আরও তীব্র হইতে পারে না, আধুনিক কালের যে স্বাভাবিক নি, সেই প্রাচীন কালেব তীব্র নি। প্রত্যুত গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কৃত কণ্ঠকৌমুদীতে ঐ সকল রাগের গানে কোথাও তীব্র নি ব্যবহাব করেন নাই। সংগীতসারে তিনি সাহানার আলাপে ধ স্বাভাবিক, এবং ইমন, হিন্দোল, হাম্বীর, ইমন-পুরিয়া, প্রভৃতির স্বাভাবিক ঠাট দেখাইয়াছেন; কিন্তু কণ্ঠকৌমুদীতে সাহানার ধ কোমল, এবং উক্ত ইমন, হিন্দোল প্রভৃতির কড়ি-ম বিশিষ্ট ঠাট দেখাইয়াছেন; এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার মতের সামঞ্জস্য নাই, এবং তিনি ঐ বিভিন্নতার কোন কারণও দেখান নাই। আমাদের মধ্যে এক গ্রন্থকারেরই যখন বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন মত হইতেছে, তখন সেই প্রাচীন কালে বিভিন্ন গ্রন্থকারের মত যে বিভিন্ন হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? সঙ্গীতে ঐ প্রকার মত বিভিন্নতার কোন অর্থ নাই, অর্থাৎ উহা কোন নিয়মের অনুগত নহে, উহা স্বেচ্ছাচারিতা, অসাবধানতা, ও অজ্ঞতার ফল।

আধুনিক হিন্দুস্থানী সংগীত প্রাচীন হিন্দু সংগীত হইতে অনেক ভিন্ন, অতএব তাহার উপযুক্ত মত ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইলে, সকলই নূতন করিতে হইবে। আমি তৎ সম্বন্ধে যে সকল উপপত্তি সুস্থির করতঃ এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতেছি, তাহা যদি ঐ সংগীতের যথার্থ উপযোগী হয়, তবে তাহা প্রাচীন প্রমাণাভাবে সর্ব্ব সাধারণের

নিকট নিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে; আর যদি তাহা না হয়, তবে শত সহস্র সংস্কৃত শ্লোকের বচন প্রমাণ দিলেও তাহা কখনই গ্রাহ্য হইবে না। অতএব কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোকের বচন উদ্ধৃত করায় একটা মস্ত ভড়ং হয় মাত্র; তাহাতে আসল উপকার কিছুই হয় না।

১০ম পরিচ্ছেদ ঃ—আলাপ ও গানের রীতি।

হিন্দু সংগীতে রাগিণীর আলাপ করা সংগীত শিক্ষার চরম ফল। যিনি আলাপ করিতে শিখিয়াছেন, তিনি সংগীতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং আলাপ অতি কঠিন কার্য্য বলিয়াই লোকের প্রতীতি। বস্তুতঃ হিন্দু সংগীতের সমস্ত বিদ্যা আলাপের উপর নিভর। আলাপ না জানিলে বিশুদ্ধ রূপে গানে স্বর যোজনা করা, এবং তান কর্ত্তব দ্বারা গানকে বিস্তৃত ও অলংকৃত করতঃ গানের বিচিত্রতা সম্বদ্ধন করা সম্ভবপর নহে। আলাপ ব্যতীত রাগের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি উপলব্ধি হয় না। কিন্তু লোকে আলাপ যত কঠিন মনে করে, তত কঠিন কার্য্য নহে, শিক্ষা প্রণালী অভাবে সকলই কঠিন। ওস্তাদেরা আলাপ সহজ করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন না, এবং পারিলেও দিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়াই, নব্য গায়ক আলাপ করিতে পারে না। এক রাগের কত প্রকার স্বর-বিন্যাস থাকে, তাহা না বলিয়া দিলে, শিক্ষার্থী কি প্রকারে জানিতে পারিবে? কিন্তু পৃথক্ রূপে শিক্ষা না পাইলেও, যাহার সমূহ স্বর জ্ঞান থাকে, এবং যাহার এক এক রাগের বহুতর গান জানা থাকে, এমন ব্যক্তি আলাপ পদ্ধতি দুই একবার শুনিয়া লইয়া চেষ্টা করিলেই আলাপ করিতে পারেন। আলাপে তালের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং স্বরলিপি দেখিয়া গান গাওয়া অপেক্ষা, আলাপ করা সহজ সাধ্য। ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে, স্বরলিপি দেশময় প্রচারিত হইলে, আলাপ করার প্রাধান্য তত থাকিবে না; তখন স্বরলিপি দেখিয়া একবারে তাল লয় সহকারে নূতন নূতন গান গাওয়ারই অধিক তারিফ হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ স্বরলিপির ব্যবহারে হিন্দু সংগীতের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা স্বরলিপির যে বীজ রোপিত হইতেছে, তদুৎপন্ন বৃক্ষে যে সকল সুন্দর সুখময় ফল ফলিবে, তাহা দেখিতে তত দিন জীবিত থাকা যাইবে না।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, অগ্রে আলাপের সৃষ্টি, তৎপরে গান। এই সংস্কার নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ; কারণ ব্যাকরণ যেমন ভাষার পর হইয়াছে, আলাপও সেইরূপ গানের পর গান হইতেই বাহির হইয়াছে। আলাপ সাংগীতিক ব্যাকরণের এক অংশ। সংগীতের ব্যাকরণ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—স্বরাধ্যায়,রাগাধ্যায়, তালাধ্যায় ও গীতাধ্যায়। আলাপ রাগাধ্যায়ের অন্তর্গত, বিভিন্ন প্রকার গান ও গতের* রীতি ও স্বর-রচনার কৌশল গীতাধ্যায়ের অন্তর্গত। এক্ষণে আলাপ কাহাকে বলে, তাহা বলা যাউক। হিন্দু সংগীতে যে সকল সুরে গান হয়, তাহার বিন্যাস প্রাচীন কাল হইতে নির্দ্দিষ্ট ভাবে চলিয়া আসিতেছে; সেই নির্দ্দিষ্ট স্বর-বিন্যাস সমূহের পারিভাষিক নাম 'রাগ' বা 'রাগিণী', রাগের সেই স্বর-বিন্যাসের পৃথক আলোচনাকে 'আলাপ' বলে। পুরাকালের সংগীতবিদ্‌গণ ভিন্ন ভিন্ন গানের স্বর-বিন্যাস সমূহের পরস্পর সাদৃশ্যানুসারে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, তাহার এক এক শ্রেণীকে এক এক প্রকার রাগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন,—: স | ম :— | প : ম | গ : – | ম : নো | — : ধো | প :— | ম : গ | রো :— | ম : গ । প: ম গ · বো | — :— | স : কিম্বা | স: প | রো : ম | নো$_{১}$, স | ধো$_{১}$: নো$_{১}$ | স : ম | — : ম | গ : রো ম: —। এই প্রকার স্বর-বিন্যাসকে ভৈরব রাগ বলে; | ন$_{১}$: স । গ:—। গ : ম । প · ম | গ :— | — : — র | ম : — | এই প্রকার স্বর-বিন্যাসকে বেহাগ কহে, ইত্যাদি। ঐ রূপ যত গুলি বিভিন্ন স্বর-বিন্যাস একটী রাগে ব্যবহার হয়, সেই সমস্ত সুর গানের কথা পরিত্যাগে ও অন্য এক প্রকার শব্দ যোগে উচ্চারণ করিলে, আলাপ করা হয়। যে সকল শব্দ যোগে আলাপ গাইতে হয়, তাহা এই :—নেতে, তেরে, নেরি, রেনা, নেরোম্, তোম্, নোম্, তানা, নানা, নেনে, নারে, আরেনা, ইত্যাদি; এই সকল শব্দ যোগে সুরোচ্চারণ করতঃ রাগের যথারীতি আশ্, মিড, কম্পন সহকারে আলাপ গাওয়ার প্রথা প্রচলিত।

গানের যেমন অনেক চরণ অর্থাৎ কলি থাকে, আলাপেরও তদ্রূপ, অর্থাৎ গানের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে যে রূপ বিভিন্ন স্বর-বিন্যাস ব্যবহার হয়, আলাপে তাহাই দেখাইতে হয়। ঐ কলি প্রধানতঃ চারি প্রকার :—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও

* যন্ত্রাদিতে যে সকল স্বর-বিন্যাস নানাবিধ ছন্দ অবলম্বন করিয়া বাদিত হয়, এবং যাহা গাওয়া যায় না, তাহাকে "গৎ" বলা যায়। 'গতি' শব্দের অপভ্রংশে গৎ হইয়াছে, ইহা হিন্দুস্থানী লোকদিগের সংক্ষেপ উচ্চারণের অভ্যাস বশতঃ উৎপন্ন। সঙ্গীতসার ও যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার গ্রন্থকর্ত্তাগণের এই সংস্কার যে, গৎ পারস্য ভাষা, ইহা নিতান্ত ভ্রম।

আভোগ। সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের মতানুসারে * "গানের যে স্থানে রাগ উপবেশন করে, তাহাকে আস্থায়ী বলে; গানের শেষ ভাগকে অর্থাৎ যথায় গীত সমাপ্ত হয়, তাহাকে আভোগ বলে; ইহাদের মধ্যে যে কোন স্থর উচ্চারিত হয়, তাহাকে অন্তরা বলে; এই তিনের মিশ্রিত যে স্থর, তাহার নাম সঞ্চারী।" কিন্তু আধুনিক গায়কদিগের মধ্যে যে অর্থে উহারা ব্যবহৃত হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে।

গানের প্রথম ভাগের নাম আস্থায়ী, যাহাকে মহড়া, কিম্বা ধুয়া (ধ্রুব) বলে; ইহা আরম্ভ হওয়ার কোন স্থর নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু আলাপে প্রথমেই রাগের উত্থান দেখাইতে হয়, তজ্জন্য মধ্য সপ্তকে স্বরগ্রামের প্রথম স্থর যে সা, তাহা হইতেই আস্থায়ী আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত। প্রসিদ্ধ গায়কেরা রাগের অধিকাংশ রূপই আস্থায়ীতে প্রকাশ করিয়া থাকেন; যাহা বাকি থাকে, তাহা অন্যান্য কলিতে পরিব্যক্ত হইয়া রাগের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হয়।

গানের দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা; ইহাতে স্থরের একটী নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে এই যে, ইহা প্রায়ই মধ্য সপ্তকের মধ্য স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া তার সপ্তকের সা^-এ আরোহণ করতঃ তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া, তৎপরে রাগ বিশেষে কেহ আরো উপরে যাইয়া নামিয়া আইসে, কেহ বা ঐ সা^ হইতেই নামিয়া আসিয়া আস্থায়ীর স্থরের সহিত মিলিত হইয়া সমাপ্ত হয়।

গানের তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী; ইহার নিয়ম এই, গানের আস্থায়ী ভাগ যে মধ্য সপ্তকে সম্পাদিত হয়, তাহারই একাংশ হইতে অবরোহণ করিয়া গায়কের সাধ্যমত খাদ সপ্তকের কতক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া, আবার আরোহণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়। তৎপরে গানটী পুনর্ব্বার আরোহণ গতি অবলম্বন করতঃ, তার সপ্তকের কতক স্থান পর্য্যন্ত বিচরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অবরোহণ করিয়া, মধ্য সপ্তকের কোন স্থানে সমাপ্ত হয়,—এই প্রকার অবস্থাপন্ন কলিকে আভোগ বলে; ইহা গানের শেষ কলি। ঐ সকল কলির দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় ভাগে গান ও আলাপের স্বরলিপিতে দ্রষ্টব্য।

কোন স্থানে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও ইহা নিশ্চয় যে, উক্ত চারি কলির স্থর বিভিন্ন প্রকার হওয়াই উচিত। পরন্তু রচনা কৌশলাভাবে আভোগের স্থর প্রায়ই অন্তরার ন্যায় দেখা যায়। এই চারি কলি গাওয়ার নিয়ম এই :—আস্থায়ী

* "যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ আস্থায়ীত্যুচ্যতে হি সঃ।
আভোগস্ত্বিমো ভাগো গীত পূর্ণত্ব সূচক॥
ধ্রুবাভোগান্তরে কশ্চিদ্ধাতুরন্তরাভিধঃ।" সঙ্গীত দর্পণ।
"এতৎ সংমিশ্রণাদ্বর্ণ সঞ্চারীতিনিগদ্যতে।" হরিনায়ক কৃত সঙ্গীতসার।

বারম্বার গাইতে হয়; তৎপরে অন্তরা গাইয়া আবার আস্থায়ী গাইতে হয়; তৎপরে আবার আস্থায়ী গাইয়া সমাপ্ত করিতে হয়; সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার রীতি নাই; সঞ্চারীর পরই আভোগ গাইতে হয়।

রাগের পরিচয় বোধক যতগুলি স্বর-বিন্যাস থাকে, তাহা প্রকাশ করাই আলাপের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কেহ কেহ যে এক ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ করেন, সে পৌনরুক্তি মাত্র। গান করার পূর্ব্বে রাগটীর আলাপ করিয়া লইলে, সকল প্রকার তালেই সেই রাগের গান অবাধে গাওয়া যায়; গানের কোন অংশের সুর স্মরণ না থাকিলেও বাধে না। হিন্দু সংগীতের বর্তমান অবস্থায় ঐ সকল উপকারার্থে আলাপের প্রয়োজন হয়।

গানের প্রকার ও রীতি

গদ্য কিম্বা পদ্যময়ী রচনা রাগ সহকারে, এবং তাল ও ছন্দ সহিতে বা বিহীনে, কণ্ঠে উচ্চারণ করাকে 'গান' বা 'গীত' কহে। সভা সমাজ মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তিন প্রকার রীতির গান প্রধান, যথা:—ধ্রুপদ (ধ্রুবপদ), খেয়াল ও টপ্পা। প্রবন্ধ ও হোরী গান ধ্রুপদের অন্তর্গত, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, গুল্‌নক্‌স, ও কওল-কোল্‌বানা খেয়ালের অন্তর্গত; তেলেনা বা তিরানা, যুগলবন্ধ, রাগ-মালা, ইহারা তদুভয়েরই অন্তর্গত; ঠুংরি, গজল, খেমটা প্রভৃতি টপ্পার অন্তর্গত।

ধ্রুপদ:—উক্ত তিন রীতির মধ্যে ধ্রুপদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভারতে মুসলমান রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ইহার যথেষ্ট আলোচনা ও উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আগমনকালে, বোধ হয় ধ্রুপদ গানই উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ হিন্দুদিগের উন্নত ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। ধ্রুপদের রচনা বিস্তৃত, এবং চারি অংশে অর্থাৎ কলিতে বিভক্ত। ঐ কলিকে হিন্দুস্থানী গায়কেরা "তুক্" নামে কহিয়া থাকে। চারি তুকের চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নাম; যথা,—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ; ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক তুকই তালের চারি ফেরে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু গায়কদিগের স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ কখন তালের তিন, পাঁচ, সাত ফেরেও কোন কোন তুক নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। স্বরলিপি না থাকাতে এই সকল দোষের উৎপত্তি হইয়াছে। গান বিস্মৃত হইলে, ওস্তাদেরা স্বেচ্ছামত তাহার উক্ত রূপ বিকৃতি ঘটাইয়া ফেলেন। অনেক ধ্রুপদের কেবল দুই তুক মাত্র পাওয়া যায়; তাহা বিস্মৃতি অথবা শিক্ষার ত্রুটির ফল। পাখোয়াজ যন্ত্রে যে সকল তাল বাদিত হয়, যথা,—চৌতাল, ধামার, সুরফাক,

ঝাঁপতাল, তেওট, আড়া, চৌতাল, রূপক, ঢিমাতেতালা, সওয়ারী, এই সকল তালেই ধ্রুপদ গাওয়া হয়। যে গানের প্রত্যেক তুক উক্ত কোন তালের চারি ফেরের ন্যূনে সম্পন্ন না হয়, তাহাকেই প্রকৃত ধ্রুপদ বলা হয়। ধ্রুপদ গানের কাঠিন্য এই যে, তাহার ছন্দ লম্বা জন্য অনেক দমের প্রয়োজন, এবং গানও বৃহৎ জন্য অনেক মুখস্থ করিতে হয়।*

ধ্রুপদের চারিটি বাণী অর্থাৎ রীতি প্রচলিত ছিল; যথা :—গওরহাড় বাণী, নওহাড় বাণী, ডাগর বাণী, ও খাণ্ডার বাণী। ইহারা হিন্দি শব্দ; ইহাদের অর্থ প্রকাশ নাই। কেহ কেহ বলেন, গৌড়ীয় হইতে গওরহাড় হইয়াছে। বোধ হয় চারিটি বিভিন্ন দেশ হইতে ঐ চারি বাণী সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। অধুনা ঐ চারি বাণীর বিভিন্ন প্রকার ধ্রুপদ প্রায়ই আর শুনা যায় না, উহারা এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন যে, এক্ষণে কেবল গওরহাড় বাণীর ধ্রুপদ প্রচলিত।

যাহাদের কেবল ধ্রুপদ গাওয়া অভ্যাস ও ব্যবসায়, হিন্দুস্থানে তাহাদিগকে 'কালাবঁৎ' কহে; ইহা "কলাবন্ত" শব্দের হিন্দী উচ্চারণ। সংগীতের সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যে ধ্রুপদ গান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য; অতএব উচ্চতম খাতিরের জন্য ধ্রুপদ গায়কদিগকে সংগীতবিৎ সমজ্‌দার (কনয়সিওর) লোকেরা কলাবন্ত উপাধি দিয়াছেন। অতি সুন্দর ও ন্যায্য উপাধি! জগদ্বিখ্যাত তানসেন ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। প্রয় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ দিল্লীশ্বর আকবর পাদসার রাজত্ব-

* কণ্ঠকৌমুদীতে ধ্রুপদের যে লক্ষণ লিখিত হইযাছে, তাহা অতিশয় অসঙ্গত। গ্রন্থকর্ত্তা শাস্ত্রকারদিগের উপর টেক্কা দিয়া বলিযাছেন যে "যে গীতে দেবতাদিগের লীলা রাজাদিগের যশ ও যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি থাকে তাহাকে ধ্রুপদ বলে।" যে সকল বিষয়ে গীতের পদ রচিত হয়, তাহাদের বিভিন্নতার উপর ধ্রুপদ, খেযাল, টপ্পা ইত্যাদির পার্থক্য নির্ভর করে না, স্বরোচ্চারণের রীতির বিভিন্নতাতেই উহাদের পার্থক্য হয়। যেমন দেবলীলা কিম্বা বীরকীর্ত্তি বিষয়ক গান ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা সকল রীতিতেই গাওযা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থে আরও দুইটী আশ্চর্য্য কথা লিখিত দৃষ্ট হয়, যথা,—ধ্রুপদ মৃদুকণ্ঠ স্ত্রী জাতির উপযোগী নহে," এবং উহা "দ্রুত লয়ে কখনই সুশ্রাব্য হয় না।" এই সংস্কার অদূরদর্শিতার ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হিন্দুস্থানে এখনও অনেক মৃদুকণ্ঠ বাই আছে, যাহারা উত্তম ধ্রুপদ গাইযা থাকে। মনে কর, যে সময়ে খেযাল টপ্পার সৃষ্টি হয় নাই, তখন সুশিক্ষিতা গায়িকারা ধ্রুপদ ভিন্ন আর কি গাইত? সাধারণতঃ লোকের এই সংস্কার যে, মোটা গম্ভীর গলা ভিন্ন ধ্রুপদ গাওয়া যাইতে পারে না। এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রমবিজৃম্ভিত। স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতাতে গানের ঢঙের বিভিন্নতা কখনই হয় না; এক গান অতি খাদ গলায় যে ঢঙে গাওয়া যায়, তাহা অতীব উচ্চ কণ্ঠেও সেই ঢঙে গীত হইয়া থাকে। ধ্রুপদ বিলম্বিত লযে যেমন সুমধুর, দ্রুত লয়েও ততোধিক। দ্রুত ও বিলম্বিত উভয় লয়ই ধ্রুপদের জীবন, একই গান উভয় লয়ে গাওয়াই ধ্রুপদের বিশেষ তাৎপর্য্য। ঝাঁপতাল, সুরফাঁক ও তেওরা তালের ধ্রুপদ কেবল দ্রুত লয়ে গাওয়াই প্রসিদ্ধ।

কালে তানসেন প্রাদুর্ভাব হন। তাঁহার গান-শক্তি যেমন ছিল, রচনা-শক্তিও ততোধিক ছিল। তিনি বিস্তর চমৎকার চমৎকার ধ্রুপদ রচনা করিয়া যান। কিন্তু স্বরলিপি অভাবে তাঁহার কৃত বার আনা ধ্রুপদ লোপ পাইয়াছে; এবং যাহা আছে, তাহাও সুরে এবং কথায়, উভয় বিষয়েই এত বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, তিনি যদি কবর হইতে উঠিয়া শুনেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজ কৃত গান বলিয়া তিনি কখনই চিনিতে পারিবেন না। তাঁহার কৃত আসল সম্পূর্ণ ধ্রুপদ এখন আর পাইবার উপায় নাই। শুনা যায়, তিনি হিন্দু সন্তান ছিলেন, পরে মুসলমান হন। তাঁহার সময়ে খেয়াল গানের আদর ছিল কি না, জানা যায় না। তাঁহার পূর্ব্বে নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওরা, এই দুই ব্যক্তি ধ্রুপদ গানে সমধিক যশস্বী হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঠানবংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে গোপাল নায়ক প্রাদুর্ভূত হন। তৎকালে তাঁহার সমান গায়ক কেহ ছিল না, এইজন্য তাঁহার নায়ক উপাধি হইয়াছিল। উক্ত আলাউদ্দীন পাদসার দরবারে আমীর খস্রু নামক এক জন সংগীত-নিপুণ ও অতি দক্ষ সুপণ্ডিত অমাত্য ছিলেন। শুনা যায়, নায়ক গোপাল তাঁহাকে সংগীতে পরাজয় করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতেই আমীর খস্রুর যত্নে মুসলমানদিগের মধ্যে হিন্দু সংগীত আলোচনার সূত্রপাত হয়। তানসেনের পর চুঁদি খাঁ, বকৃসু ও সুরদাস উত্তম উত্তম ধ্রুপদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাও ইদানীং কতক কতক প্রচলিত আছে। পঞ্জাব প্রদেশে ধ্রুপদ গানের চর্চ্চা অধিক। তথাকার সংগীতাধ্যাপক মৌলাদাদ ও অলিয়াস বহু ধ্রুপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাটনা বিভাগের অন্তর্গত বেতিয়ার মৃত মহারাজ নওলকিশোর সিংহ বাহাদুর অনেক শক্তিবিষয়ক হিন্দী ধ্রুপদ রচনা করিয়াছিলেন; তাহাও এক্ষণে অনেক স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

খেয়ালঃ—খেয়াল পারস্য শব্দ; ইহার অর্থ দুর্ব্বাসনা বা যথেচ্ছাচার। বোধ হয়, সংগীতেও ইহা ঐ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। পূর্ব্বে সভ্য সমাজে খেয়াল প্রচলিত ছিল না; ওস্তাদ গায়কেরা ধ্রুপদই গাইতেন। পরে যখন খেয়াল প্রথম প্রচলিত হয়, তখন তৎকালের ধ্রুপদ গায়কেরা বোধ হয় ব্যঙ্গ করিয়া ঐ রীতির গানকে গায়কদিগের "খেয়াল" অর্থাৎ যথেচ্ছাচার বলিতেন; তদবধি ঐ নাম হইয়া থাকিবে। খেয়ালের রচনা ধ্রুপদাপেক্ষা সংক্ষেপ; এইজন্য ইহার প্রত্যেক ভাগ তালের চারি ফেরের কমেও নিষ্পন্ন হয়; এবং ইহাতে দুই তুকের অধিক সচরাচর ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ ইহাতে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা। কখন কখন ইহাতে তিন চারি কলিও থাকে; কিন্তু তাহাদের সুর সবই অন্তরার ন্যায়। খেয়ালীয় সুরের কতকগুলি বাঙ্গালা গানে

ধ্রুপদের ন্যায় চারি তুক আছে অর্থাৎ চারি কলির বিভিন্ন প্রকার সুর। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি চুপি-গ্রাম নিবাসী মৃত দাওয়ান রঘুনাথ রায় (যিনি 'অকিঞ্চন' বলিয়া খ্যাত) খাস হিন্দুস্থানী খেয়াল সুরে বাঙ্গালায় ঐরূপ চারি তুকের অনেক শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করিয়াছিলেন। সে অতি অল্প দিনের কথা; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, স্বরলিপি অভাবে তাহাও এক্ষণে বিকৃত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; যাহা চলিত আছে, তাহাও বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার গাইয়া থাকে। তালের চারি ফেরে প্রত্যেক কলি সম্পন্ন হইলে, খেয়ালও বিস্তৃত হইয়া ধ্রুপদের রূপ ধারণ করে বটে, কিন্তু তালেই তাহার প্রভেদ হয়। কাওয়ালী, আড়া, মধ্যমান, একতালা, তেওট, ও যৎ, এই সকল তালে খেয়াল হয়। কিন্তু যে খেয়ালের আস্থায়ী ঐ সকল তালের চারি ফেরে নিষ্পন্ন হয়, তাহা ঢিমা করিয়া গাইলে ধ্রুপদ হইতে পৃথক করা দুষ্কর হইয়া পড়ে, কেননা ঐ সকল তালই ধ্রুপদে অতি শ্লথ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একতালা শ্লথ হইয়া ধ্রুপদে চৌতাল হইয়াছে; যৎ শ্লথ হইয়া ধ্রুপদে ধামার ও তেওরা হইয়াছে; তেওট শ্লথ হইয়া রূপক ও আড়া-চৌতাল হইয়াছে; কাওয়ালী শ্লথ হইয়া ধ্রুপদে ঢিমাতেতালা হইয়াছে, এইরূপই বলা যাউক অথবা চৌতাল দ্রুত হইয়া খেয়ালে একতালা হইয়াছে, ধামার দ্রুত হইয়া যৎ হইয়াছে, এইরূপই বা বলা যাউক; বস্তুতঃ উহাদের ছন্দে কোন প্রভেদ নাই। তালের পরিচ্ছেদে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ধ্রুপদের সুরফাঁক, তেওরা ও সওয়ারী তালের ন্যায় ছন্দ খেয়ালে ব্যবহার নাই; খেয়ালের আড়া ও মধ্যমান তালের ন্যায় ছন্দ ধ্রুপদে ব্যবহার নাই। ঝাঁপতালে খেয়াল ও ধ্রুপদ দুইই হয়। যাহা হউক, তালের ছন্দ বিষয়ে খেয়াল ও ধ্রুপদ একরূপ হইলেও খেয়ালে যে প্রকার ক্ষুদ্র তান গিট্‌কারী ব্যবহার হয়, ধ্রুপদে তাহা হয় না; এবং ধ্রুপদে যে প্রকার 'গমক' ব্যবহার হয় তাহা খেয়ালে হয় না; ইহাতেই উহাদের প্রকৃতির পরস্পর বিভিন্নতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে ধ্রুপদ ও খেয়ালে প্রভেদ নাই; কিন্তু কতকগুলি রাগিণী এমন আছে যাহারা ধ্রুপদে ও টপ্পায় ব্যবহার হইয়াছে, খেয়ালে হয় নাই; যেমন,—ভৈরবী, খাম্বাজ ও সিন্ধু। যত প্রকার হিন্দী খেয়াল শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সদারঙ্গ ও আধারঙ্গ কৃত খেয়ালই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অধিক প্রচলিত। খেয়াল ও ধ্রুপদ উভয়ই ঈশ্বর বিষয়ক গানের উপযোগী; পরন্তু ধ্রুপদের গতি প্রায়ই ধীর ও প্রকৃতি গম্ভীর জন্য, ইহাই উপাসনা কার্য্যে অধিক উপযোগী।

কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব তাঁহার কৃত হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সুলতান হোসেন শির্কী নামক জোয়ানপুরের এক অধীশ্বর খেয়ালের সৃষ্টি করেন

ইহা খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর কথা। কিন্তু খেয়াল কেহ যে নূতন সৃষ্টি করিয়া চালাইয়াছেন ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। খেয়ালীয় রীতির গান পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সভ্য সমাজে তাহার আদর ছিল না। উক্ত সুলতান হোসেন হয়ত ঐ রীতির গান পছন্দ করিতেন এবং খেয়াল গায়কদিগকে সমধিক উৎসাহ প্রদান করিতেন; তদবধি খেয়াল সভ্য সমাজে গাওয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। দিল্লীর ঐ দিকে "কাবাল" (কাওআল) নামে সঙ্গীত ব্যবসায়ী এক জাতি আছে, খেয়াল তাহাদের জাতীয় গান। ইহারা সর্ব্বদা যে তালে গান গায়, সেই তালের নাম কাওআলী রাখা হইয়াছে।

টপ্পা :—টপ্পা হিন্দী শব্দ—আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ; এই সংক্ষেপার্থে ইহা গানে ব্যবহার হইতেছে, অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক: আস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়; কেবল রাগিণীতে ইহা খেয়াল হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে। খেয়ালের রাগে টপ্পা রচিত হওয়ার প্রথা নাই। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, চৈতাগৌরী, কালাংড়া, দেশ ও সিন্ধু, এই কয়েকটিতে টপ্পা হয়। টপ্পা আধুনিক কালের উৎপন্ন; এবং ইহার প্রকৃতি সংক্ষেপ জন্ম কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু, বারোঁয়া, মাঝ, ইমনী ও লুম, এই কয়েকটি আধুনিক রাগ টপ্পায় ব্যবহার হয়। ইহাদেরও প্রকৃতি ক্ষুদ্র, ও বিস্তার অল্প। ফলতঃ পুরাতন হইলে ইহারাও ধ্রুপদীয় রাগের ন্যায় বর্দ্ধিতাঙ্গ হইবে, তাহার আশা করা যায়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে, ওস্তাদেরা পিলু, ঝিঁঝোটি ও বারোঁয়ার ধ্রুপদ রচনা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন; এইরূপ করিতে করিতে ইহাদের সঞ্চারী ও আভোগের উপযোগী অঙ্গ বাহির হইবে; তখন ইহারাও দীর্ঘ হইয়া, প্রাচীন রাগের তুল্য হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। প্রাচীন রাগ-রাগিণী সমূহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এইরূপেই বর্দ্ধিত হইয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার যে, আদি-রস বিষয়ক গানকেই টপ্পা বলে, কিন্তু সেটি ভ্রম; গানের এক পৃথক রীতির নাম টপ্পা, ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়। ফলতঃ উহার গতি দ্রুত ও প্রকৃতি হালকাবশতঃ উহা ঈশ্বর বিষয়ক গানের উপযোগী নহে। ইদানী ব্রহ্ম-গীত প্রায়ই টপ্পার সুরে রচিত হইতে দেখা যায়, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়। ইহা সংগীত তত্ত্বে অজ্ঞতা ও অনুন্নত রুচির ফল। সংগীতের প্রধান কার্য্য স্মৃতি-উদ্দীপনা; অতএব যে সুর শুনিলে অন্তঃকরণে মহৎ, উন্নত, প্রশান্ত ও বিরাট ভাবাদির উদয় হয়, তাহাই ভক্তি ও উপাসনার যথার্থ উপযোগী। টপ্পার সুরের যেরূপ প্রকৃতি, উহা হাস্য, আনন্দ, প্রণয়, তামাসা, উল্লাস প্রভৃতি লঘু ভাব উদ্দীপনা বিষয়ে

সম্যক উপযোগী, এবং ঐ সকল বিষয়েই উহা সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে; অতএব টপ্পার সুর শুনিলে মনে ঐ সকল ভাবের উদয় হওয়া ভিন্ন ভক্তির ভাব কখনই উদ্দীপিত হইতে পারে না।

কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, টপ্পা রীতির গান পাঞ্জাব দেশীয় উষ্ট্র-চালকদিগের জাতীয় সংগীত ছিল; প্রসিদ্ধ গায়ক শোরী* উহাকে অলঙ্কৃত করিয়া উন্নত করিয়াছেন। এই কথা সত্যও হইতে পারে, কারণ শোরীর টপ্পার মূল কথা সকল পাঞ্জাবী উপ-ভাষায় রচিত। পূর্ব্বে টপ্পার রীতির গান সভ্য সমাজে প্রচলিত ছিল না; শোরী (গোলামনবী) সুকৌশলযুক্ত সাধনা দ্বারা ঐ গানকে বিশেষ সুললিত ও কারিগরী বিশিষ্ট করিয়া, তদ্দ্বারা সভ্য ও ভদ্রলোকের চিত্তরঞ্জনে পারগ হইয়াছিলেন; তদবধি উহা সভ্য সমাজে আদরণীয় হইয়াছে। শোরীকৃত গানকেই ওস্তাদেরা টপ্পা বলেন; তদ্ভিন্ন অন্যান্য টপ্পাকে তাঁহারা ঠুংরী বলিয়া থাকেন। শোরীর টপ্পার ঢং পৃথক; সেই পার্থক্য তান, কম্পন, গিট্‌কারীর বিভিন্নতায় সম্পাদিত হয়। খাম্বাজ, লুম, ভৈরবী, সিন্ধু ও ঝিঁঝোটি, এই কয়েকটি রাগিণীতে, এবং মধ্যমান তালেই সচরাচর শোরীর টপ্পা শুনা যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইমন, কেদারা, কানড়া প্রভৃতি খেয়ালের রাগে টপ্পা হয় না কেন? তাহার কারণ এই যে, টপ্পার হাল্‌কা তান গিট্‌কারীর সহিত ঐ সকল রাগের গুরু প্রকৃতির সামঞ্জস্য হয় না; শোরী ঐ সকল রাগে টপ্পা গাইতেন না, তজ্জন্য উহাতে টপ্পার প্রণালী প্রচলিত হয় নাই। হিন্দুস্থানী ওস্তাদ গায়কদিগকে ইমন, কেদারা, মল্লার প্রভৃতিতে শোরীর টপ্পা গাইতে বলিলে, তাহা হয় না, কি জানি না, এ কথা বলেন না—কেননা তাঁহাদের জানি না বলা অভ্যাস নাই; তাঁহারা সংগীতে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, যাহা ফরমাইশ করা যাইবে, তাহাই তাঁহারা গাইতে প্রস্তুত; একান্ত না পারিলে ইয়াদ্ নাই বলিবেন। তাঁহাদিগকে উক্ত রাগে টপ্পা গাইতে বলিলে তাঁহারা শোরীর ব্যবহার্য তান গিট্‌কারী লাগাইয়া ঐ সকল রাগ গাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু, বেসুরা না হইলেও কেমন যেন খাপছাড়া বোধ হয়। ন্যায্য বিচার করিতে হইলে, ইহা যে আমাদের শুনার অভ্যাসের ফল, তাহাই প্রতীয়মান হয়। খাম্বাজের ধ্রুপদ হয়, খেয়াল হয় না; তাহারও

* সঙ্গীতসারের ৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, অযোধ্যা নিবাসী গোলামনবী নামক এক ব্যক্তি টপ্পা রচনা করিয়া তাঁহার অতি প্রিয়তমা প্রণয়িনী শোরীর নামে ভণিতা দিয়া গাইতেন, এইজন্যই "শোরী মিয়া" টপ্পা প্রণেতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন; বস্তুতঃ গোলামনবী তাঁহার আসল নাম, শোরী তাঁহার স্ত্রীর নাম। প্রায় ৭৬ বৎসর অতীত হইল গোলামনবী ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে লক্ষ্ণৌ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য—বেশ ব্যবহার নিবন্ধন গাওয়ার ও শুনার অনভ্যাস। খাম্বাজ, ভৈরবী ও সিন্ধু অতিশয় মিষ্ট জন্য, উহা সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে টপ্পায় ব্যবহার হওয়াতে, কাবাল অর্থাৎ খেয়াল গায়কেরা তাচ্ছিল্য প্রযুক্ত উহাদিগকে পরিত্যাগ করে; তদবধি ঐ সকল রাগিণীর গানকে খেয়াল বলার প্রথা উঠিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল রাগে খেয়াল না হওয়ার কোন কারণ নাই; খেয়ালের ঢং করিয়া গাইলেই হইতে পারে।

হিন্দুস্থানী গায়কদিগের মধ্যে পূর্ব্বে বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে এরূপ প্রথা ছিল যে, ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা, এই তিন জাতীয় গানের মধ্যে যাহার যে প্রকার গান গাওয়া পেশা ও অভ্যাস, সে তদ্ভিন্ন অপর জাতীয় গান গাইত না। যাঁহার ধ্রুপদ গাওয়াই পেশা, তিনি খেয়াল কি টপ্পা গাইতেন না; কারণ বাল্যাবধি কেবল ধ্রুপদ গাওয়াই অভ্যাস হওয়াতে, গলায় ধ্রুপদের মোটা ঢং এরূপ বসিয়া যায় যে, সে গলায় খেয়াল ও টপ্পার নিজ নিজ মিহি ঢং উচিত মত আদায় হয় না; তাহাতে খেয়াল কি টপ্পা, যাহা কিছু গাইতে যাইলে, সকলেতেই ধ্রুপদের ঢং আসিয়া পড়ে, যাঁহার কেবল খেয়াল গাওয়াই পেশা ও অভ্যাস, তাঁহার গলায় খেয়ালের ঢং এরূপবসিয়া যায় যে তিনি যাহাই গান, সবই খেয়ালের ন্যায় হয়। সেইরূপ যাঁহার বাল্যাবধি টপ্পা গাওয়াই অভ্যাস, তাঁহার খেয়াল ও ধ্রুপদ দস্তুর মোতাবেক আদায় হয় না। এইজন্য ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন জাতীয় গানের তিনটি ঢং পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খেয়াল গায়কেরা টপ্পার রাগিণী ব্যবহার না করাতে, উহাতে খেয়ালের ঢং বর্ত্তে নাই। যিনি অল্প বয়স হইতে ঐ তিন জাতীয় গান তিন ওস্তাদের নিকট হইতে সমান যত্ন সহকারে শিক্ষা করতঃ সাধনা করেন, এমন লোক ভিন্ন সকলের ঐ তিন প্রকার গান উচিত মত দখল হয় না। অধুনা অনেক গায়ককে ঐ তিন প্রকার গানই গাইতে শুনা যায় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন এক প্রকার গানই যথারীতি আদায় হইতে দেখা যায়; অন্য প্রকার গান তদ্রূপ উতরায় না। শাস্ত্রে বলে "একা বিদ্যা সুশিক্ষিতা", এক শরীরে সকল প্রকার উপার্জ্জন হওয়া দুঃসাধ্য, কারণ জীবন অল্প দিনের; কিন্তু বিদ্যার পার নাই। কি বঙ্গে, কি পাঞ্জাবে, কি হিন্দুস্থানে, কি রাজপুতানায়, সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, খেয়াল ও ধ্রুপদাপেক্ষা, টপ্পাই ভদ্র ইতর সর্ব্ব সাধারণের নিকট অধিক মনোরঞ্জক হয়। পরে ঠুংরীর বিবরণে, ও ১১শ পরিচ্ছেদে তাহার কতক কারণানুসন্ধান করা গিয়াছে। তদ্বিষয়ে এক পৃথক গ্রন্থ লিখিবার বাসনা আছে।

প্রবন্ধ:—যে গানের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে ভিন্ন ভিন্ন তাল ব্যবহার হয়, তাহাকে হিন্দুস্থানী ওস্তাদেরা প্রবন্ধ বলেন। উহার ঐ প্রকার অর্থ যে কি প্রকারে হইল, তাহা তাঁহারাই জানেন। ইহা ধ্রুপদ গানেই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

হোরী:—ইহা শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসবের গান, ধ্রুপদের রাগে ও কেবল ধামার তালেই গীত হয়; সুতরাং ইহা ধ্রুপদাঙ্গীয়। টপ্পার রাগিণীতে হোরী সচরাচর যৎ তালে গীত হইয়া থাকে।

তেলানা:—না দেরে দানি দীম তানা তোম তেলেনা, আলালিয়া লুম, এইরূপ কতকগুলি নিরর্থক শব্দ রাগ ও তাল যোগে গাওয়াকে 'তেলানা' বলে। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা, তিন রীতিতেই তেলানা গাওয়া হয়। তেলানার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নাই; গানের কথার অপ্রতুল বশতঃ নিরক্ষর ওস্তাদগণদ্বারা তেলানার চল হইয়াছে। গানে সদর্থ ও কবিত্বপূর্ণ বাক্যাবলি ব্যবহার না করিয়া নিরর্থক শব্দ প্রয়োগ করায়, রচনা শক্তির হীনতা, ও নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দেয়, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তেলানার এই এক অর্থ হইতে পারে যে, আনন্দে ও উল্লাসে বিহ্বল হইয়া যখন বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হয়, তৎকালে তেলানার ব্যবহার উপযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিবট:—ইহার তিনটি কলি; একটিতে গানের কথা, একটিতে তেলানা, আর একটিতে ধা ধা তেরেকেটে প্রভৃতি মৃদঙ্গাদি বাদ্যের বোল রাগ তালযোগে গীত হয়; অতএব ঐরূপ তিন অঙ্গ জন্য ত্রিবট কহা যায়। ইহা সচরাচর খেয়ালের রীতিতে গাওয়া হইয়া থাকে।

চতুরঙ্গ:—ইহার চারিটি কলি; উক্ত ত্রিবটের তিনটি এবং আর একটি কলিতে রাগের সার্‌গম থাকে। ইহাও সচরাচর খেয়ালেই গীত হয়।

গুল্‌নক্‌স:—ইহা পারস্য ও উর্দ্দূ ভাষার পদ্যে, খেয়ালের রাগে, এবং কেবল একতালাতেই গীত হইয়া থাকে; এবং ইহাতে সর্ব্বদা "গুল্‌" এই শব্দটি থাকার প্রথা দৃষ্ট হয়। পারস্য ভাষায় পুষ্পকে গুল বলে।

কওল্‌-কোল্‌বানা:—ইহাও একপ্রকার খেয়াল, ও ইহা আরব্য ভাষায় রচিত। ইহা এক্ষণে আর তত প্রচলিত নাই। অতএব ইহার বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয়েরও প্রয়োজন নাই।

সার্‌গম:- রাগের যে প্রকার স্বর-বিন্যাস থাকে, সেই বিন্যাসানুসারে সা রি গ ম প্রভৃতি স্বরের নাম সকল উচ্চারণ করতঃ তাল লয়ে গাওয়াকে সার্‌গম বলে। মৌখিক গান শিক্ষার প্রথা বশতঃ গায়কদিগের সম্যক স্বরজ্ঞান হইত না; সুতরাং শুদ্ধরূপে রাগাদির সার্‌গম গাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল, এইজন্য ওস্তাদদিগের মধ্যে সার্‌গম গাওয়ার গুমর ও তারিফ; নতুবা ভাষার যেমন বানান, গানের তেমনি সার্‌গম। স্বরলিপি দৃষ্টে গান শিক্ষার প্রথা প্রচারিত হইলে, সার্‌গম গাওয়ার আর প্রশংসা তত থাকিবে না।

রাগমালা : এক গানের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগের সমাবেশকে রাগমালা কহে। ইহা সকল প্রকার গানেই ব্যবহার হয়।

যুগলবন্দ : ইহা দুই ব্যক্তি ভিন্ন একজনে হয় না ; একজনে গান গাইবে, আর একজনে সেই গানের সারগম প্রথম ব্যক্তির সহিত সমান লয়ে গাইয়া যাইলে তাহাকে যুগলবন্দ বলে।

টপ্‌খেয়াল :—এমন এক জাতি গান আছে যাহাদিগকে টপ্পা কিম্বা খেয়াল বলিয়া সহসা চিনা যায় না ; অর্থাৎ টপ্পা ও খেয়াল, উভয় রীতি যোগে যে সকল গান গাওয়া হয়, তাহাকে টপ্‌খেয়াল কহে। বেহাগ, দেশ, পরজ, রামকেলী. গারা. সাহানা, প্রভৃতি কয়েক প্রকার রাগে টপ্‌খেয়াল সচরাচর শুনা যায়। যাহাদের টপ্পা গাওয়াই চিরকাল অভ্যাস, তাহারা ঐ সকল রাগের খেয়াল গান গাওয়া কালীন, তাহাতে অগত্যা টপ্পার ঢং যোগ করাতে টপ্‌খেয়ালের উদ্ভব হইয়াছে।

ঠুংরী : যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে, এবং আদ্ধা-কাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গীত হয়, তাহাকে ঠুংরী গান কহে। কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব, ঠুংরী নামক এক পৃথক রাগ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং সঙ্গীতসারের ৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, শোরী মিয়া ঠুংরী গানের সৃষ্টিকর্ত্তা। এইসব কথা কতদূর প্রামাণিক ও বিশ্বাস-যোগ্য, বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, হিন্দুস্থানে ঠুংরী নামে একজাতীয় গান প্রচলিত আছে ; তাহা নানাবিধ রাগে গীত হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ঠুংরী গানের অতিশয় আদর হয় ; এবং প্রসিদ্ধ শোরীও সেই দেশের লোক ; এইজন্যই অনেকের বিশ্বাস যে, শোরী, ঠুংরী রাগের না হউক, ঠুংরী গানপ্রণালীর উদ্ভাবক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; কারণ শোরী কৃত টপ্পা হইতে ঠুংরী গানের রীতি অনেক পৃথক। তবে অবস্থা দৃষ্টে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, শোরীর টপ্পা আরও সংক্ষেপ করিয়া লওয়াতে, তাহা হইতে ঠুংরী গানের উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের তয়ফাওয়ালী গায়িকারা ঠুংরী গান সর্ব্বদা গাইয়া থাকে, এইজন্য কালাবঁত ওস্তাদেরা ঠুংরী গানকে অতিশয় ঘৃণা করেন। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সংগীতবেত্তাদিগের এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করা উচিত যে, খেয়াল ধ্রুপদাপেক্ষা টপ্পা ও ঠুংরী গান সংগীতানভিজ্ঞ লোকেরও অধিক তৃপ্তিজনক হয় কেন? ঠুংরী গানের সুর পর্য্যালোচনা করিলে ইহার দুইটি সৌন্দর্য্য দেখা যায় :— একটি গাইবার রীতি, অপরটি সুরের বিচিত্রতা। স্ত্রী বা পুরুষ যে কণ্ঠেই উহারা গীত হউক, তাহা খেয়াল ধ্রুপদের কণ্ঠাপেক্ষা অনেক পৃথক এবং অতি সরল ও মোলায়েম ; এই জন্য খেয়াল ধ্রুপদোপযোগী কণ্ঠে ঠুংরী গাইয়া তত মিষ্ট করা যায় না। ঠুংরীর সুরে বিচিত্রতার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার কলেবর যেরূপ সংক্ষেপ, তাহার তুলনায় ইহাতে

বিচিত্রতা অধিক। সেই বিচিত্রতাকে চলিত কথায় "জঙ্‌লা" বলে, অর্থাৎ গানের একই কলিতে দুই তিন রাগের সংযোগ। এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে ঐ যোগ সম্পাদিত হয় যে, তজ্জন্য উহা অসঙ্গত শুনায় না; একখানি সুরের ন্যায়ই বোধ হয়। ইহাতে সচরাচর খাম্বাজের সহিত ভৈরবী, কিম্বা সিন্ধু, পিলু, লুম, অথবা বেহাগ, এই প্রকার রাগের সংযোগ দেখা যায়। ঐ ভৈরবীর অংশ এমন সকল স্থানে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে খাম্বাজের ঠাটেই ভৈরবীর কোমল ঠাট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন গানে এক রাগিণীতেই কোন নূতন কড়ি কোমল প্রয়োগ করতঃ খরজ পরিবর্ত্তন দ্বারা বিচিত্রতা সম্পাদন হয়; যেমন—সা-এর খরজে ভৈরবীর গান আরম্ভ করিয়া, স্থান বিশেষে কড়ি-ম লাগাইয়া, ম-এর খরজে পরিবর্ত্তিত হয়; তথায় কড়ি-ম ম-খরজে কোমল-রি হইয়া পড়ে; কোমল-রি ভৈরবীর এক প্রকার জীবন। ১৭ পরিচ্ছদে 'ষড়জ সংক্রমণ' বৃত্তান্তে এই প্রকার ঠুংরী গানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সংক্ষেপের মধ্যে এই প্রকার বিচিত্রতা নিষ্পন্ন হওয়াতেই, উহা সাধারণের মনোরঞ্জক হয়। সংগীতানভিজ্ঞ লোকে, উহার কোন্ স্থানে কোন্ রাগ লাগিতেছে, তাহা কখনই বুঝিতে পারে না, কিন্তু রাগান্তর ও খরজান্তর জন্য বিচিত্রতার ফল কোথা যাইবে! সে যাহাই হউক, খাম্বাজ গাইতে গাইতে ভৈরবী আসিয়া পড়িতেছে, ভৈরবীতে কড়ি-ম লাগিতেছে, এইরূপ প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া, রাগ-জ্ঞান-গর্ব্বিত ওস্তাদেরা ঠুংরী গায়ককে নিতান্ত অজ্ঞ ও বেল্লিক বলিয়া তিরস্কার করতঃ সেইস্থানই ত্যাগ করেন। কিন্তু গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূরে রাখিয়া, নিরপেক্ষ চিত্তে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, যুগযুগান্তরীণ চর্চ্চা প্রভাবে আধুনিক সংগীতক্ষেত্রে ক্রমোন্মেষ (ইভলিউশন) ক্রিয়ার ফলে এই অভিনব সুন্দর লতাটি আপনিই জন্মিয়াছে। ইহাকে যত্নের সহিত পালন করিলে, ক্রমে উন্নত ও পরিণত হইয়া শেষে ইহাতে সুখময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কা হয় এই যে, ইহার লোকরঞ্জকতা শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া কোন সময়ে বা ধ্রুপদ খেয়ালকে সিংহাসনচ্যুত করে। কিন্তু তাহা শীঘ্রই হইতেছে না, অতএব তজ্জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই।

ঠুংরী গানের কয়েক প্রকার ভেদ আছে, যথা—খেম্‌টা, কাহারবা, দাদ্‌রা, ইত্যাদি। খেম্‌টা, ভরৃতঙ্গা, কাহারবা প্রভৃতি তালে ঐ সকল গান গীত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই উহাদের ঐ প্রকার নাম হইয়াছে।

গজল্‌ :—গজল্ (*Gazl*) আরব্য শব্দ; অর্থ—প্রণয় বিষয়ক কবিতা। টপ্পার রাগিণীতে এবং কেবল পোস্তা তালেই গজল গীত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানে ইহা পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় রচিত হয়; ঐ গীত ভারতীয় ভাষায় রচিত হইলে, তাহার গজল সংজ্ঞা

হয় না; তাহাকে টপ্পাই বলা যায়। গজল মুসলমানদের জাতীয় গান, পারস্য হইতে ভারতে আনীত হইয়া,' এতদ্দেশীয় রাগ-রাগিণীতে সংযোজিত হইয়াছে। ইহার পদ্য প্রায়ই সুদীর্ঘ; এইজন্য ইহাতে দুই, তিন, চারি তুক পর্য্যন্ত থাকে। 'রেক্তা' ও 'রুবই' নামক পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় ঐ প্রকার রীতির যে গান, তাহাও অবিকল গজলের ন্যায়; কেবল উহাদের পদ্যের অর্থে যে কিছু বিভিন্নতা। রেক্তা আরব্য শব্দ; ইহার অর্থ কবিতা বা গীত।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার গান ব্যতীত কড্‌কা, দোহেলা, কজরী, লাউনী, চৈতী, জিগর, মক্তা, ডোমনা প্রভৃতি বহুতর গ্রাম্য গীত হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে; তাহা সভ্য সমাজে ব্যবহার হয় না। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে অনেক প্রকার গ্রাম্য গীত আছে, তাহার উল্লেখ হইল না কেন? তাহার কারণ এই যে, সভ্যসমাজে অব্যবহার্য্য গানের বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে উক্ত কয় প্রকার গানের নাম করার তাৎপর্য্য এই যে, কাপ্তেন উইলার্ড সাহেবের দেখাদেখি, অধুনা সংগীত গ্রন্থে ঐ সকল গ্রাম্য গীতের নাম উল্লেখ করা একটা ফ্যাশন (প্রথা) হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা 'সংগীতসার' ও 'সংগীত রত্নাকর'। ফল কথা এই যে, আমাদের সংগীত-গুরু ওস্তাদগণ হিন্দুস্থানের লোক, অতএব হিন্দুস্থানের সংগীত বিষয়ক তাবৎ সামগ্রী আমাদের শিরোধার্য্য করিতে হয়; বঙ্গ কি অন্য দেশীয় গান আমরা ঘৃণা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি। হিন্দুস্থানের ঐ সকল গ্রাম্য গীতের কথা না লিখিলে, হয়ত কোন সংগীত কুতূহলী পাঠক বলিবেন, এই গ্রন্থকার ঐ সকল গান জানেন না, অতএব সংগীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অল্প, সুতরাং পুস্তকও অকর্ম্মণ্য, এই ভয়ে ঐ সকল গীতের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

তান:—স্বর-বিন্যাসের অন্যতর নাম তান; তিন স্বরের কমে তান হয় না; বেশী যত ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু গানে যে তান দেওয়া হয়, তাহার ভিন্ন অর্থ: গাইবার সময় গানের স্বর-বিন্যাস ছাড়িয়া, আ কিম্বা এ ও বর্ণযোগে, রাগের ব্যবহার্য্য স্বরাবলির উপর দিয়া, গিটকারী সহকারে আরোহণ কিম্বা অবরোহণ করাকে; অথবা গানের কোন শব্দযোগে রাগের অপরাপর পরিচায়ক অংশগুলি প্রকাশ করাকে, তান দেওয়া বলে। খেয়াল ও টপ্পা গানেই তান দেওয়ার রীতি। ধ্রুপদে নহে। কেহ কেহ ধ্রুপদেও তান দিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক খেয়াল ও টপ্পা গান যেরূপ সংক্ষেপ, তান দ্বারা তাহাকে বিস্তার না করিলে অনেকক্ষণ গাওয়া যায় না। একটা গান কিছুক্ষণ না গাইলেই বা শ্রোতৃবর্গের কি প্রকারে তৃপ্তি সাধন হয়। ওস্তাদী গানে আস্থায়ীর মধ্যেই তান দেওয়ার রীতি; অন্তরাতে তত নহে। খেয়ালে তান দেওয়ার

দুই প্রকার রীতি দেখা যায়:—আস্থায়ী সম্পূর্ণরূপে গাইয়া তাহাতেই রাগের মূর্ত্তি প্রকাশ করার পর তান দেওয়া এক রীতি,—যেমন গোয়ালিয়ারের প্রসিদ্ধ খেয়ালী মৃত হর্দ্দু খাঁ গাইতেন; এবং গান ধরিয়া তানের সঙ্গে সঙ্গে আস্থায়ী সম্পন্ন করা আর এক রীতি,—যেমন সুবিখ্যাত খেয়ালী মৃত আহম্মদ্ খাঁ গাইতেন। "হলক্" তান নামে এক প্রকার তানের ঢং আছে, হর্দ্দু খাঁ সেইরূপ তান লইতেন; কিন্তু ইহা তত সুললিত নহে। আ আ করিয়া আরোহণ অবরোহণের সময় প্রতি আ-এর পর অন্তাস্থ য় ব্যবহার করিলে, যেমন—আয় আয়, এইরূপ শব্দ যোগে তানোচ্চারণ করিলে, অর্থাৎ তানের সময় জিহ্বা অনবরত ভিতর বাহির সঞ্চালন করিলে, হলক্ তান হয়। তানেই খেয়াল ও টপ্পার কাঠিন্য। সেই কাঠিন্য দুই প্রকার,—কণ্ঠ প্রস্তুত, ও রাগ জ্ঞান। এই দুইটী বিষয়ের জন্য প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ যত্নবান হইতে হয়। মার্জ্জিত কণ্ঠের যত কারিগরী তানেই প্রকাশ পায়। খেয়ালে কিম্বা টপ্পায় তান দেওয়া সম্বন্ধে গায়কের স্বাধীনতা থাকিলেও, রাগটী প্রথমে জমাইয়া এক এক বারে তালের এক ফের কিংবা দুই ফের পরিমাণে তান বিস্তার করিলেই অতি সুশ্রাব্য হয়; নতুবা তান ধরিয়া তালের বহু ফের অতিবাহিত করতঃ, সম হাতড়াইয়া তান শেষ করা অতি নিকৃষ্ট প্রথা, ও তাহাতে গানও তত সুললিত হয় না। খুচ্‌রা তানেই গায়কের নৈপুণ্য ও সদভ্যাসের পরিচয় হয়; ইহা প্রায়ই সম হইতে উত্থাপন করিয়া, তালের দুই এক এক ফের পর্য্যন্ত বিস্তারিয়া শেষে আস্থায়ীর মহাড়াটুকুর সহিত তান মিশাইয়া, প্রথম সমে শেষ করিতে হয়। দ্বিতীয়ভাগে গানের স্বরলিপিতে দুই একটী খেয়ালে ও টপ্পায় তান লিখিত হইয়াছে। সেতারাদি বাদ্য যন্ত্রের গতাদিতে যে খুচ্‌রা তান দেওয়া যায়, তাহাকে 'উপেজ'* কহে।

বাঁট:—ইহা ধ্রুপদ গানেই ব্যবহার হইয়া থাকে; ইহা বণ্ঠন শব্দের অপভ্রংশ। গানের স্বর-বিন্যাস ছাড়িয়া, রাগের অন্যান্য পরিচায়ক স্বর সহকারে গানের এক কলির তাবৎ কথাগুলি তালের প্রত্যেক মাত্রায় উচ্চারণ করাকে "বাঁট" কহে। বাঁট এক প্রকার তান বটে, কিন্তু সকল প্রকার তানকে বাঁট কহা যায় না। তানে ও বাঁটে অনেক প্রভেদ; বাঁটে গানের এক এক কলির তাবৎ কথা ব্যবহার হয়; তানে প্রায় তাহা হয় না। সচরাচর আস্থায়ীর কথা লইয়াই বাঁট করা হয়। দ্বিতীয়ভাগে গানের স্বরলিপিতে দুই একটী ধ্রুপদে বাঁট লিখিত হইয়াছে।

---

* ইহা সংস্কৃত উপ-জ শব্দের অপভ্রংশ, অর্থাৎ যাহা বাহির হইতে জন্মিয়াছে। 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার' গ্রন্থকর্ত্তা উপজকে যে পারস্য শব্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত ভ্রম। ঐ গ্রন্থের ১ম সংস্করণের ৬৯ পৃষ্ঠা, এবং ২য়ের ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বোল-বাণী :—হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা করিতে হইলে কিঞ্চিৎ হিন্দী ও উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা করতঃ, তত্তদ্ভাষার দুই একখানি পুস্তক পাঠ করা উচিত, নতুবা প্রকৃত হিন্দী উচ্চারণ সুসাধ্য হয় না। আর তাহা না হইলেও হিন্দী গান অতিশয় কদর্য্য শুনায়। ইদানী অনেক বাঙ্গালী হিন্দী গান গাইতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু বোল-বাণীর দোষে প্রায়ই তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা যায়। যে সকল বাঙ্গালী হিন্দুস্থান হইতে গান শিক্ষা করিয়া আইসেন, তাঁহাদের হিন্দী না পড়িলেও চলে; কেননা হিন্দুস্থানে কিছু দিন থাকিলে সর্ব্বদা তত্রত্য লোকদিগের সহিত কথোপকথনে উহাদের জাতীয় উচ্চারণ অভ্যস্ত হইয়া যায়। ইউরোপে ইতালীয় সংগীত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; এইহেতু ইউরোপস্থ সকল দেশের লোকেই সংগীতের জন্য কিঞ্চিৎ ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। সেইরূপ ভারতের ইতালী হিন্দুস্থান; অতএব হিন্দী ভাষার নিয়ম কিঞ্চিৎ অবগত না হইলে, হিন্দুস্থানী সংগীত কখনই সম্যগায়ত্ত হইবে না। সকল শিক্ষার্থীরই ঐ উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত। অধুনা অনেকেই নাগরী অক্ষর জানেন; তাঁহারা অনায়াসেই হিন্দী পুস্তক পড়িতে পারেন। কিন্তু প্রথমতঃ কোন হিন্দুস্থানী লোকের নিকট পাঠাভ্যাস করা উচিত। যাঁহাদের উর্দ্দূ অক্ষর অভ্যাস করা বিরক্তিকর হইবে, তাঁহারা রোমান্ অক্ষরে উর্দ্দূ ভাষার পুস্তক পড়িতে পারেন; তাহা অতি সহজ ও চমৎকার।

স্বর-সাধন :—দ্বিতীয়ভাগে সাধন প্রণালীতে নীচে স্বরের প্রত্যেক নাম হিন্দী উচ্চারণানুসারে আ-কার এ-কার দিয়া লিখিত হইয়াছে : যথা, সা রে গা মা, ইত্যাদি, সাধনার সময় উহা তদ্রূপই উচ্চারণ করিতে হইবে। বঙ্গ-ভাষায় অ কার যেরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাতে মুখ ও কণ্ঠ যথেষ্ট প্রসারিত না হওয়াতে, স্বরোচ্চারণ তত পরিষ্কার ও সুললিত হয় না। এইজন্যই, যাঁহারা হিন্দুস্থান হইতে হিন্দী গান উত্তমরূপ অভ্যাস করিয়া আইসেন, তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় গান হিন্দীর ন্যায় মিষ্ট হয় না। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বাঙ্গালার স্বর সকল বোজা; হিন্দীর স্বর সকল খোলা। বিশেষ, বাঙ্গালা ভাষায় লঘু গুরুর বিচার না থাকাতে, উহা অস্থি শূন্য হইয়া নিতান্ত নিস্তেজ ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে; এবং অন্যান্য অভাব প্রযুক্ত হিন্দীর ন্যায় বঙ্গ-ভাষার উচ্চারণে বিচিত্রতা নাই। এই হেতু উহা সংগীত কার্য্যে হিন্দীর ন্যায় বিচিত্রতা উৎপাদনে অক্ষম।

খেয়াল ও ধ্রুপদীয় সুরে, ঈশ্বর বিষয়ক ব্যতীত, অন্যান্য উত্তম বিষয়ক বাঙ্গালা গান নাই বলিলেই হয়; এই একটা আমাদের বৃহৎ অভাব রহিয়াছে। এইজন্য এতদিনেও খেয়াল ধ্রুপদ বাঙ্গালীর জাতীয় সংগীত হইতে পারে নাই। অতএব আমাদের বাঙ্গালী কবি ও বাঙ্গালী কালাবঁৎ, উভয়ে একত্র হইয়া ঐ সকল সুরে সর্ব্ব

ব্যবহার্য্য নানা বিষয়ে উত্তমোত্তম বাঙ্গালা গীত রচনা করা উচিত; তাহা হইলে ঐ সকল সুরের প্রতি সর্ব্বসাধারণের আস্থা ও প্রবৃত্তি হইয়া শীঘ্রই দেশময় বিশুদ্ধ সংগীত জ্ঞানের বিস্তার-নিবন্ধন জাতীয় সভ্যতার উন্নতি হইবে*। ইংলণ্ডে যেরূপ ইতালীয়, ফরাশীয় ও জার্ম্মনীয় গীত সকল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করতঃ, উহা জাতীয় গানের তুল্য করিয়া লইয়াছে, আমরাও সেইরূপ হিন্দী গীত সকল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া লইতে পারিলে শীঘ্রই কাষ সমাধা হইতে পারিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা হওয়া অসম্ভব। হিন্দুস্থানী সংগীত নিরক্ষর লোকের হস্তে পড়াতে, হিন্দী গীতের ভাবার্থ প্রায়ই লোপ পাইয়াছে; আরও, হিন্দী গীতের রচনা প্রায় নিকৃষ্ট; তাহাতে কবিত্ব অতি অল্প; এবং গীতের বর্ণিত বিষয় সকলও শিক্ষিত লোকের রুচির উপযোগী নহে। হিন্দী গান শিক্ষা করিতে ও শুনিতে যে লোকের নীরস বোধ হয়, তাহারও কারণ এই যে, কেবল সুরই শুনিতে ও শিক্ষা করিতে হয়, গানের কথার মজা কিছুই পাওয়া যায় না। সুরের জন্য কতকগুলা নিরর্থক শব্দ মুখস্থ করা সামান্য অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে। বিখ্যাত হিন্দী কবি তুলসীদাস কৃত যে সকল অতীব চমৎকার গীত আছে, কালাবঁতেরা তাহা 'ভজন' বলিয়া ব্যবহার করেন না; ভজন ভিখারী, বৈষ্ণবের গেয় বস্তু হওয়াতে, কালাবঁৎদিগের নিকট তাহা হেয় পদার্থ।

রাগ-রাগিণীযুক্ত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা বাঙ্গালীর জাতীয় গান নহে; উহা হিন্দুস্থানের আমদানী, সুতরাং উহা বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। এই হেতু বাঙ্গালী বহু পরিশ্রম করিয়াও একজন হিন্দুস্থানীর ন্যায় খেয়াল, ধ্রুপদ উৎরাইতে পারেন না। বঙ্গদেশের জাতীয় গান—কীর্ত্তন ও কবি; পাঁচালী কবিরই প্রকার ভেদ। বহুকাল হইতে অস্মদ্দেশে কীর্ত্তন ও কবির চর্চ্চা হইতেছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর যে সকল জাতীয়, গ্রাম্য সুর ছিল, তাহা লইয়াই প্রথম কীর্ত্তন ও কবির সৃষ্টি হয়। পরে ক্রমে বহু আলোচনা বশতঃ উহাতে বাহির হইতে নূতন নূতন সুর সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তন ও কবির সুর লইয়াই প্রথম যাত্রার সৃষ্টি হয়। হিন্দুস্থানে যাত্রা নাই; তথাকার রাসধারী যাত্রা এরূপ নহে। রাগ-রাগিণীযুক্ত ওস্তাদী গান শিক্ষার উপদেশার্থেই এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইতেছে, অতএব ইহাতে বঙ্গদেশীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

* দুঃখের বিষয় এই যে, এই স্থানে (কোচবিহারে) উত্তম কবি কেহ নাই, তাহা হইলে আমি ঐ প্রকার বহু বাঙ্গালা গান রচনা করাইয়া, তাহাতে খেয়াল ও ধ্রুপদাদি প্রস্তুত করিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতাম।

১১শ পরিচ্ছেদ ঃ— সঙ্গীতদ্বারা রসের উদ্দীপনা।

মানব কল্পনা সম্ভূত কোন সামগ্রীর যদি এরূপ গুণ থাকে যে তাহা দেখিলে, শুনিলে, কিম্বা পাঠ করিলে মনোবিকার উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে 'রস' কহে।* রসোদ্দীপনার মূল রহস্য স্বভাবানুকরণ, যাহা হইতে কাব্য, চিত্র, তক্ষণ (ভাস্কর্য্য) ও সঙ্গীত, এই চারি বিদ্যার উৎপত্তি। ইহাদের দ্বারা যে প্রকার রসের অবতারণা হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। এইজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ চারিটী বিদ্যাকে 'আলঙ্কারিক কলা' (ফাইন আর্টস), অথবা অনুকরণ কলা নাম দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই চারিটী বিদ্যারই সমান উদ্দেশ্য ; সেই উদ্দেশ্য স্বভাব বর্ণন। কথার দ্বারা স্বভাবের অনুকরণ করা কাব্যের কার্য্য ; রং দ্বারা স্বভাব অনুকরণ—চিত্রের কার্য্য ; গঠন ও আকৃতি দ্বারা স্বভাব অনুকরণ—তক্ষণের কার্য্য ; সেইরূপ স্বরের দ্বারা স্বভাব অনুকরণ করা সঙ্গীতের কার্য্য। কেবল মানব মনের ভাব ও আবেগ বর্ণনা করাই সঙ্গীতের এক মাত্র কার্য্য নহে ; বাহ্য জগতের সমুদয় শব্দময় কার্য্যই সংগীতের বর্ণনীয়।

মনুষ্যের প্রত্যেক মনোভাব ব্যক্ত করার বিভিন্ন স্বর আছে ; তাহা সামান্য বাক্যেও ব্যবহার হয় : যেমন শোকের স্বর এক প্রকার, আনন্দের স্বর আর এক প্রকার, ইত্যাদি। ক্রোধ, প্রেম, স্নেহ, উৎসাহ, ভয়, উল্লাস প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তবিকারের

* দ্বিতীয়বার মুদ্রিত 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার' ২০৩ পৃষ্ঠায় রসের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল ; কেননা তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, কাব্য অথবা সঙ্গীত শ্রবণে অন্তঃকরণে যে নিবিড় আনন্দোদয় হয়, তাহাকে 'রস' কহে। তবে কাব্য ও সঙ্গীত শ্রবণে যদি ভয় বা ক্রোধের উদয় হয়, তাহাকে কি রস বলা যাইবে না ? অবশ্যই যাইবে, চিত্তের যে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইলেই, তাহাকে রস বলা যাইবে। তৎপরে ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠায় আরও অসঙ্গত কথা লিখিত দৃষ্ট হয় ; যথা,—"নায়ক, নায়িকা, চন্দ্র, চন্দন, কোকিল-কূজিত, ভ্রমর ঝঙ্কারাদি কারণ সঞ্চালনে কাব্য রসের উদয় হয়, সঙ্গীত রস সেরূপ নহে, স্বর মূর্চ্ছনা তাল ও লয়াদিতে এই রস সম্ভূত হইয়া থাকে।" নায়ক-নায়িকা, চন্দ্র, চন্দন প্রভৃতি কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বটে, কিন্তু চন্দ্র, চন্দনের সহিত নায়িকা বর্ণনা থাকিলেই যে কাব্যে রসের আবির্ভাব হয় এমন নহে। এমন অনেক কাব্য আছে, যাহাতে নায়ক, নায়িকা, চন্দ্র, চন্দন, কোকিল-কূজন, বসন্ত সমীরণ প্রভৃতির ছড়াছড়ি, অথচ তাহাতে প্রকৃত রস মাত্র নাই। সেইরূপ স্বর, তাল, গমক প্রভৃতি লইয়াই সঙ্গীত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকলের বর্ত্তমানতাতেই যে সঙ্গীতে রসের উদয় হয়, তাহা নহে, যেমন— অনেক গায়কের গানে কিছুই রস থাকে না। এ বিষয় ক্রমে বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইতেছে।

সুর বিভিন্ন প্রকার। কবিরা কাব্যে যে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত, এই নয় প্রকার রস ব্যবহার করেন, তাহাদের প্রত্যেকের সুর আছে; কণ্ঠসঙ্গীতে সেই সুর উচ্চারিত হইয়া রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই কণ্ঠভঙ্গী কিরূপে হয়, তাহা প্রকাশ করাই সংগীতের কার্য। আমাদের একজন অতি প্রাজ্ঞ ও চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন যে, "যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে; যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না, কেননা সে স্বরভঙ্গী নাই। যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটী মাত্র সামান্য কথায় এত শোক, এত প্রেম, বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেননা সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সংগীত।"*

যে গানে শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ না হয়, তাহাকে বিশুদ্ধ সংগীত বলা যাইতে পারে না। অনেকেই গান করেন; এবং সে গানে রাগ, তাল, মান, গমক, সকলই ঠিক থাকে; তথাপি শ্রোতার ভাল লাগে না। সেই গানে অবশ্যই কিছুর অভাব আছে। সেই অভাব যে কি, তাহা না জানিয়া গায়ক শ্রোতারই দোষ দিয়া বলেন যে, তাহারা কিছুই বোঝে না। সেই অভাব রসহীনতা, ঐ গানে কোন রসের আবির্ভাব হয় নাই, সেই জন্য শ্রোতার ভাল লাগে নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক কি উপায়ে অর্থহীন অব্যক্ত সুর দ্বারা নানাবিধ রসের অবতারণা করা যায়। স্বরগ্রামস্থ স্বরাবলির সহিত মনের সম্বন্ধই উহার মূল। ঐ সম্বন্ধ না থাকিলে সারগম দ্বারা চিত্তবিকারাদি ব্যক্ত করা সম্ভব হইত না। যে সকল সুর কোন এক খরজের অনুগত, তাহাদিগকে "গ্রামিক" বলা যায়। সুর খরজানুগত না হইলে সে সুরের সহিত মনের সম্বন্ধ হয় না। সেই সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

* বঙ্গদর্শন ১ম খণ্ড, বৈশাখ, ১২৭৯ সন, পৃঃ ৩৪।

গ্রামিক স্বরের সহিত মনের সম্বন্ধ*।

৮ খরজ—সা।—অচল বা বিশ্রামদায়ক সুর।

(উচ্চ সম-প্রকৃতিক)

৭ নিখাদ—নি—তীক্ষ্ণ বা প্রদর্শক সুর।

৬ ধৈবত—ধ—কাঁদুনে বা শোকসূচক সুর।

৫ পঞ্চম—প—জমকাল বা পরিষ্কার সুর।

৪ মধ্যম—ম—নিরাশ বা ভয়সূচক সুর।

৩ গান্ধার—গ—ধীর বা শান্তিপ্রদ সুর।

২ রিখব—রি—আশ্বাস বা উৎসাহসূচক সুর।

১ খরজ—সা—অচল বা বিশ্রামদায়ক সুর।

সুর সমূহের ঐ সকল প্রকৃতি সা-এর সহিত উহাদের সম্পর্কের উপরই নির্ভর; অতএব প্রতিবারে সা-এর পর ধীরে ধীরে রি গ ম প্রভৃতি উচ্চারণ করিলে ঐ সকল ভাব মনে উদয় হয়। সুর সমূহের ঐ সকল প্রকৃতি ভাল করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক স্বর-সাধন করিলে ত্বরায় সুরজ্ঞান জন্মে। নি যে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ কড়া সুর, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে; উহাকে 'প্রদর্শক' বলার তাৎপর্য এই যে, উহা সর্ব্বদা সা-কে খুঁজিয়া বেড়ায় ও দেখায়; অর্থাৎ নি-এর পর স্বতঃই সা উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়, নতুবা আক্ষেপ থাকিয়া যায়। ¦ স : — | গ : ম | প :— | ন :— | এই তানটী গাইলেই ঐ সত্য উপলব্ধি হইবে।

* গ্রামিক স্বরের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ নিরূপণ করা তত সহজ কার্য্য নহে, তজ্জন্য সমূহ অভিনিবেশ, সুরুচি ও সতর্কতার প্রয়োজন। জ্যু দে বেয়ার্ণেভল, ডাক্তার কলুকট্, ডাক্তার ব্রাইস্, জন কার্‌বেন, প্রভৃতি ইউরোপের বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তাদিগের সিদ্ধান্তকৃত মতানুসারে এই সম্বন্ধ নিরূপণ করা হইয়াছে।

গ্রামিক স্বরের যে যে প্রকৃতি উপরে দেখান হইল, তাহা কেহ কেহ সহসা বিশ্বাস নাও করিতে পারেন; কারণ ভারতের আধুনিক সংগীতবিদ্‌গণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই স্বরের ঐ প্রকার রস-ব্যক্তি গুণের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থকারগণের অমনোযোগ ছিল না, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সংগীত-রত্নাকরের ষট্‌পঞ্চাশত্তম শ্লোকে* লিখিত আছে,—সা ও রি বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র রস ব্যঞ্জক; ধ বীভৎস ও ভয়ানক; গ ও নি করুণ; এবং ম ও প হাস্য ও শৃঙ্গার রস ব্যঞ্জক স্বর। পরন্তু ইহা পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত ঐক্য হয় না। সংগীত-রত্নাকর কর্ত্তা যেরূপ এক একটী স্বরের রস নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যুক্তি ও স্বভাব সঙ্গত নহে; কারণ দুই স্বরের কমে এক স্বরে কোন ভাব ব্যক্ত হয় না; সুতরাং অর্থও হয় না; অর্থ ব্যতীত রসের নিশ্চয়তা হইতে পারে না। এইজন্যই আমি 'গ্রামিক স্বর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ সা যে সকল স্বরের নিয়ন্তা। খরজের ঐ সম্পর্ক ব্যতীত অন্যান্য স্বর স্ব স্ব প্রধান; তাহারাও এক এক খরজের রূপ ধারণ করিতে পারে। যাহা হউক, প্রাচীন মতের সহিত আধুনিক মতের ঐক্য হয় না; কেননা সেকালের স্বর-গ্রাম আর এক প্রকার ছিল; আর, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থকারের মতও একরূপ নহে।†

স্বরের পূর্ব্ব প্রকাশিত মানসিক সম্বন্ধের প্রমাণ স্বরূপ কএকটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। | ম :— | ধ : ম | স১ :— | এই তানের শেষ স্বরটী কেমন উৎসাহ-জনক, আক্ষেপ রহিত, ও নির্ভীক। ঐ শেষ স্বরটীর ওজন ঠিক রাখিয়া, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরগুলি পরিবর্ত্তন করিলে ভিন্ন খরজের সম্পর্ক বশতঃ উহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়; যথা— | প :— | ন : র১ | স১:— | এক্ষণে এই শেষ সা স্বরটী কেমন আতঙ্ক ও ভয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছে।

উক্ত প্রথম উদাহরণে বাস্তবিক— | স :— | গ : স | প :— | ও দ্বিতীয়ে | স : | গ : প | ম :— | এই দুই তানই নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব খরজ ভেদে একই ওজনের স্বর একবার প, একবার ম হওয়াতে, তাহার সাংগীতিক প্রকৃতির,

* "স রী বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো বীভৎসে ভয়ানকে।
কার্য্যৌ গ-নী তু করুণে হাস্য শৃঙ্গারয়োর্ম পৌ॥"

† যথা—"স-মৌ হাস্যে চ শৃঙ্গারে স্বরৌ স্যাতাং তথা ধ-নী।
পো বীভৎসে তথা দৈন্যে ভয়ানক রসে ভবেৎ।
রসে শৃঙ্গারকে রিঃ স্যাদাগান্ধারো হাস্যকে পুনঃ॥" সঙ্গীত পারিজাত।

এবং মানসিক ফলেরও প্রভেদ হইতেছে। | সঃ— | গ ঃ স | ন১ ঃ স | র ঃ—এই তানে রি-এর উৎসাহদায়িনী প্রকৃতি বুঝা যাইবে। গ ঃ প | স১ ঃ— | নঃ— | ধ ঃ— তানে ধ-এর দুঃখ ও রোদন প্রকাশ পাইতেছে। | স. র ঃ গ. ম | প ঃ— | ম ঃ—প | গ ঃ —এই তানে গ-এর শান্তিদায়িনী প্রকৃতি সুন্দর প্রতীয়মান হইতেছে। গ্রামিক সুরের স্ব স্ব প্রকৃতি ঐরূপ।

আবার এক সুরের আশে পাশে ভিন্ন ভিন্ন সুর থাকিলে তাহার প্রকৃতির ব্যতিক্রম হয়, কেননা তাহাতে সুরের পরস্পর সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হয়; যেমন কোন একটী রং-এর চারিদিকে একবার এক রং দিলে এক অর্থ, আর এক রং দিলে অন্য অর্থ হয়; রং পরিবর্ত্তনে যেমন অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, সুরেরও তদ্রূপ। সুরের ওজনের ও রূপের তারতম্যে, দ্রুত উচ্চারণে, ও উচ্চারণ-ভঙ্গীর ইতর-বিশেষে সুরের প্রকৃতির ব্যতিক্রম হয় বটে, কিন্তু খরজের সম্পর্ক নিবন্ধন সুর সকল যে প্রকার মানসিক ফলোৎপাদনের ক্ষমতা ধারণ করে, তাহাই উপরে বিতর্কিত হইল।

সুর-শ্রেণীর আরোহণ গতি দ্বারা আবেগ ও উৎসাহের বৃদ্ধি প্রকাশ পায়, এবং অবরোহণ গতি দ্বারা তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। সামান্যত একটী সুর জমাইয়া, তাহা হইতে উচ্চে এক বা দুই পূর্ণান্তর ব্যবহিত সুরোচ্চারণে আনন্দ, উৎসাহ, তেজ, প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়। তাহা হইতে অর্দ্ধান্তর কিম্বা দেড় অন্তর ব্যবধানে সুর চড়িলে শোক, নিরাশা, দুর্ব্বলতা, প্রভৃতি ভাবের সমাবেশ হয়; ক্রন্দন ধ্বনিতে এবং হীনতাযুক্ত যাজ্ঞার স্বরে সচরাচর ঐ প্রকার সুরই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুর সকল প্রথমে সবলে উচ্চারণ করিয়া পরে মৃদু করিলে, উৎসাহাত্মক রসের আবির্ভাব হয়, এবং তদ্বিপরীত কার্যে অর্থাৎ মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমে বল প্রয়োগ করিলে, হতাশ, ক্ষুব্ধ, করুণ, প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পায়। সুর সকল আশ্ ও মিড় বিহীনে পৃথক পৃথক স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া গাইলে, উৎসাহ, তেজ, ও বীর ভাবাদির আবির্ভাব হয়; এবং তাহাদিগকে আশ্ ও মিড় যুক্ত করিয়া গাইলে তদ্বিপরীত রসের অর্থাৎ নিরাশা, দৌর্ব্বল্য, ও শোক-দুঃখাদি ভাবের উদয় হইয়া থাকে। সুর-কম্পন ও গিট্‌কারী শৃঙ্গার ও করুণ রস-ব্যঞ্জক, রোদনের সময় কণ্ঠ কম্পিত হইয়া গদগদ স্বর হয়, এবং ভয় পাইলেও স্বর কম্পিত হয়। কম্পন ও গিট্‌কারীযুক্ত সুর প্রেম জ্ঞাপনের উপযোগী, কেননা করুণার উদ্রেক ভিন্ন প্রেম উৎপন্ন হয় না। সুর সকল দীর্ঘান্তর ব্যবহিত হইয়া প্লব গতিতে উচ্চারিত হইলে, আনন্দ, উৎসাহাদি ভাবব্যঞ্জক হয়।

হিন্দু সঙ্গীতের ব্যবসায়ী ওস্তাদগণ প্রায়ই নিরক্ষর; সুতরাং গানের কথার ভাবার্থের প্রতি তাঁহাদের যথোচিত উপলব্ধি না থাকাতে, গীতের কবিত্বের প্রতি তাঁহাদের আস্থা

নাই; এবং সেইজন্ত কথার ভাবার্থানুসারে যথাযোগ্য রসের অবতারণা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুধাবনও নাই। বস্তুতঃ এই বিষয় সম্যক্ প্রণিধান করিতে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও রুচির প্রয়োজন। রাগ-রাগিণী ও তাল লয় বিশুদ্ধ হইল কিনা, কেবল সেই বিষয়ে ওস্তাদেরা অধিক মনোযোগী হওয়াতে, হিন্দুস্থানী গানের ভাবার্থ লোপ পাইয়াছে; ইহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। এই হেতু ওস্তাদী গানে যথা-রস-সঙ্গত করিয়া গান করার রীতি উঠিয়া গিয়াছে। ইহা যে যথেষ্ট আক্ষেপের বিষয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে? যেখানে যে রসের প্রয়োজন, তাহার অবতারণ পূর্ব্বক শ্রোতার মনে সেইরূপ ভাবোদ্দীপনের চেষ্টা না পাইয়া, ওস্তাদগণ সর্ব্বদা দুঃসাধ্য কর্ত্তবপূর্ণ গলাবাজী দ্বারাই লোকের মনাকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা যায়, ও অভীপ্সিত ফল লাভও হয় না। সমজদার লোক ব্যতীত অপর সাধারণে যে কালাবঁতী গানের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে, তাহারও মূল কারণ ঐ। বাস্তবিক সংগীতালোচনার এই কুরীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহা যে আমাদের জাতীয় নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। শ্রোতৃবর্গের রুচি উন্নত হইলে, ব্যবসায়ী ওস্তাদেরাও তদনুসারিণী শিক্ষা ও সাধনা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। অতএব যাহাতে ঐ রুচির উৎকর্ষবিধান হয়, তজ্জন্য আমাদের কৃতবিদ্য ভদ্র সমাজের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। বিশুদ্ধ সঙ্গীত-জ্ঞানাভাবে লোকের সঙ্গীত বিষয়ে কুসংস্কার অনেক; এবং সেইজন্য সঙ্গীত ব্যবসায়ী ওস্তাদেরাও যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন।

অনেকের এরূপ সংস্কার যে, যে সঙ্গীত শ্রবণে নিদ্রাবেশ হয়, তাহাই তাঁহাদের মতে উৎকৃষ্ট; ইহা এক মহা ভ্রান্তি। বিচিত্রতাহীন একঘেয়ে সঙ্গীত শুনিলেই নিদ্রা আইসে। যে সঙ্গীতে ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন কর্ত্তব ও তান ও তৎসহিত নূতন নূতন রসের আবির্ভাব হয়, তাহা শুনিলে তন্দ্রাভিভূত অথবা নির্জীব ব্যক্তিও জাগ্রত ও সজীব হয়। তাম্বুরা ও সেতার বাদ্য পাঁচ সাত মিনিট শুনিলে, অনেকের, বিশেষতঃ বালকদিগের, নিদ্রা আইসে, ইহা প্রায়ই দেখা গিয়াছে; তাহার কারণ একঘেয়ে শব্দ। তাম্বুরার বাদ্য একঘেয়ে, সকলেই জানেন; সেতারের নায়কী তার ব্যতীত অন্যান্য তার একঘেয়ে রূপে ধ্বনিত হয়। রাত্রে শয়ন সময়ে সোঁ সোঁ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে, শীঘ্রই নিদ্রা আইসে; কোন সুরে 'আয় আয়' করিয়া শিশুগণকে নিদ্রাভিভূত করা হয়; এ সমস্তেরই কারণ একঘেয়ে শব্দ। একঘেয়ে শব্দ শুনিতে শুনিতে স্বভাব বিরক্ত হইয়া যায়, এবং সেই হেতু স্নায়ু সকল শীঘ্রই ক্লান্ত হওয়াতে নিদ্রা উপস্থিত হয়।

কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করাই সঙ্গীতবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত

নহে। সঙ্গীত দ্বারা যাহাতে মানসিক সুখ সম্পাদিত হয়, তাহাই করা উচিত। চিত্তবিকার ঘটাইয়া, মনের আবেগ উচ্ছলিত করতঃ শ্রোতাকে মুগ্ধ করাই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার। স্বর-বিন্যাস দ্বারা চিত্তবিকারাদি বর্ণনা করা কঠিন কার্য্য হইলেও, উহাই সংগীতের ন্যায্য ব্যবহার। আমাদের জাতীয় পছন্দ ও রুচির হীনাবস্থা জন্য, সকল বিষয়েরই সমান দুর্দ্দশা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যিনি সাহিত্য রচনা করিবেন, তিনি আপাদমস্তক অনুপ্রাসবিশিষ্ট কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ বড় বড় সমাসে যোজনা করিয়া লিখিবেন; চিত্রকর ছবিতে রক্ত, পীত, নীল, হরিৎ প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণ সকল ব্যবহার করিয়া নয়ন ঝলসাইবেন; যিনি মুল্যবান পরিচ্ছদ পরিবেন, তিনি এক থান কিংখাপই গায়ে জড়াইবেন; ঘৃত ও মসলা ব্যতীত ব্যঞ্জন উপাদেয় হয় না, অতএব সখের ব্যঞ্জনে এত ঘৃত ও মসলা দেওয়া হইবে যে, এক জনের খাদ্য পাঁচ জনেও খাইয়া ফুরাইতে পারিবে না। আমাদের সংগীতেও সেইরূপ। 'ক্লেঙ্কার', কম্পন, মিড়, গিট্‌কারী এই সকল সংগীতের অলঙ্কার; অতএব গায়ক গানের আপাদমস্তক ঐ সকল অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া, নিজের সাধনার ও কর্ত্তৃত্বশক্তির আতিশয্য দেখান। অধুনা লেখাপড়ার উন্নতির সহিত অনেক বিষয়ে লোকের রুচি সুপথে নীত হইতেছে। কিন্তু সংগীত বিষয়ে এখনও লোকের সুরুচির উদয় হয় নাই; ইহার কারণ কৃতবিদ্য লোকদিগের মধ্যে সংগীত চর্চ্চার অভাব।

অস্মদ্দেশীয় কোন কোন সংগীতবিৎ লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, রাগ-রাগিণীদ্বারা মানবীয় চিত্ত-বিকার সকল যথোচিতরূপে বর্ণিত হয়। এই সংস্কারে, সম্পূর্ণ না হউক, কতক ভ্রান্তি লক্ষিত হয়; কেননা অধুনা রাগ-রাগিণীগণ যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সকল প্রকার রসোদ্দীপনা শক্তি লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন সংগীত-গ্রন্থকারগণ কৃতবিদ্য পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, কাব্যে যেরূপ রসের অবতারণা প্রয়োজন, সংগীতেও তদ্রূপ; এইজন্য তাঁহারা গানের স্বর-বিন্যাস সমূহের নাম 'রাগ' রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মনের আবেগ ব্যক্ত হয়; এবং তাঁহারা এক এক রাগ এক এক রসে গাওয়ারও নিয়ম করিয়াছিলেন। কিন্তু সুর সকল কি প্রকারে বিন্যস্ত হইলে কি অর্থ হয়—কি রস হয়, অগ্রে তাহার মীমাংসা না করিয়া এমনিই রাগের রস নিরূপণ করাতে, তাঁহাদের মতও পরস্পর ঐক্য হয় নাই। যেমন—'নারদ সংহিতায়' বেলাবলীকে বীররস-ব্যঞ্জক বলিয়া বর্ণিত আছে; কিন্তু 'সংগীত-দামোদরে' উহাকে করুণ রসের অন্তর্গত করা হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাচীন মত সকলের ঐক্যানৈক্যে অধুনা আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ রাগ-রাগিণীদের প্রাচীন মূর্ত্তি এক্ষণে আর নাই। যেমন—আধুনিক কালের ভৈরবী করুণ রসের রাগিণী; কিন্তু পুরাকালে উহার

যে মূর্ত্তি ছিল, তদনুসারে উহা তখন হাস্যরসের উপযোগী ছিল *। অধুনা ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা প্রভৃতি গান যে রীতিতে গাওয়ার প্রথা হইয়াছে, তাহাতে তাবৎ রাগই শৃঙ্গার ও করুণ রস-ব্যঞ্জক হইয়াছে। আমাদের সকল গানেই আক্ষেপ ও করুণার উদ্দীপন হয় এবং গায়কদিগের চেষ্টাও তাই। বস্তুত আধুনিক ভারত সংগীত আধুনিক ভারতীয় লোকদিগের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ। অনেক চিন্তাশীল বহুদর্শী লোকে বলেন যে, কোন্ দেশীয় লোকের জাতীয় প্রকৃতি কিরূপ তাহা তাহাদের সংগীতেই জানা যায়। ইহা অতি সারবান ও যথার্থ কথা। হিন্দু জাতির অধঃপতনাবধি তাহাদের সে উৎসাহ নাই, সে তেজ নাই; সুতরাং আধুনিক হিন্দু সংগীতও তেজ-হীন ও উৎসাহহীন হইয়া গিয়াছে। বহুকাল হইতে বিদেশীয় রাজপুরুষ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা প্রপীড়ন জন্য হিন্দুদিগের জাতীয় স্ফূর্ত্তি না থাকাতে, তাহাদের করুণ রসোদ্দীপক সংগীতই অধিক ভাল লাগে। মুসলমান নবাব বাদসারা যদিও হিন্দু সংগীতের যথেষ্ট চর্চ্চা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের বিলাসপ্রিয়তার আধিক্যে সংগীতও সেই প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। আর এক কথা এই যে, মুসলমানদিগের প্রধান উৎসবাদি শোক-মূলক হওয়াতে, তাহাদেরও শোকোদ্দীপক সংগীতের অধিক প্রয়োজন। এই সকল নানা কারণে হিন্দু সংগীতে অন্যান্য রসাপেক্ষা করুণ রসের প্রাধান্যই অধিক।

'সংগীতসার' কর্ত্তা ঐ গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় নট্, সিন্ধুড়া, মাবোয়া, শঙ্করা, প্রভৃতি কয়েকটী রাগকে বীর-রসাশ্রিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বীর-রসের প্রকৃতি একরূপ, ঐ সকল রাগের প্রকৃতি আর একরূপ। ঐ সকল রাগের কি তেজস্বিতা আছে, যে তদ্দ্বারা বীরত্বের অনুকরণ হইবে? উহারাও যথেষ্ট করুণ ভাবাপন্ন। গোস্বামী মহাশয় নট্ ও সিন্ধুড়ার গানে হয়ত যুদ্ধাদি বর্ণনা পাইয়াছেন, এবং প্রাচীন কবিরা নটের ধ্যানে ইহাকে সাংগ্রামিক মূর্ত্তি দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি উহাদিগকে বীর-রসের রাগ মনে করিয়াছেন। পুরাকালে নট্, শঙ্করা, প্রভৃতির বীর মূর্ত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। উহাদিগকে বীর-রসোদ্দীপক করিতে হইলে, উহাদের প্রচলিত মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গোস্বামী মহাশয় ভৈরব, কল্যাণ, সাহানা, প্রভৃতিকে হাস্যরসের রাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাও কার্য্যত ঠিক নহে। বিবাহাদি শুভ কার্য্যে সাহানা, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ ব্যবহৃত হওয়া দেশ-প্রথা মাত্র; নতুবা আনন্দ, হাস্য, কৌতুক, প্রভৃতির মূর্ত্তি স্বতন্ত্র; তাহা ঐ সকল রাগের আধুনিক প্রচলিত মূর্ত্তিতে পরিব্যক্ত হয় না।

---

* "ধানসী মালসী চৈব ভৈরবী মাধবী তথা।
আনন্দাংশ ইতি প্রোক্তা গীয়ন্তে গানকোবিদৈঃ॥" সঙ্গীত-দামোদর।

আমাদের দেশে নাট্য-সংগীত (*Dramatic Music*) নাই। যেমন কাব্যের চরমোৎকর্ষ নাটক, তেমনি সংগীতের চরমোৎকর্ষ নাট্য-সংগীত। হিন্দুস্থানে নাটকাভিনয়, কি যাত্রা নাই; সেইজন্য নাট্য-সংগীতের উৎপত্তি হয় নাই। ইহা নাটকাদি অভিনয়ে, ও যাত্রায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। অধুনা অস্মদ্দেশে ঐ সকল কার্য্যে যে প্রকার সংগীত ব্যবহার হইতেছে, তাহা নাট্য-সংগীত নহে; সে সবই বৈঠকী সংগীত। নাট্য-সংগীত অতি কঠিন ব্যাপার; ইহাতে স্বরের ও স্বভাবের সমীচীন অনুধাবন, ও সমূহ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। মানব মনের সমুদয় আবেগ ও বাহ্য জগতের যে সকল শব্দময়ী ঘটনার সহিত মানবীয় কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে, তৎসমুদয় স্বরে প্রকাশ পূর্ব্বক, শ্রোতার মনে ভ্রান্তি উৎপাদন করা নাট্য-সংগীতের কার্য্য। ইউরোপে বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যে নাট্য-সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; পূর্ব্বে তত ছিল না। তথায় 'অপেরা' নামক অভিনয়ে যে প্রণালীর সংগীত ব্যবহৃত হয়, তাহাই প্রকৃত নাট্য-সংগীত। বাঙ্গালায় অপেরার "গীতিনাট্য" নাম দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু অপেরার ন্যায় সাংগীতিক রচনা-কৌশল এখনও আমাদের সংগীতবেত্তাদিগের খবরে আইসে নাই। কেমন করিয়া আসিবে? শিক্ষাশূন্য নিরক্ষর গায়ক ও ওস্তাদদিগের নিকট নাট্য-সংগীত প্রত্যাশা করা যায় না। আমাদের যাত্রায় যখন যে রসের প্রয়োজন হইতেছে, তাহা গানের কথা দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে, স্বরে সে সকল রস যথোচিত রূপে বর্ণিত হইতেছে না, সেইজন্য যাত্রা ও গীতিনাট্যাদি সম্যক্ ফলোপধায়ক হয় না। পূর্ব্বে কেবল গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় কতক নাট্য-সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত; সেইজন্য তাহা সর্ব্বসাধারণের তৃপ্তিকর হইয়াছিল।

স্বর-রচকগণ গানের সুর বসাইবার সময় তাহার ভাবার্থের প্রতি কখনও মনোযোগ করেন না; এবং রাগ-রাগিণীর অবলম্বন ভিন্ন গীতে সুর বসাইবার প্রথা না থাকাতে, প্রায়ই গানে প্রয়োজনীয় রসের যথোচিত বিকাশ হয় না। পূর্ব্বকাল হইতে এত প্রকার রাগ-রাগিণীর উদ্ভব হইয়াছে যে, অনুসন্ধান দ্বারা তাহাদের মধ্যে যাবতীয় মনোভাব প্রকাশক স্বর-বিন্যাস পাওয়া যাইতে পারে, এ কথা কত দূর সম্ভব বলা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি? নূতন রচনা করার সময় পুরাতন স্বর-বিন্যাস যে রাগ-রাগিণী, তাহা অবলম্বন না করিলে দোষ হয়, ইহা কুসংস্কার ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিৎ কালাবঁৎগণের এই সংস্কার বদ্ধমূল যে, রাগ-রাগিণী—পুরাতন স্বর-বিন্যাস—ব্যতীত সঙ্গীত উত্তম হইতে পারে না; সেইজন্যই ওস্তাদী সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী ছাড়া নূতনতর স্বর-যোজনা করার প্রথা নাই। আসল কথা এই যে, কালাবঁতী সংগীতরচয়িতাগণের মধ্যে তেমন প্রতিভাসম্পন্ন স্বর-কবি কেহ

অস্মান নাই, যিনি রাগ-রাগিণী ব্যতীত রস-ভাবপূর্ণ নূতনতর স্বর যোজনা করিতে পারেন। প্রসিদ্ধ তানসেনও সেরূপ স্বর-কবি ছিলেন না, কারণ তিনি মিশ্রণ ব্যতীত নূতন স্বর-বিন্যাস রচনা করেন নাই।

কুসংস্কার এবং গোঁড়ামী যেমন সকল বিষয়েই উন্নতির পরম শত্রু, সঙ্গীতেও ততোধিক। উন্নতি প্রতিরোধক কুসংস্কার নিবন্ধন সঙ্গীত-নিপুণ লোকদিগের নূতন স্বর রচনার প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। ক্ষমতার উদয় হইলে আপনা হইতে উক্ত অযুক্ত প্রথা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশাপেক্ষা হিন্দুস্থানে ঐ সকল কুসংস্কার আরও প্রবল। বঙ্গদেশে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সঙ্গীত বিষয়েও লোকের স্বাধীনতা থাকাতে, এতদ্দেশে অনেক প্রকার নূতন সুরের ও তালের উদ্ভব হইয়াছে। কীর্ত্তন তাহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। ইদানী হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রবিষ্ট হইয়া সেই স্বাধীনতা ক্রমে দূর করিতেছে। এটি যে অমঙ্গলের বিষয়, তাহা কালাবঁৎগণ কখনই স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিক সেই জন্যই নাট্যাভিনয়ে ও যাত্রায় সঙ্গীতের ব্যাপার ক্রমেই অতীব শোচনীয় ও জঘন্য হইয়া উঠিতেছে। এরূপও অনেকে তর্ক করেন যে, আমাদের এতপ্রকার ছিল ও এখনও আছে যে, যে কোন নূতন স্বর-বিন্যাস বলিবে তাহা কোন না কোন এক রাগের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যায়। ইহা নিতান্তই অত্যুক্তি। বঙ্গদেশে এমন অনেক সুর আছে যাহাতে রাগ-রাগিণীর কোন গন্ধ নাই। পৃথিবী এত পুরাতন হইয়াছে যে, নূতন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা একদল তার্কিকের মত বটে। কিন্তু প্রত্যেক নূতন রচনার সময়েই কি লোকে পুরাতন রচনার নকল করে? যাহার ক্ষমতা থাকে, সে নূতন সৃষ্টি অক্লেশে করে। কিন্তু সে ক্ষমতা সকলের হয় না; এইজন্যই নূতন রচনার এত প্রশংসা। পূর্ব্বে রাগ-রাগিণীর বিবরণে বলিয়াছি যে, প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য রাগ প্রচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহার সিকিমাত্র প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহ; অতএব এখন নূতন রচনা করার প্রশস্ত ক্ষেত্র হইয়াছে।

এক রাগে একটি গানের সমগ্র রস প্রকাশিত হইতে পারে না; কারণ অনেক স্থলে একটী কলির মধ্যেই বিবিধ ভাবের সমাবেশ হয়, তাহা একাধিক রাগ ব্যতীত উচিত মত পরিব্যক্ত হইতে পারে না। কিন্তু, কালাবঁৎ সঙ্গীতবেত্তারা এক কলির মধ্যে বহু রাগের সংযোগ নিতান্ত দূষ্য মনে করেন; সেই জন্য তাঁহারা তাহার নাম জঙ্‌লা রাখিয়াছেন, অর্থাৎ খাঁটি নয়। স্বরলিপির অভাবে লোকে বিশুদ্ধরূপে গান শিক্ষা করিতে না পাওয়াতেই, গানের আদ্যোপান্তে রাগ বিশুদ্ধ রাখাই সঙ্গীত চর্চ্চার পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সাধারণে স্বরলিপি যথেষ্ট ব্যবহার করিতে শিখিলে, রাগ বিশুদ্ধ রাখার

কাঠিন্য দূর হইয়া তাহাতে আর প্রশংসা থাকিবে না, তখন অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ের প্রশংসা হইয়া উঠিবে ; যথা—স্বভাব বর্ণন, ও রসের অবতারণ।

এতদ্দেশে প্রকৃত নাট্য-সঙ্গীতের ব্যবহার আরম্ভ হইলেই রাগ-রাগিণীর তত বাঁধা-বাঁধি থাকিবে না, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু তাহা শীঘ্র হইতেছে না, কেননা উহা সঙ্গীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সাপেক্ষ। অধুনা বঙ্গদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা রাগ-রাগিণীর চর্চা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলে রাগ-রাগিণীর রহস্য একবার বিশেষরূপ অবগত না হইলে, সঙ্গীতের উন্নতি আরম্ভ হইবে না। যাহা হউক, সঙ্গীতের উন্নতি হওয়া দূরের কথা, আমাদের যাহা আছে তাহাই অগ্রে লোকে শিক্ষা করিয়া লউক। অতএব গান শিক্ষার্থীর প্রতি এই উপদেশ যে তিনি ওস্তাদদিগের গলাবাজিতে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহারই অনুকরণে সমস্ত অধ্যবসায় ব্যয় না করেন। গলাবাজি যে একেবারে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে, তাহারও উপযুক্ত স্থান আছে ; সেই স্থান চিনিয়া তথায় প্রয়োগ করিতে হইবে। গলাবাজিও গানের রস-ভাবের উপর নির্ভর করে ; অতএব গান রচক ও গায়ক, উভয়ের প্রতি এই উপদেশ যে, গানের ভাবার্থানুসারে রসের অবতারণার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগী হওয়া উচিত এবং রাগ নির্ব্বাচন করিয়া, গীতে যোজনা করা উচিত। কিন্তু হিন্দি গানে উহা উপযুক্ত মত হওয়া দুষ্কর হইবে, কেননা হিন্দী গানের অর্থ সংঘটন প্রায়ই হয় না। আর তাহা হইলেই বা কি ? হিন্দী ভিন্ন ভাষা ; বাঙ্গালীর তাহা কখনই স্বাভাবিক হইবে না আমাদের দেশীয় ভাষায় কতকগুলি সদর্থযুক্ত ও উত্তম কবিত্ব পূর্ণ গান আছে, তাহা যথা-রস-সঙ্গত করিয়া গাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ অনুশীলনের মধ্যে ওস্তাদী গোঁড়ামী এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, বাঙ্গালা গান রাগ-রাগিণীবিশিষ্ট হইলেও, হিন্দুস্থানী লোকের ত কথাই নাই, বাঙ্গালী সংগীতবেত্তাদিগের নিকটও হেয় পদার্থ। ফলতঃ ক্রমে যে ঐ কুসংস্কার দূর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

হিন্দুস্থানী ওস্তাদেরা যথারসানুসারে গান গাওয়া দূরে থাক, তাঁহারা কথা সকলও পরিষ্কার ও বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করেন না। কোন শব্দের উচ্চারণ দোষ ধরিয়া দিলেও তাঁহারা এরূপ তর্ক করেন যে, ঐ ভুল উচ্চারণ ব্যতীত স্বরের লজ্জৎ হয় না। এই প্রকার কত অসঙ্গত তর্ক যে তাঁহারা করেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গানের কথা সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিতে যদি শ্রোতাকে সুবিধা ও সাবকাশ না দেওয়া হয়, তবে গান গাওয়ারই বা ফল কি ? কেবল সুস্বর শুনাইতে হইলে, যন্ত্র বাজাইলেই ত হইতে পারে। কিন্তু যন্ত্র-সংগীতে যে ফলোৎপন্ন হয়, কণ্ঠ-সংগীতে তাহার বহু গুণ অধিক হওয়া উচিত। যাত্রার বালকেরা সুস্পষ্টরূপে

গানের কথা উচ্চারণ করিতে শিক্ষিত হয় না ; ইহাতে সর্ব্বদাই এই কুফল হয় যে, বক্তারা উপযুক্ত মত অভিনয় করিয়া যে রসের উদ্দীপনা করে, বালকেরা তদ্বিষয়ক গান জঘন্য রূপে গাইয়া সব মাটি করিয়া দেয়। স্পষ্ট করিয়া যথারসানুসারে গান গাওয়া কি:বালকের সাধ্য ? উত্তম অভিনয়ের পর যদি গানটিও তদুপযুক্ত হয়, অন্ততঃ গানের কথাও যদি লোকে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে উহা অতি পাষাণ-হৃদয় লোকেরও নয়ন হইতে অশ্রুবারি টানিয়া বাহির করে। প্রাচীনেরা সংগীতের যে সকল দৈব শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অযুক্ত নহে। উত্তম কবিত্ব পূর্ণ কথা সমূহ যদি যথারসানুযায়িক স্বর-বিন্যাস যুক্ত হইয়া সুললিত মধুর কণ্ঠে গীত হয়, তাহাতে ঐন্দ্রজালিকী শক্তি অবশ্যই বর্ত্তে ; ইহা কে সন্দেহ করিবে ?

গায়কের কণ্ঠ-কৌশল, ও বুদ্ধি-বিবেচনার ইতরবিশেষে গানের ফলের তারতম্য হয়। সুগায়কের মার্জ্জিত কণ্ঠ ও কর্ণের যেরূপ প্রয়োজন, তেমনি তাহার সদন্তঃকরণ ও ভাবগ্রাহিতারও প্রয়োজন ; এবং তাহার এরূপ সহৃদয়তা ও সহানুভূতি থাকা উচিত যে, হাসিলে হাসে, কাঁদিলে কাঁদে। ইংরাজী সুলেখক কার্‌লাইল প্রসিদ্ধ জার্ম্মানীয় কবি এবং দার্শনিক গেটীর বিষয়ে বলেন যে, 'তিনি তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া দর্শন করেন।' সেইরূপ, যথার্থ শ্রেষ্ঠ গায়ক আমরা তাঁহাকেই বলি, যিনি তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া কেবল যে দেখেন, তাহা নহে, অনুভবও করেন। অধুনা ঐ প্রকার গায়ক কয়টা অস্মদ্দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

১২শ পরিচ্ছেদ ঃ—হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র।

হিন্দু সংগীতের অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে ; যথা,—সংগীত-নির্ণয়, সংগীত-দর্পণ, সংগীত-দামোদর, সংগীত-রত্নাকর, সংগীত-পারিজাত, সংগীত-রত্নাবলী, রাগবিবোধ, রাগসর্ব্বস্বসার, রাগার্ণব, নারদসংহিতা, ধ্বনিমঞ্জরী, ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থ প্রায়ই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে ; দুই একখানি মাত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে কি আছে না আছে, তাহা কুতুহলী সাধারণের জানিবার সুবিধা নাই।

এ পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রন্থের যে কিছু মর্ম্ম অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, প্রাচীন কালের সংগীত এখনকার সংগীত হইতে ভিন্ন ছিল ; যুক্তিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ পৃথিবীর সকল বিষয়ই পরিবর্ত্তনশীল, এবং তৎসহিত, অনেকের মতে, উন্নতিশীল। কি ভাষা কি লিখা পড়া, কি আচার ব্যবহার, সকলই কালে

পরিবর্ত্তিত হয়, এবং ক্রমে উন্নতির দিকে নীত হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তন সকলেই স্বীকার করেন ; কিন্তু অনেকে উন্নতি স্বীকার করেন না। প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তনে ও অপভ্রংশে আধুনিক ভাষা সমূহের উৎপত্তি ; সেই অপভ্রষ্টতা কি উন্নতি ? তদুত্তরে এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, মনের ভাব ব্যক্ত করাই যখন ভাষার প্রয়োজন ও মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যাহাতে সহজে ও সংক্ষেপে সেই কার্য্য সমাধা হয়, তাহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। মনে কর, 'কাঠ কাটি', এই বাক্যটী সহজ ; না 'কাষ্ঠম্ কর্ত্তয়ামি'—এই বাক্যটী সহজ ? 'কাঠ কাটি' যে অনেক সহজ ও সংক্ষেপ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা এই প্রকার সহজ ও সংক্ষেপ হওয়াকেই স্থান বিশেষে উন্নতি বলা যায় ; কেননা উন্নতি আপেক্ষিক শব্দ। যাহা হউক, এক্ষণে এ গুরুতর বিষয়ের তর্কে ক্ষান্ত দেওয়া যাউক। সংগীতও যে প্রাচীন কালাপেক্ষা ক্রমে উন্নত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই *। ঐ উন্নতি পরিবর্ত্তন মূলক ; সেই পরিবর্ত্তনের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

কেহ কেহ ইচ্ছা করেন এবং চেষ্টারও ভাণ করেন যে, প্রাচীন কালে সংগীত যেরূপ ছিল, এক্ষণে সেইরূপ হয়। কিন্তু ইহা যে অসম্ভব, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। বাঙ্গালা ভাষাপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা অনেক উৎকৃষ্ট, এবং সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালা ভাষা তুলিয়া দিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত করা যেমন অসম্ভব ব্যাপার, আধুনিক সংগীতের পরিবর্ত্তে প্রাচীন সংগীত প্রচলিত করাও তদ্রূপ অসম্ভব। প্রাচীনকালে সংগীত যে কি প্রকার ছিল, তাহা আমাদের বিশেষ করিয়া জানিবারও উপায় নাই। পূর্ব্বে যে সকল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুগণ কি প্রণালীতে গান বাদ্য ও কর্ত্তব করিতেন, তাহার কিছুই নাই ; অর্থাৎ প্রকৃত স্বরলিপি অভাবে প্রাচীনকালের গান কি গত্ কোন গ্রন্থেই নাই। ঐ সকল গ্রন্থ কেবল সঙ্গীতের উপপত্তিতেই পরিপূর্ণ, এবং সেই সকল

* "কথিত আছে যে বৈদিক গান হইতেই লৌকিক গান নির্ম্মিত ; তাহা সম্ভব বটে। আদিম কালের ত্রৈস্বর্য্য গান উন্নত হইয়াই ক্রমে উনবিংশ স্বর হইয়াছে,—(শুদ্ধ স্বর ৭, বিকৃত ১২)। • • • • পর পর উৎকর্ষ সাধনই হইয়া থাকে।

"ত্রৈস্বর্য্য গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সেই সপ্ত স্বরেই গান হইত। কুশীলব যখন রাম সভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত স্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কি না সন্দেহ।

"কৌশল এক হইলেও আদিম মানব হৃদয়ে তাহার সর্বাংশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে।"

(শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় কৃত 'ঐতিহাসিক রহস্য', ৩য় ভাগ।)

উপপত্তির কার্যিক উপযোগিতাও সম্যক্ বুঝা যায় না; কারণ "খলির ভিতর হাতি পূরার" ন্যায় সমস্ত বিষয় ছন্দের অনুরোধে এমন সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার যথার্থ মর্ম্মোদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, এবং অর্থ সংগ্রহ হইলেও প্রয়োজনীয় আসল কথা অতি অল্পই পাওয়া যায় †।

এক্ষণে যে সকল সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহারা যে সংগীত শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ, তাহা নহে। যে কালে সংগীত শাস্ত্র প্রথম প্রস্তুত হইয়া গ্রন্থীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময়ে শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি সংগীতের উপপত্তি ও পরিভাষা প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার বহুকাল পরে উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ লিখিত হইয়াছে; কারণ ঐ সকল গ্রন্থে সর্ব্বদাই এইরূপ কথা সকল পাওয়া যায়, যথা,—"ভরতেন উক্তম্," "কথিতাঃ কবীন্দ্রৈঃ", "কথিতাঃ পূর্ব্ব সূরিভিঃ", "নির্ণীতো গান কোবিদৈঃ", "প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ", ইত্যাদি। অতএব মধ্য কালে যে ঐ সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভরত, নারদ ও হনুমান, ইঁহারাই আদি শাস্ত্রকার ও মত সংস্থাতা; তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহাদেরই বিলুপ্ত ও অসম্পূর্ণ মতাবলম্বনে মধ্য কালের পণ্ডিতগণ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাই আমরা পাইতেছি। আদি শাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থ সবই লোপ পাইয়াছে, তাহার একখানিও নাই। বর্ত্তমান সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থ সকলকে সংগীতের শাস্ত্র এবং তাহাদের প্রণেতা মধ্য কালীয় লেখকদিগকে শাস্ত্রকার, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না। ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের বিশেষ ভ্রম। অতএব শাস্ত্রকার ও গ্রন্থকার অনেক ভিন্ন কথা। গ্রন্থকারগণ, বোধ হয়, আদি শাস্ত্রকারদিগের স্থাপিত উপপত্তি সকল সম্যক্ না বুঝিয়া, এবং তাহা কর্ত্তবের সহিত ঐক্য না করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে উহা বর্ণনা করিয়াছেন; তজ্জন্য ঐ সকল উপপত্তি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; এবং সেই কারণে তাঁহাদের বর্ণনাতেও পরস্পর ঐক্য নাই। পুর্ব্বকালের লেখকগণ পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, বিদ্যুত, প্রভৃতি তাবৎ বিষয়েরই যেরূপ পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, সংগীতের সংস্কৃত গ্রন্থকারগণও সমস্ত বিষয়ের সেইরূপ পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন; তজ্জন্য সকল বিষয়ের

† পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন মহোদয়ের ন্যায় চিন্তাশীল ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তিই এরূপ বলিয়াছেন,—"কোন কোন গ্রন্থ রাগাদির রূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ, অন্য সার কথা কিছুই নাই, এবং কোনখানি বা অলঙ্কার গ্রন্থের ছায়া মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীত-দামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যাবতীয় গুহ্য কথা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু গ্রন্থ পাঠে এককালে হতাশ হইলাম। এখানিও এক প্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। • • • • এদিকে আড়ম্বর অনেক কিন্তু কাজে কিছুই নহে।"

('ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র.' ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ) ৮

যথার্থ ও বিশুদ্ধ তাৎপর্য্য গ্রন্থকারগণের রূপক বর্ণনার আড়ম্বর হইতে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য।

কেহ কেহ যে বলেন সংগীতের চারি প্রকার মত প্রচলিত,—ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হনুমন্ত মত ও কল্লিনাথ মত, ইহার কোন অর্থ নাই। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহার কৃত কোন সংগীত মত থাকা পৌরাণিক কথা মাত্র। 'সঙ্গীতসারের' অনুক্রমণিকাতে লিখিত হইয়াছে যে, নারদ কৃত পঞ্চমসার-সংহিতার মতে ব্রহ্মার পাঁচ শিষ্য,—ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তুম্বুরু। ভরত যখন ব্রহ্মার শিষ্য, তখন ব্রহ্মার মত হ'তে ভরতের মত বিভিন্ন হয় কিসে? সেকালেও কি গুরু মারা বিদ্যা ছিল? অতএব ব্রহ্মার মতটী কৃত্রিম জাল মত। প্রথমে ভরত, তৎপরে হনুমান, ইঁহারাই আদি শাস্ত্র কারক। আদি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে ইঁহাদের মতে পরস্পর অনৈক্য দৃষ্ট হয় না।

মধ্যকালের কোন সংগীত-গ্রন্থকার আদি রাগ-রাগিণীর এক নূতন মত উদ্ভাবন পূর্ব্বক, তাহা ব্রহ্মাকৃত মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মার রচিত কোন মত ছিল না। কল্লিনাথ 'সঙ্গীত-রত্নাকরের' টীকাকার,—আধুনিক লোক ও সংগ্রহকার মাত্র; তাঁহাকে সঙ্গীতের মত সংস্থাতা বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রন্থকারকেই এক এক মত সংস্থাতা বলিতে হয়। 'তোফৎ-উল-হিন্দ্' প্রণেতা মির্জাখাঁই * প্রথমে লিখিয়া যান যে, সঙ্গীতের উক্ত চারি মত প্রচলিত; তাঁহারই দেখাদেখি সকলে ঐ চারি মতের কথা বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভরত মত ও হনুমন্ত মত, সঙ্গীতের এই দুইটী মতই আসল। ভরত বাল্মীকির সহসময়ী; তিনি যেমন নাটকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তেমনি সঙ্গীত শাস্ত্রও রচনা করিয়াছিলেন। পবননন্দন রামসেবক যে 'হনুমান', তিনিই এই সঙ্গীত শাস্ত্র প্রণেতা কি না, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। কেহ কেহ এই সঙ্গীতকার হনুমানকে আঞ্জনেয় বলিয়াও ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ হনুমান নামক এক ব্যক্তি যে অতি পণ্ডিত ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই; কেননা তাঁহার কৃত অন্যান্য গ্রন্থও ছিল, শুনা যায়। হনুমন্মতের আদি সঙ্গীত গ্রন্থ যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি ভরত মতের গ্রন্থও পাওয়া যায় না। 'সঙ্গীতসার' প্রণেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কোন কোন আদি রাগ-রাগিণীর আধুনিক ঠাটের সহিত হনুমন্মতানুযায়িক ঠাটের অনৈক্য দেখিয়া মনে করিয়াছেন যে, হনুমন্ত মত এখন কোথাও প্রচলিত নাই। কিন্তু রাগ-রাগিণীর ঠাট কালক্রমে যে কতই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা তিনি প্রণিধান করেন নাই; এইজন্য তাঁহার মীমাংসা

* ইনি ঐ গ্রন্থে সঙ্গীত দর্পণ, রাগার্ণব প্রভৃতি সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থাদির মতানুসারে হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব পারস্য ভাষায় লিখিয়াছিলেন।

যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। প্রসিদ্ধ সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ তাৎকালিক জীবিত সঙ্গীতবেত্তা-দিগের ও বিবিধ সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের মতানুসারে রাগ-রাগিণী বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি হনুমন্ত-মতানুযায়িক আদি ছয় রাগ ও পাঁচ পাঁচ রাগিণীর বৃত্তান্তই বর্ণনা করেন। ইহাতে হনুমন্ত মত প্রচলিত থাকা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থকারগণ সঙ্গীতের বিষয় সকল কি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

সকল গ্রন্থকারই বলিয়াছেন যে, সঙ্গীত দুই প্রকার *:—মার্গ ও দেশী। মার্গ সঙ্গীত দেবলোকে, এবং দেশী সঙ্গীত মর্ত্ত্যলোকে প্রচলিত। ঐ দেশী সঙ্গীতই সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেই জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে সঙ্গীত কিরূপ ছিল, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থকারগণও জানিতেন না। তাঁহারা গীত, বাদ্য ও নৃত্য, এই তিনকেই সঙ্গীত বলিয়া † তাহার 'তৌর্য্যত্রিক' নাম দিয়াছেন; এবং ধাতু—অর্থাৎ স্বর ও মাত্রা সংযোগে যাহা কিছু নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই গীত বলিয়াছেন ‡। সেই গীত দুই প্রকার—যন্ত্র-গীত, যাহা বেণু বীণাদিতে উৎপন্ন হয়; এবং গাত্র-গীত, যাহা মুখ হইতে উৎপন্ন হয়।

সপ্তস্বর :—উক্ত গ্রন্থকারদিগের বর্ণনা মতে সঙ্গীতের সাত স্বর সাতটী ইতর প্রাণীর স্বর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; যথা,—ষড়্জ—ময়ূর হইতে, ঋষভ—বৃষ হইতে, গান্ধার—ছাগ হইতে, মধ্যম—বক হইতে, পঞ্চম—কোকিল হইতে, ধৈবত—অশ্ব হইতে, এবং নিষাধ—হস্তী হইতে। এই বর্ণনা যে কেবলই কল্পনা-মূলক, তাহা সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেই স্বীকার করেন। চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েরই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সঙ্গীতের সাত স্বর মনুষ্য কোথায় পাইল? প্রাচীনকালে বিজ্ঞানালোক অভাবে ঐ প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানেই কল্পনা-দেবী উক্ত বিবরণের জন্ম

* "মার্গদেশী বিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতং।
মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং।
তত্র দেশতয়ারীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জকং॥" সঙ্গীত-দর্পণ।

† গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রিভিঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।"

‡ "ধাতুমাত্রা সমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তত্র নাদাত্মকো ধাতুর্মাত্রা চাক্ষর সম্ভবঃ॥
গীতঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং যন্ত্রগাত্র-বিভাগতঃ।
যন্ত্রং স্যাদ্বেণুবীণাদি গাত্রন্তু মুখজং মতং॥" সঙ্গীত-শাস্ত্র।

দিয়াছেন। এইজন্য ইহাতেও গ্রন্থকারদিগের নানাপ্রকার মত দৃষ্ট হয় *। মনুষ্যের সকল বিদ্যাই যে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা সম্ভূত, ইহা প্রাচীন কালের লোকেরা বিশ্বাস করিতেন না।

সাতটী স্বরের নামের মধ্যে ষড়্জ, ঋষভ, মধ্যম ও পঞ্চম, এই কয়েকটী নামের অর্থ বুঝা যায়। কেহ কেহ ষড়্জের অর্থ এরূপ করিয়াছেন,—"ষট্ জায়ন্তে যস্মাৎ", অর্থাৎ যাহা হইতে ছয়টী জন্মিয়াছে, তাহার নাম ষড়্জ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, নাসা, কর্ণ, মূর্দ্ধা, তালু, জিহ্বা ও দন্ত, এই ছয় স্থান স্পর্শ করত উৎপন্ন হেতু ষড়্জ নাম হইয়াছে †। বস্তুত উক্ত প্রথম ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। ঋষভ অর্থে বৃষ যাহার রব হইতে উহা গৃহীত হইয়াছে। মধ্যম অর্থাৎ মধ্য স্থানীয়—উপরেও তিন স্বর নীচেও তিন স্বর। পঞ্চম—পঞ্চম স্থানীয়। বাকী তিনটি নাম—গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ, ইহাদের প্রকৃত অর্থ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহারা কৃত্রিম সংজ্ঞা মাত্র, ইহাই বোধ হয়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকার ইহাদের এক এক আশ্চর্য্য অর্থ করিয়াছেন। সংগীত-দামোদর কর্ত্তা বলিয়াছেন যে, নাভি হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া, এবং তাহা কণ্ঠে ও মস্তকে আহত হইয়া যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এবং যাহা নানা গন্ধযুক্ত ও পবিত্র, তাহার নাম গান্ধার ‡। কোন স্বরের ভাল, কি অধিক গন্ধ, কোন স্বরের মন্দ গন্ধ, কি গন্ধ নাই, ইহা একালের লোকের বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু বাস্তবিক স্বরের গন্ধ থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আরও নিম্ন স্থান হইতে বায়ু উঠিয়া কণ্ঠে ও মস্তকে আহত হইয়া, কেবল গান্ধার কেন, সকল স্বরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব স্বরের নামের ব্যাখ্যাতে গ্রন্থকারদিগের ঐ প্রকার অদ্ভুত কল্পনারই পরিচয় পাওয়া যায়, আসল বিষয় কিছুই নাই।

গ্রন্থকারগণ সকলেই কবি; তাঁহারা সংগীতের সকল বিষয়ই কবি-কল্পনার অন্তর্গত করিয়া, কেবল স্ব স্ব ক্যাবিক বর্ণনা-চাতুর্য্যই দেখাইয়াছেন। মনুষ্যের ন্যায় স্বরেরাও

* "ময়ূর-বৃষভচ্ছাগ ক্রৌঞ্চ কোকিল-বাজিনঃ।
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেনাহ স্ববানেতান্ সুদুর্গমান্।" সঙ্গীত-দামোদর।
"ময়ূর-চাতক-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দুরাঃ।
গজশ্চ সপ্ত ষড়্জাদীন্ ক্রমাদুচ্চারযন্ত্যমী॥ সঙ্গীত-রত্নাকর।

† "নাসাং কণ্ঠ-মুরস্তালুং জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংস্পৃশন্।
ষড়্ভ্যঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতিস্মৃতঃ॥" সংগীতসার-সংগ্রহ।

‡ "বায়ুঃ সমুদ্গতোনাভেঃ কণ্ঠ শীর্ষ সমাহতঃ।
নানা গন্ধবহঃ পুণ্যো গান্ধারস্তেন হেতুনা॥" সঙ্গীত-দামোদর।

বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ; বিভিন্ন দেবোপাসক; বিভিন্ন স্থান নিবাসী; ও স্ত্রী পুত্রাদি বিশিষ্ট। ষড়্জাদি সপ্ত স্বরেরা পুরুষ, দ্বাবিংশতি শ্রুতি উহাদের স্ত্রী; এবং ছয় রাগ উহাদের পুত্র। শুদ্ধ স্বর আর্য্যজাতি; বিকৃত অর্থাৎ স্থানচ্যুত কড়ি-কোমল স্বর অর্দ্ধস্বর হেতু শূদ্র জাতি ও পতিত *। উহা কি প্রকার, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:—

স্বর।	জন্ম-ভূমি।	জাতি	বর্ণ।	ইষ্টদেবতা।	স্ত্রী	পুত্র।
ষড়্জ ...	জম্বুদ্বীপ ...	ব্রাহ্মণ ...	কৃষ্ণ ...	অগ্নি ...	৪ শ্রুতি	ভৈরব
ঋষভ ...	শাকদ্বীপ ...	ক্ষত্রিয ...	কপিঞ্জর	ব্রহ্মা ...	৩ শ্রুতি	মালকোশ
গান্ধার ...	কুশদ্বীপ ...	বৈশ্য ...	কনকাভ	সরস্বতী ...	২ শ্রুতি	হিন্দোল
মধ্যম ...	ক্রৌঞ্চদ্বীপ ...	ব্রাহ্মণ ..	শুভ্র ...	মহাদেব ...	৪ শ্রুতি	দীপক
পঞ্চম ...	শাল্মলীদ্বীপ ..	ব্রাহ্মণ ...	পীত ...	লক্ষ্মী ...	৪ শ্রুতি	মেঘ
ধৈবত ...	শ্বেতদ্বীপ ...	ক্ষত্রিয ...	ধূসর ...	গণেশ ...	৩ শ্রুতি	শ্রী
নিষাদ ...	পুষ্করদ্বীপ ...	বৈশ্য ...	হরিৎ ...	সূর্য্য ...	২ শ্রুতি	নিঃসন্তান

উক্ত বিষয় গুলির মধ্যে কেবল শ্রুতিরই কিছুই কার্য্যিক ব্যবহার ও স্বরের সহিত সাংগীতিক সম্বন্ধ আছে। তদ্ভিন্ন সমস্তই কাল্পনিক সংযোজনা। ঐরূপ বর্ণনাই লোকের সংগীত বিষয়ে কুসংস্কারের মূল।

সপ্তক:—প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা পর-পর উচ্চ তিন সপ্তকের সুন্দর তিনটী নাম দিয়াছেন:—মন্দ্র, মধ্য, তার। এই মন্দ্র শব্দের অপভ্রংশেই বোধ হয় 'মুদারা' হইয়াছে,

"জম্বু-শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মলী-শ্বেতনামসু
দ্বীপেষু পুষ্করেচৈতে জাতাঃ ষড়্জাদয়ঃ ক্রমাৎ॥" সঙ্গীত-রত্নাকর।

"কৃষ্ণবর্ণো ভবেৎ ষড়্জ ঋষভঃ সুকপিঞ্জর।
কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যং কুন্দসমপ্রভঃ॥
পঞ্চমস্তু ভবেৎ পীতো ধূসরং ধৈবতং বিদুঃ।
নিষাদঃ শুক বর্ণঃ স্যাৎ ইত্যতঃ স্বরবর্ণতা॥
পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়্জ ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষভো ধৈবতশ্চাপি ইত্যেতৌ ক্ষত্রিযাবুভৌ॥
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যাবর্দ্ধেন বৈশ্যতৌ।
শূদ্রত্বং বিদ্ধিচার্দ্ধেন পতিতত্বান্ন সংশয়ঃ॥" নারদ-সংহিতা।

যাহা এক্ষণে ভুল ক্রমে মধ্য-সপ্তকের সংজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারেরা বলিয়াছেন যে, ঐ ১ম, মন্দ্র সপ্তক নাভি হইতে, ২য়, মধ্য সপ্তক বক্ষ হইতে, ৩য়, তার সপ্তক মস্তক হইতে, নির্গত হয়। এই সংস্কার যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল, তাহা শারীরতত্ত্ববিৎ মাত্রেই জানেন। প্রাচীন কালে শারীরবিদ্যা সম্যক্ প্রস্ফুটিত না হওয়াতেই ঐ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। নাভি হইতে কোন সাংগীতিক ধ্বনি নির্গত হয় না; সকল স্বরই কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়, ইহা ১ম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে। উদরাময়ের পীড়া হইলে নাভির গড্ গড্ শব্দ শুনা যায়; এতদ্ভিন্ন সাংগীতিক ধ্বনি উৎপাদনের কোন কল-বল নাভির মধ্যে নাই। নাভি হইতে কোন স্বর যে নির্গত হয় না, তাহা পরীক্ষার্থ এক সহজ উপায় বলি; খাদ স্বর উচ্চারণ কালীন নাভিস্থলে হাত দিয়া সবলে চপিয়া ধরিলেই জানা যাইবে যে, স্বর বিকৃত কিম্বা বন্ধ হয় কি না কিন্তু কণ্ঠ টিপিয়া ধরিলে অল্পেই স্বর বিকৃত ও বন্ধ হইয়া যায়। সেই রূপ বক্ষ ও মস্তক হইতেও কোন স্বর উৎপন্ন হয় না। খাদ, মধ্য ও উচ্চ এই প্রকার তিনটি সপ্তকের সহিত প্রাচীন গ্রন্থকারগণ শরীরের উক্ত পর পর উচ্চ তিন স্থানের উপমা দিতে যাইয়া স্বরোৎপাদনে স্থান নির্ণয়েরও চেষ্টা করাতে ঐ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শ্রুতি ও গ্রাম :—পূর্বকালে বিবিধ প্রকার স্বর-গ্রামের ব্যবহার ছিল। সেই সকল গ্রামের সপ্তস্বর মধ্যবর্ত্তী অন্তরের নিয়ম বিভিন্ন প্রকার। সেই বিভিন্নতা প্রদর্শনার্থ প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা গ্রামকে কেহ দ্বাবিংশ, কেহ তদতিরিক্ত সূক্ষ্মান্তরে বিভাগ করিয়াছেন। সেই সূক্ষ্মান্তরভূত স্বরের নাম 'শ্রুতি' রাখা হইয়াছে। প্রাচীন সংগীত-গ্রন্থাদিতে তিন প্রকার গানের উল্লেখ দেখা যায়:—ষড্জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম, ও গান্ধার গ্রাম। এই তিন গ্রামে সপ্তস্বরের নিয়ম বিভিন্ন প্রকার; সেই নিয়ম প্রদর্শন জন্য কোন আদি শাস্ত্রকার দ্বাবিংশতি শ্রুতির ব্যবহার করিয়াছিলেন; এবং তাহাদের ২২টী নাম দিয়া তাহাদিগকে পাঁচ জাতিতে বিভাগ করিয়াছিলেন; যথা,—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা। চারিটী শ্রুতি দীপ্তা, চারিটী মৃদু জাতি, পাঁচটী আয়তা জাতি, তিনটী করুণা জাতি, এবং ছয়টী মধ্যা জাতি। কি তৎপর্য্যে যে এই পাঁচ জাতি হইয়াছে তাহা শাস্ত্রকারেরাই জানেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাল্পনিক; উহার কোন সাংগীতিক তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত-গ্রন্থাদিতে উক্ত তিন গ্রামে যেরূপ শ্রুতি বিভাগানুসারে সপ্ত স্বর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক কালের স্বরগ্রামস্থ সপ্ত স্বর হইতে অনেক ভিন্ন। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে:—

সংখ্যা	শ্রুতির নাম।	জাতি।	ষড়্‌জ-গ্রাম*	মধ্যম-গ্রাম।	গান্ধার-গ্রাম।
১	তীব্রা †	দীপ্তা	.	.	নি —.
২	কুমুদ্বতী	আয়তা	.	.	.
৩	মন্দা	মৃদু	.	.	.
৪	ছন্দোবতী	মধ্যা	সা—.	সা —.	সা —.
৫	দয়াবতী	করুণা	.	.	.
৬	রঞ্জনী	মধ্যা	.	.	রি —.
৭	রতিকা	মৃদু	রি—.	রি —.	.
৮	রৌদ্রী	দীপ্তা	.	.	.
৯	ক্রোধা	আয়তা	গ —.	গ —.	.
১০	বজ্রিকা	দীপ্তা	.	.	গ —.
১১	প্রসারিণী	আয়তা	.	.	.
১২	প্রীতি	মৃদু	.	.	.
১৩	মার্জনী	মধ্যা	ম —.	ম —.	ম —.
১৪	ক্ষিতি	মৃদু	.	.	.
১৫	রক্তা	মধ্যা	.	.	.
১৬	সন্দীপনী	আয়তা	.	প —.	প —.
১৭	আলাপিনী	করুণা	প —.	.	.
১৮	মদন্তী	করুণা	.	.	.
১৯	রোহিণী	আয়তা	.	.	ধ —.
২০	রম্যা	মধ্যা	ধ —.	ধ —.	.
২১	উগ্রা	দীপ্তা		.	.
২২	ক্ষোভিনী	মধ্যা	নি—.	নি—.	.

* "ষড়্‌জস্বেন গৃহীতো গঃ ষড়্‌জ গ্রামে ধ্বানর্ভবেৎ।
ততস্তর্দ্ধ তৃতীয়ঃ স্যাদৃষভো নাত্র সংশয়ঃ॥
ততো দ্বিতীয়ো গান্ধারশ্চতুর্থো মধ্যমস্ততঃ।
মধ্যমাৎ পঞ্চমস্তদ্বৎ তৃতীয়ো ধৈবতস্ততঃ॥
নিষাদোঽস্তো দ্বিতীয়স্তু ততঃ ষড়্‌জশ্চতুর্থকঃ।" ইত্যাদি।

† বাবু সারদা প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রকাশিত শাঙ্গদেব প্রণীত সংস্কৃত 'সঙ্গীত-রত্নাকর' হইতে উদ্ধৃত।

মধ্যম-গ্রাম প্রায়ই ষড্‌জ গ্রামের ন্যায়, কেবল প এক শ্রুতি নিম্ন। গান্ধার-গ্রামের রি ও ধ অপর দুই গ্রামাপেক্ষা এক শ্রুতি নিম্ন; গ ও নি এক শ্রুতি উচ্চ। ম ও সা তিন গ্রামেই এক স্বর; মধ্যম ও গান্ধার-গ্রামে প একই স্বর। ফলতঃ এ বিষয়েও গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে; পরন্তু যে মত বহুল প্রচার, তাহাই উপরে লিখিত হইল। ঐ প্রকার স্বর বিশিষ্ট কোন গ্রাম আধুনিক সংগীতে ব্যবহার হয় না। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা বলেন যে, ষড়্‌জ ও মধ্যম-গ্রাম ধরাতলে এবং গান্ধার-গ্রাম স্বর্গে—দেবলোকে—প্রচলিত *। ইহার অর্থ এই যে, যে সংগীতে গান্ধার-গ্রাম ব্যবহৃত হইত তাহা গ্রন্থকারদিগের সময়েও অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব সংগীত যে যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা দ্বারা আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ষড়্‌জ ও মধ্যম-গ্রামের সপ্তস্বর-মধ্যস্থিত শ্রুতির নিয়ম দেখিয়া আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, ঐ দুই গ্রামে গ ও নি কোমল; এবং গান্ধার-গ্রামে রি, গ, ধ ও নি কোমল।

ষড্‌জ-গ্রামে আর এক আশ্চর্য্য এই দেখা যায় যে, যে স্থানে সা—তথায় রি, যে স্থানে রি—তথায় গ, এই প্রকার এক এক স্বর নামাইয়া, শেষে যে স্থানে নি—তথায় সা স্থাপন করিলে, আধুনিক সংগীতের স্বাভাবিক পূর্ণবারিক গ্রামের বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র এই তিন প্রকার অন্তরবিশিষ্ট সাত স্বরের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। এইজন্য অনেক সময় মনে হয় যে, শ্রুতি-সংখ্যানুসারে ষড্‌জ-গ্রামে সাত স্বরের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে গ্রন্থকারদিগের ভ্রম হইয়া থাকিবে; কারণ ভরত, হনুমান, প্রভৃতি আদি শাস্ত্রকারদিগের লিখিত গ্রন্থ বহুকাল লোপ পাইয়াছে। মধ্যকালের গ্রন্থকারগণ কেবল আবহমান কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন যে, সা, ম ও প চতুঃশ্রুতিক, রি ও ধ ত্রি শ্রুতিক, এবং গ ও নি দ্বি-শ্রুতিক †। কিন্তু আদি শাস্ত্রালোকাভাবে কোন এক গ্রন্থকার হয়ত নিজে কল্পনা করিয়া উহার উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণও সেই মত অবলম্বন করাতে, সকলেরই ঐ ভুল হইয়া থাকিবে;—কারণ শ্রুতিগুলি প্রত্যেক স্বরের উপরে না ধরিয়া, নীচে যে কেন ধরা হইয়াছে তাহার কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না। আরও, গ্রামের প্রথম স্বর যে সা, তাহা

* "দ্বৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড্‌জ-গ্রাম আদিমঃ॥
গান্ধার-গ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদোমুনিঃ।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোহসৌ ন মহীতলে॥" সঙ্গীত-রত্নাকর।

† "চতুশ্রুঃ পঞ্চমে ষড়্‌জে মধ্যমে শ্রুতয়োমতাঃ॥
ঋষভে ধৈবতে তিশ্রঃ দ্বে গান্ধারে নিষাদকে॥" সঙ্গীত-রত্নাবলী।

প্রথম শ্রুতিতে ধরাই স্বাভাবিক ; তাহা না করিয়া চতুর্থ শ্রুতিত ধরাতে গ্রামোচ্চারণ কালে প্রথম তিনটী শ্রুতি অপ্রয়োজনীয়। এই জন্য গান্ধার-গ্রামে শেষ স্বর নি-কে প্রথম শ্রুতিতে ধরিতে হইয়াছে। যদি বল—ষড্‌জ-গ্রামের প্রথম তিনটী শ্রুতি গ্রামোচ্চারণ কালে শেষ স্বর নি-এর উপরে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সা-কে চতুঃ-শ্রুতিক না বলিয়া তিন-শ্রুতিক, রি কে দ্বি-শ্রুতিক, নি-কে চতুঃ-শ্রুতিক, এই প্রকার বলিতে শাস্ত্রকারের কিছুই কঠিন ছিল না ; এবং তাহা হইলে সর্ব্ব প্রকারেই সঙ্গত হইত। ইহাতেই বোধ হয় যে, গ্রন্থকারগণ আদি শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের ভ্রম হইয়াছে, মুখে আনাও যদি মহাপাপ, তাহা হইলে ঐ প্রকার স্বর-গ্রাম প্রাচীন সংগীতেরই উপযোগী ছিল এই যুক্তি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। উক্ত গ্রন্থকারগণ যেমন গান্ধার-গ্রামের ব্যবহার না দেখিয়া, তাহা দেবলোকে প্রচলিত বলিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ ষড্‌জ ও মধ্যম-গ্রামের ব্যবহার বুঝিতে না পারিয়া, উহা দেবোপম প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইহাই আমাদের মনে করা উচিত। কিন্তু আর এক কথা এই যে, সার্ উইলিয়াম্ জোন্স, ডি, প্যাটার্সন্ প্রভৃতি যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থাদির আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে যে স্বরের যত শ্রুতি, তাহা স্বরগুলির উচ্চ দিকেই দেখাইয়াছেন। সার্ উইলিয়াম্ জোন্স 'সংগীত-নারায়ণ' ও সোমেশ্বর কৃত 'রাগবিবোধ' বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অতএব তিনি কি ঐ গ্রন্থদ্বয়ের মতানুসারেই শ্রুতির ঐ প্রকার নিয়ম তাঁহার হিন্দু সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। সংগীত-নারায়ণ ও রাগবিবোধের সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেখিতে পাইলে বুঝিতে পারি যে সার উইলিয়াম্ জোন্স প্রভৃতি শ্রুতির নিয়ম প্রাচীন মতানুসারে লিখিয়াছেন, কি ভুল করিয়াছেন।

বিকৃত-স্বর ঃ—সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ শুদ্ধ স্বর সাতটী, ও বিকৃত স্বর বারটীর কথা বলিয়াছেন *। অধুনা আমরা যাহাকে বিকৃত অর্থাৎ কড়ি-কোমল স্বর বলি, প্রাচীন মতে বিকৃত স্বর সেরূপ নহে।—ষড্‌জ-গ্রামের সাত স্বরকেই উক্ত গ্রন্থকারগণ শুদ্ধ স্বর বলেন ; ঐ স্বরের কোনটী এক বা দুই শ্রুতি উচ্চ নীচ হইলে তাহারই বিকৃত সংজ্ঞা হয়। উক্ত বারটী বিকৃত স্বর একই গ্রামে ব্যবহার হয় না। ষড্‌জ-গ্রামে তিনটী বিকৃত স্বর পৃথক, এবং মধ্যম-গ্রামে পাঁচটী বিকৃত পৃথক ; বাকী চারিটী বিকৃত স্বর উক্ত দুই গ্রামের সাধারণ। প্রাচীন মতে সাত স্বরই অবস্থাভেদে

* "ততঃ সপ্ত স্বরাঃ শুদ্ধাঃ বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী।" সঙ্গীত-দর্পণ।

বিকৃত গণ্য হয়; সা, গ, ম, নি, ইহারা দুই দুই প্রকারে বিকৃত, এবং রি ও ধ এক প্রকারে বিকৃত হয়। সাত স্বরই বিকৃত হওয়ার কারণ এই যে, যে স্বর স্থান চ্যুত হয় সে ত অবশ্যই বিকৃত; আবার স্থান চ্যুত না হইলেও, যে স্বরের নীচে কি উপরে স্থান চ্যুত অন্য বিকৃত স্বর থাকে, তাহাকেও গ্রন্থকারগণ বিকৃত বলেন। নিম্নে বিকৃত স্বরের বৃত্তান্তিকা তালিকা প্রদত্ত হইল।

সংখ্যা	নাম।	ব্যবস্থিতি।	অবস্থা।
১	চ্যুত-সা* ...	মন্দাসংস্থিত ...	দ্বি-শ্রুতিক
২	অচ্যুত-সা ...	ছন্দোবতীস্থ ...	দ্বি-শ্রুতিক
৩	বিকৃত-রি ...	রতিকাস্থিত ...	চতুঃ-শ্রুতিক
৪	সাধারণ-গ ...	বজ্রিকাস্থিত ...	ত্রি-শ্রুতিক
৫	অন্তর-গ ...	প্রসারিণীস্থ ...	চতুঃ-শ্রুতিক
৬	চ্যুত-ম ...	প্রীতিসংস্থিত ...	দ্বি-শ্রুতিক
৭	অচ্যুত-ম ...	মার্জ্জনীস্থিত ...	দ্বি-শ্রুতিক
৮	চ্যুত-প ...	সন্দীপনাস্থ ...	ত্রি-শ্রুতিক
৯	কৈশিক-প ...	সন্দীপনীস্থ ...	চতুঃ-শ্রুতিক
১০	বিকৃত-ধ ...	রম্যাসংস্থিত ...	চতুঃ-শ্রুতিক
১১	কৈশিক-নি ...	তীব্রাসংস্থিত ...	ত্রি-শ্রুতিক
১২	কাকলী-নি ...	কুমুদ্বতীস্থ ...	চতুঃ-শ্রুতিক

কৈশিক-নি, চ্যুত-সা এবং বিকৃত-রি, এই তিনটি ষড়্জ গ্রামের বিকৃত স্বর; সাধারণ-গ, চ্যুত-ম, চ্যুত-প, ও কৈশিক-প, বিকৃত-ধ, এই পাঁচটী মধ্যম গ্রামের; অচ্যুত-সা, অন্তর-গ, অচ্যুত-ম, ও কাকলী-নি, এই কয়টী উভয় গ্রামের বিকৃত স্বর। অচ্যুত-সা, বিকৃত-রি, অচ্যুত-ম ও বিকৃত-ধ, ইহারা শুদ্ধ-স্বর-স্থানীয় হইলেও, প্রথম তিনটীর নীচে ক্রমান্বয়ে স্থানভ্রষ্ট কাকলী-নি, চ্যুত-সা, ও অন্তর-গ এবং বিকৃত-ধ-এর উপরে কাকলী-নি থাকাতে উহারাও বিকৃত পদ বাচ্য হইয়াছে। চ্যুত-প এই বিকৃত সংজ্ঞার কারণ দেখা যায় না, কারণ ইহা মধ্যম-গ্রামের শুদ্ধ স্বর হেতু নিজে স্থানচ্যুত নহে, এবং ইহার নীচে কি উপরে স্থানচ্যুত বিকৃত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে

---

* সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্নাকর হইতে উদ্ধৃত।

সা-এর সম্পর্কে অন্যান্য স্বরের অস্তিত্ব, উক্ত বিকৃতের নিয়মে সেই আদর্শ স্বর সাও স্থান চ্যুত হইয়া বিকৃত হইয়াছে। ইউরোপের চিরস্থায়ী ওজন-বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক যন্ত্রে সা-কে কড়ি করা হয় বটে, কিন্তু তৎকালে সে সা এর খরজত্ব দূর হইয়া অন্য স্বর খরজ হয়, ইহা নিত্য বিধি। ইহাতেই মধ্য কালীয় সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের সংগীতে কার্য্যিক জ্ঞান থাকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়।

সংগীতের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে যে স্বরের অন্তর দূর দূর, তানের বিচিত্রতার জন্য, উহাদিগকে নিকট অন্তরে আনয়ন করিলে, উহারা স্থান চ্যুত হইয়া কড়ি বা কোমল হয়। প্রাচীন পদ্ধতিতে ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্ট হয় না। আরও, সা ও ম-কে তীব্র দিক ত্যাগে কেবল কোমল দিকেই বিকৃত করাতেও সন্দেহ হয় যে, স্বরগ্রামে শ্রুতিবিভাগেব নিয়ম গ্রন্থকারগণ উল্টা করিয়াছেন। সা-এর এবং ম-এর চারি শ্রুতি যদি উহাদের উপর দিকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে কাকলী-নি ও অন্তর-গ-এর আধুনিক সংগীতের কোমল-রি ও কড়ি-ম প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু এরূপ তর্কও অসঙ্গত নহে যে, পূর্ব্ব-কালের সংগীতে কোমল-রি ও কোমল-ধ, এবং কড়ি-ম ব্যবহার হইত না, কিম্বা তাহাদের কার্য্য অন্য কোন প্রকাবে সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বে ৪র্থ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, অর্দ্ধান্তর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অন্তরবিশিষ্ট স্বর প্রাচীন সংগীতেও ব্যবহৃত হইত না, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই,—কি শুদ্ধ, কি বিকৃত, কোন স্বরই এক শ্রুতির নহে, এবং রি ও ধ-এর তীব্র বিকৃতি নাই এবং গ ও নি-এর কোমল বিকৃতি নাই। গান্ধার-গ্রামের বিকৃত স্বর ভিন্ন প্রকার, তদ্বিষয় গ্রন্থকারেরা বিশেষ করিয়া লিখেন নাই।

বিকৃত স্বর সম্বন্ধেও গ্রন্থকারগণের মত ভেদ আছে। সংগীত-দামোদরের মতে সা ও প বিকৃত হয় না, তাহারা অচল*। সংগীত-পারিজাত মতে ২২টী বিকৃত স্বর, গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্রুতিতেই এক একটী স্বর স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য বিকৃত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সংগীতে এরূপ বিকৃতি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।

প্রথম মুদ্রিত 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার' ২৯ পৃষ্ঠায় আধুনিক সংগীতের অচলস্বারিক (অচল ঠাট) গ্রামের ১২টি পর্দাকে প্রাচীন সংগীত মতের দ্বাদশ বিকৃত স্বর বলিয়া জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার প্রমাণার্থ গ্রন্থকার সঙ্গীত-দর্পণের "ততঃ সপ্ত স্বরাঃ শুদ্ধাঃ" ইত্যাকার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

---

* "ষড়্জোঽচলঃ পঞ্চমশ্চ ঋষভশ্চলতি স্বরঃ।
গান্ধারো মধ্যমশ্চার্থ নিষাদো ধৈবতশ্চলঃ॥" সঙ্গীত-দামোদর।

কিন্তু অচল-ঠাটের বিকৃত গ্রামেও বারটী স্বর, এবং প্রাচীন মতের বিকৃতও বারটী স্বর। ইহাতে কাজেই লোকের ভ্রম হয় যে, সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ ঐ অচলস্থারিক বার স্বরকেই হয়ত দ্বাদশ বিকৃত স্বর বলিয়া থাকিবেন। প্রত্যুত অচলস্থারিক বার স্বরের অর্থ আছে; প্রাচীন মতের বারটী বিকৃত স্বরের সম্যক্ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। ইহাতেই সন্দেহ হয় যে, আদি শাস্ত্রকার বিকৃত স্বরের যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা লোপ হওয়াতে হয়ত মধ্যকালের গ্রন্থকারগণ দ্বাদশ বিকৃত স্বরের উক্ত মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক অচলস্থারিক, ও প্রাচীন বিকৃত এই এক জাতীয় দুই প্রকার স্বর তুল্য সংখ্যক হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, দ্বাদশ বিকৃত স্বরের কোন অজ্ঞাত তাৎপর্য্য থাকিতে পারে; অর্থাৎ উহারা প্রাচীন সঙ্গীতেরই উপযোগী ছিল, এই কথায় সব চুকিয়া যায়।

মূর্চ্ছনা:—স্বর গ্রামের প্রত্যেক স্বর হইতে তাহার উচ্চ বা খাদ অষ্টম পর্যন্ত সমস্ত স্বরের যে আরোহণ ও অবরোহণ, শাস্ত্রকারেরা তাহার 'মূর্চ্ছনা' নাম দিয়াছেন*। যথা:—সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা১, এই এক মূর্চ্ছনা; রি-গ ম-প-ধ-নি-সা১-রি১, এই আর এক মূর্চ্ছনা; গ-ম-প-ধ-নি-সা১-রি১-গ১, এই তৃতীয় মূর্চ্ছনা, ইত্যাদি। এই প্রকার প্রতি গ্রামে সাত মূর্চ্ছনা; তাহাতেই তিন গ্রামে একবিংশতি মূর্চ্ছনা হইয়াছে। উহাকে মূর্চ্ছনা কেন বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য কোন গ্রন্থকারই লিখেন নাই।

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে——"॥ সঙ্গীত-রত্নাকর।
"আরোহণাবরোহেণ ক্রমেণ স্বর সপ্তকম্।
মূর্চ্ছনা শব্দ বাচ্যং হি বিজ্ঞেয়ং তদ্বিচক্ষণৈঃ॥" মতঙ্গ।

অনেকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত মূর্চ্ছনাকে মিড়্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আমারও পূর্ব্বে ঐ ভ্রান্তি ছিল, সেইজন্য মৎ প্রণীত 'সঙ্গীত শিক্ষা' ও 'সেতার শিক্ষা' উভয় গ্রন্থেও মূর্চ্ছনার অশুদ্ধ অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছিল; কারণ তৎকালে কোন সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ আমার অধ্যয়ন করা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থাদি দেখিয়াছেন, যেমন সঙ্গীতসার ও যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার গ্রন্থকর্ত্তাগণ, তাঁহারাও ঐ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্নাকরের সম্পাদক, সঙ্গীত-দক্ষ বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, খ্রীঃ ১৮৭৯ সনের জুলাই মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকাতে, অন্যান্য ভ্রমের সহিত ঐ ভ্রম প্রথম দেখাইয়া দেন। অতএব তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রয়োজন।

প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ঐ ২১ মূর্চ্ছনার সুন্দর সুন্দর নাম দিয়াছেন; তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে :—

ষড়্জ-গ্রামের,—উত্তরমন্দ্রা, অভিরুদ্গতা, অশ্বক্রান্তা, মৎসরীকৃতা, শুদ্ধষড়্জা, উত্তরায়তা, ও রজনী।

মধ্যম-গ্রামের,—সৌবীরি, হৃষ্যকা, পৌরবী, মার্গী, শুদ্ধমধ্যা, কলোপনতা, ও হারিণাশ্ব।

গান্ধার-গ্রামের,—নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা, ও আলাপী*।

ষড়্জ-গ্রামের মূর্চ্ছনা যেমন সা হইতে আরম্ভ হয়, সেইরূপ মধ্যম-গ্রামের মূর্চ্ছনা ম হইতে †, এবং গান্ধার-গ্রামের মূর্চ্ছনা গ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। শার্ঙ্গদেব বলেন যে, মতান্তরে মূর্চ্ছনার এরূপ পদ্ধতিও দৃষ্ট হয় যে সা-এর স্বরে রি উচ্চারণ করিয়া রি-গ-ম-এর অন্তর ক্রমানুসারে আরোহণ করিলে অভিরুদ্গতা—২য় মূর্চ্ছনা হয়; সেই সা-এর স্থানে গ উচ্চারণ করতঃ আরোহণ করিলে, অশ্বক্রান্তা—৩য় মূর্চ্ছনা হয়, ইত্যাদি; এই প্রকার সকল স্বর ধরিয়া মূর্চ্ছনা হইয়া থাকে। এইরূপ এক এক মূর্চ্ছনা যদি রাগ বিশেষের প্রতিপাদিকা হয় ‡, তাহা হইলে মূর্চ্ছনার বিশেষ তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়; নতুবা তাহার প্রয়োজন বুঝা যায় না; আধুনিক সঙ্গীতে যাহাকে ঠাট বলে, ঐরূপ মূর্চ্ছনার সেই অর্থ হয় §; মূর্চ্ছনার ঐ নিয়মে রাগের ঠাট নিরূপিত

* সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্নাকর হইতে ঐ সকল নাম গৃহীত হইল। অন্যান্য গ্রন্থে মূর্চ্ছনা সমূহের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়।

† "মধ্যমধ্যমমারভ্য সৌবীরী মূর্চ্ছনা ভবেৎ।" সঙ্গীত-রত্নাকর।

‡ "স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতোযত্র রাগতাং প্রতিপাদ্যতে।

মূর্চ্ছনামিতিতামাহু কবয়ো গ্রামসম্ভবাং॥" সঙ্গীত-দামোদর।

§ গ্রীসদেশীয় প্রাচীন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন স্বর-গ্রামের সহিত ঐ প্রকার মূর্চ্ছনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যথা—

উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা : সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা, য়ুনানী (*Ionian*) গ্রাম।
অভিরুদ্গতা „ রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা-রি, দোরিয়ানী (*Dorian*) গ্রাম।
অশ্বক্রান্তা „ গ-ম-প-ধ-নি-সা-রি-গ, ফ্রীজিয়ানী (*Phrygian*) গ্রাম।
মৎসরীকৃতা „ ম-প-ধ-নি-সা-রি-গ-ম, লীদিয়ানী (*Lydian*) গ্রাম।
শুদ্ধষড়্জা „ প-ধ-নি-সা-রি-গ-ম-প, মিক্সলীদিয়ানী (*Myxolydian*) গ্রাম
উত্তরায়তা „ ধ-নি-সা-রি-গ-ম-প-ধ, য়োলিয়ানী (*Æolian*) গ্রাম।

মিক্সলীদিয়ানী গ্রাম প্রাচীন গ্রীসীয়রা ব্যবহার করিতেন না, উহা সেকালের ইতালীয় খ্রীষ্টীয় যাজকেরা প্রথম প্রচার করেন।

হইলে, কোন স্বরকে আর উচ্চ নীচ করিয়া কড়ি-কোমল করার আবশ্যক হয় না। কড়ি কোমল বিশিষ্ট ঠাটের স্বর মধ্যবর্ত্তী অন্তরের যে যে অনুক্রম, তাহা গ্রামের ১ম—মূর্চ্ছনা ব্যতীত, অন্যান্য মূর্চ্ছনার মধ্যে পাওয়া যায়। ১৬শ পরিচ্ছেদে এই বিষয় বিস্তারিত প্রদর্শিত হইতেছে।

যে সকল রাগ স্বাভাবিক গ্রামের কোন মূর্চ্ছনাতেই নির্ব্বাহ হয় না, যেমন আধুনিক ভৈরব রাগে কোমল-রি হইতে শুদ্ধ গ-এর অন্তর স্বাভাবিক গ্রামের কোন স্থানেই পাওয়া যায় না, সেই সকল রাগে বোধ হয় বিকৃত স্বর ব্যবহার হইত; কেননা বিকৃত মূর্চ্ছনারও নিয়ম আছে, তাহা ক্রমে দেখাইতেছি। এইজন্যই বোধ হয় বিকৃত স্বর সকল আধুনিক নিয়মেব কড়ি-কোমল স্বর হইতে ভিন্ন।

পূর্ব্বোক্ত মূর্চ্ছনা সমূহকে শুদ্ধা কহে, কেননা শুদ্ধ স্বর-যুক্তা। বিকৃত স্বর-যুক্তা মূর্চ্ছনা তিন পকাব :—কাকলীকলিতা, সান্তরা, এবং কাকল্যন্তরা*। কাকলীকলিতা মূর্চ্ছনায় কাকলী-নি, সান্তবা মূর্চ্ছনায় অন্তর-গ, এবং কাকল্যন্তরা মূর্চ্ছনায় কাকলী-নি ও অন্তর-গ ব্যবহৃত হয়।

ঐ সমস্ত মূর্চ্ছনা আবার তিন জাতিতে বিভক্ত; যথা—সম্পূর্ণা মূর্চ্ছনা, যাহাতে সাত স্বরই বর্ত্তমান, ষাডবী মূর্চ্ছনা,—যাহাতে এক স্বরের অভাব; এবং ঔড়বী মূর্চ্ছনা,—যাহাতে দুই স্বরেব অভাব †। শার্ঙ্গদেবকৃত সঙ্গীত-রত্নাকরের মতে ষড়্জ-গ্রামে ষাডবী মূর্চ্ছনায় সা, রি, প, অথবা নি এই কয় স্বরের কোন একটীর অভাব; মধ্যম-গ্রামে সা, রি, কিম্বা গ এই তিন স্বরের একটির না একটির অভাব হয়। ষড়্জ-গ্রামের ঔডবী মূর্চ্ছনায় সা ও প, কিম্বা রি ও প, কিম্বা গ ও নি, এই কয় স্বরের অভাব, এক মধ্যম-গ্রামে বি ও ধ, কিম্বা গ ও নি, এই কয় স্বরের অভাব হয়। ঐ সকল নানাজাতীয় মূর্চ্ছনার সংখ্যা ১৮০। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক নিয়মে ঔডব ও ষাডব রাগে যে যে স্বর বর্জ্জিত হয়, উক্ত প্রাচীন নিয়মে সেরূপ নহে। আরো আশ্চর্য্য এই, প্রাচীন মতে সা-স্বর বর্জ্জিত হইতেছে। কিন্তু সা পরিত্যাগে গান-বাদ্য

* "চতুর্দ্ধা তাঃ পৃথক শুদ্ধাঃ কাকলীকলিতাস্তথা"।
সান্তরাস্তদ্দ্বযোপেতাঃ ষট্‌পঞ্চাশদিতীরিতাঃ॥" সঙ্গীত-রত্নাকর।

† "ঔড়ব পঞ্চভিশ্চৈব ষাডবঃ ষট্‌স্বরো ভবেৎ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভিশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গীতয়োত্তৃভিঃ॥" নারদ (সঙ্গীত-রত্নাকর)।

করা অস্বাভাবিক কার্য্য; অতএব যে স্থলে সা বর্জ্জিত হয়,তথায় অন্য কোন স্বর অবশ্য খরজ হইয়া থাকে,এইরূপ অনুভব ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোন অসম্পূর্ণা মূর্চ্ছনায় ম-স্বর বর্জ্জিত হয় নাই; কিন্তু সে কালে ম-বর্জ্জিত রাগ যে ছিল না ইহাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস হয়? কালে কালে রাগের মূর্চ্ছনা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; অতএব পুরাকালে যেখানে ম ছিল, এখন তথায় সা হইয়াছে; এবং যে স্থানে সা ছিল, এখন তথায় ম হইয়াছে, এই যুক্তি অবলম্বন করিলে অনেক বিষয়ের সামঞ্জস্য হয়। কিন্তু চ্যুত ম ও চ্যুত সা থাকাতে ঐ যুক্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিতেছে না। সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ যে প্রকার অপরিষ্কার করিয়া সকল বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোন বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আশা করা যায় না।

তান :—মূর্চ্ছনান্তর্গত স্বরসমূহের নানাবিধ বিন্যাসকে তান কহে। তান সপ্ত প্রকার *; আর্চ্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাডব ও সম্পূর্ণ। এক স্বরের তানকে আর্চ্চিক বলে, দুই স্বরের তানকে গাথিক, তিন স্বরের তানকে সামিক, এই প্রকার সাত স্বর পর্য্যন্ত তানের প্রকার ভেদ করা হইয়াছে। তান আবার আরও দুই প্রকার—শুদ্ধ তান, ও কূট তান :—উপরোক্ত তানসকল শুদ্ধ; এবং সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ এই দুই প্রকার মূর্চ্ছনা বিপরীত ক্রম সহকারে উচ্চারিত হইলে, তাহাকে কূট তান বলে। কূট তানের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। এই প্রকার নানাবিধ তান একত্র করিলে ৪৯ কোটী তান হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থে জাতি-প্রকরণ নামক অধ্যায়ে ১৮ প্রকার জাতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে ষড়্জাদি সপ্তস্বর নাম্নী শুদ্ধা জাতি সাত প্রকার, যথা :— ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, ইত্যাদি; এবং বিকৃতা জাতি একাদশ প্রকার, যথা :— ষড়্জকৈশিকী, ষড়্জোদীচ্যবা, ষড়্জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্ম্মরবী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী ও নন্দয়ন্তী এই সকল জাতি কি তানের, না মূর্চ্ছনার, না রাগের না গীতের, তাহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর : এবং উহাদের যে কি তাৎপর্য্য ও প্রয়োজন, তাহাও বুঝা দুঃসাধ্য। অনেক সময়ে এরূপ বোধ হয় যে, ঐ প্রকার বহুতর কাল্পনিক বিবরণ দ্বারা কেবল গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাহা হউক, উহাদের কোন তাৎপর্য্য থাকিলেও

---

*"আর্চ্চিকো গাথিকশ্চৈব সামিকশ্চ স্বরান্তরঃ।
ঔড়বঃ ষাড়বশ্চৈব সম্পূর্ণশ্চেতি সপ্তমঃ।" ব্যাষর (সঙ্গীত-রত্নাকর)।

আধুনিক সরল হিন্দু সঙ্গীতের যে এতাধিক আড়ম্বরের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহা নিশ্চয়। প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের লেখার ধরণ দেখিয়া এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা যেন অগ্রে ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে এক নূতন ভাষা প্রচার করিতেছেন, চলিত ভাষার ব্যবহারানুসারে ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন নাই।

গ্রহ ও ন্যাস:—সঙ্গীত-শাস্ত্রকার রাগের মধ্যে কয়েক প্রকার স্বর প্রধান অর্থাৎ বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহাদের নাম গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, অংশ, বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী, ইত্যাদি। গ্রন্থকারদিগের কেহ বলেন যে, যে স্বর হইতে 'রাগের' উত্থাপন হয় তাহার নাম গ্রহ; ও যে স্বরে রাগ সমাপ্ত হয় তাহার নাম ন্যাস *। কেহ বলেন যে, 'গীতের' আদিতে ও অন্তে যে যে স্বর তাহার নাম ক্রমে গ্রহ ও ন্যাস †। অতএব গ্রহ ও ন্যাসের বিশেষ তাৎপর্য্য গ্রন্থকারদিগের বর্ণনায় কিছুই স্থির করা যায় না, কারণ রাগ ও গীত অনেক ভিন্ন জিনিস। রাগ-রাগিণীর মধ্যে গ্রহ ও ন্যাস কি প্রকার তাহা পরে দেখাইতেছি। আধুনিক সঙ্গীতে গ্রহ ও ন্যাসের কোন বিধি নির্দ্দিষ্ট নাই, সকল স্বর হইতেই রাগের উত্থান ও সমাপ্তি দৃষ্ট হয়। (৮৪-৫ পৃষ্ঠায় দেখ)। গীতের স্বরের গ্রহ ও ন্যাস নির্দ্দিষ্ট থাকা সম্ভব বটে। সঙ্গীত-রত্নাকরে অপন্যাস ও সংন্যাস প্রভৃতি কয়েক স্বরের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে এইমাত্র বুঝায় যে, উহারা গীতের কোন কোন অংশের শেষ স্বর; কিন্তু সে যে কিরূপ, তাহা আর বুঝা যায় না।

বাদী, বিবাদী, ইত্যাদি:—সঙ্গীত-রত্নাবলীর মতে রাগের বাদী স্বর রাজার ন্যায়, সম্বাদী স্বর অমাত্যের ন্যায়, অনুবাদী ভৃত্যের ন্যায়, এবং বিবাদী স্বর শত্রুবৎ ‡। কেহ কেহ বাদী স্বরের আর এক নাম 'অংশ' বলেন §। রাগে যে স্বর অধিকতর ব্যবহার হয়, তাহাকেই কোন কোন গ্রন্থকার বাদী কহেন, যদ্দারা রাগাদি প্রতিপন্ন হয়। ইহাতে আপাততঃ এই বোধ হয় যে, বাদী সম্বাদী প্রভৃতি দ্বারা রাগের মধ্যে

* "রাগাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহ-স্বর উচ্যতে।
ন্যাস-স্বরস্তুবিজ্ঞেয়ো যস্তু রাগঃ সমাপকঃ।" সঙ্গীত-রত্নাকর।

† "গ্রহ-স্বর স ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ।
ন্যাস-স্বরস্তু স প্রোক্তা যো গীতাদি সমাপ্তিকঃ॥" সঙ্গীত-নারায়ণ।

‡ "স্বামিবদ্বদনাদ্বাদী স রাগঃ প্রতিপাদকঃ।
বাদিনা সহসংবাদাৎ সম্বাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ।
মুখে তস্যানুবদনাদনু বাদীচ ভৃত্যবৎ।
তথা বিবাদোত্তেনৈব বিবাদী বৈরবস্তুবৎ॥" সঙ্গীত-রত্নাবলী

§ "অনল্পত্বাৎ প্রধানত্বাৎ অংশো জীবতরঃ স্বরঃ।" সোমেশ্বর

স্বরের অবস্থা বুঝায়; অধুনা এই রূপই সকলের সংস্কার। কিন্তু বাস্তবিক বাদী-স্বরের অর্থ বোধ হয় এরূপ নহে; কারণ সংস্কৃত-গ্রন্থকারেরা সা স্বরকেও রাগ বিশেষের বাদী বলিয়াছেন, যে সা সকল রাগেই সমান ব্যবহার্য্য।

শার্ঙ্গদেব, মতঙ্গ, দন্তিল, বিশাল, প্রভৃতি গ্রন্থকারের মতে যে দুই স্বর ১২ কি ৮ শ্রুতি ব্যবধানে অবস্থিত, তাহারা পরস্পরের সম্বাদী* । যেমন সা-এর সম্বাদী ম ও প, এবং ম ও প-এর সম্বাদী সা; সেইরূপ রি ও ধ, এবং গ ও নি, পরস্পর সম্বাদী। এক্ষণে মনে কর কোন চারিটী রাগে যদি রি বাদী হয়, তবে সেই কয় রাগেই ধ—সম্বাদী, প—অনুবাদী ও গ—বিবাদী হইলে, ঐ চারি রাগের পার্থক্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? এইজন্যই বলি যে, ঐ সকল শব্দের অর্থ ওই রূপ নহে। তবে যে কোন্ অর্থ ইহাও বুঝা কঠিন। আমার বোধ হয়, বাদী সম্বাদী দ্বারা গ্রামস্থ স্বর নিচয়ের পরস্পর মিলের সম্বন্ধ, অর্থাৎ হার্ম্মনি বুঝায়। কোন স্বরের সহিত তাহার পঞ্চম ও মধ্যমের মিল অতি নিকট, সেইজন্য তাহারা সম্বাদী। সা-এর পঞ্চম ১২ শ্রুতি ব্যবহিত; অবরোহণে ঐ প ৮ শ্রুতি ব্যবহিত; আরোহণে ম-এর পর ১২ শ্রুতি ব্যবহিত যে পর সপ্তকের সা, তাহা ঐ ম-এর পঞ্চম; অবরোহণে সেই সা ম হইতে ৮ শ্রুতি ব্যবহিত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন স্বরের সহিত তাহার পঞ্চমের যে সম্বন্ধ, তাহাই সম্বাদী। কিন্তু উপরে বলিলাম যে, সা-এর উচ্চ ও নিম্ন পঞ্চমের শ্রুতি ব্যবধান দুই প্রকার,—১২ ও ৮। এইজন্যই শাস্ত্রকারেরা বোধ হয়, সম্বাদীর ঐ দুই প্রকার শ্রুতি ব্যবধানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার ব্যবধানের যে দুই অবস্থা, অর্থাৎ উচ্চ ও নীচ, মধ্যকালীয় গ্রন্থকারেরা তাহা অভিপ্রায় না করাতে, সা-এর দুই সম্বাদী ম ও প, ধরিতে হইয়াছে, অথচ ম-এর পর ৮ শ্রুতি ব্যবহিত যে নি, তাহাকে ম-এর সম্বাদী বলা হয় নাই। বস্তুতঃ উল্লিখিত বিচার মতে নি ম-এর সম্বাদী হইতে পারে না, কেননা উহা ম-এর পঞ্চম নহে। এই নিয়মই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, কারণ বাদী-স্বর দ্বারা যেমন রাগ প্রতিপন্ন হয়, তাহার অমাত্য—প্রধান সাহায্যকারী—যে সম্বাদী স্বর, অর্থাৎ বাদীর প, সেও যে রাগ প্রতিপাদন বিষয়ে সাহায্য করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে রাগে সা বাদী, তাহাতে প বর্জ্জিত হইতে পারে না; সেইরূপ প-বর্জ্জিত রাগে সা-স্বর বাদী হইবে না। যেমন আধুনিক প্রচলিত মালকোশ রাগে প-বর্জ্জিত হওয়াতে ম বাদী হইতে পারে, কেননা ম-এর পঞ্চম সা ঐ রাগের সম্বাদীরূপে বিশেষ

---

*"শ্রুতয়ো দ্বাদশাষ্টৌ বা যয়োরন্তর গোচরা।
মিথোনৌ সম্বাদি ততো ———॥" সঙ্গীত-রত্নাকর।

প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই অর্থও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। ফলতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা ব্যতীত বাদী সম্বাদীর অর্থ সামঞ্জস্য হওয়াও দুষ্কর।

সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল লিখিয়াছেন যে, বাদীর স্থানে তাহার সম্বাদী প্রযুক্ত হইলে, জাতি রাগের হানি হয়*, ইহার অর্থ কি? টীকাকার অর্থ করিতে গিয়া ঐ প্রকার অনেক গোলমাল করিয়াছেন।

মতঙ্গের মতে দুই শ্রুতি অন্তরে যে স্বর, তাহা বিবাদী। যেমন—রি-এর বিবাদী গ, ধ-এর বিবাদী নি; অর্থাৎ অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত স্বর সকলের পরস্পর মিল নাই, তজ্জন্যই বিবাদী, কিনা শ্রুতিকটু। আবার গ ও নি সকল স্বরেরই বিবাদী বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে †; ইহার তাৎপর্য্য কিছুই পরিব্যক্ত হয় না।

যে সকল স্বরের পরস্পর বিবাদিত্ব সম্বাদিত্ব নাই,তাহারা অনুবাদী ‡। যেমন—সা-এর অনুবাদী রি ও ধ, প-এর রি ও ধ, রি-এর মা ও সা, ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহাতে বোধ হয়, অনুবাদীর মিল সম্বাদীর ন্যায় নিকট নহে, এবং বিবাদীর ন্যায়ও অমিল নহে, পরন্তু সিংহভূপাল ইহাও বলেন যে,"যে বাদী স্বর দ্বারা রাগের রাগত্ব সমুদিত হইয়াছে, তাহাকে যে প্রতিপন্ন করে, সেই অনুবাদী §, যেমন সা স্থানে রি, কিম্বা রি স্থানে সা, প্রযুক্ত হইলে জাতি রাগের বিনাশ হয় না"। ইহার অর্থ কি? কিছুই বুঝা যায় না।

মধ্যম-গ্রামে সম্বাদী ও অনুবাদী কিঞ্চিৎ প্রভেদ। এই গ্রামে সা-এর সম্বাদী প নহে, কেবল ম; রি-এর সম্বাদী দুই, প ও ধ। বিবাদী স্বর ষড্‌জ গ্রামের ন্যায়। সা-এর অনুবাদী প, ধ ও রি; রি-এর অনুবাদী ম ও প, ইত্যাদি।

বিবাদী সম্বন্ধে গ্রন্থকারগণ বলেন যে, যে স্বর দ্বারা রাগের বাদিত্ব, সম্বাদিত্ব, ও অনুবাদিত্ব বিনষ্ট হয়, তাহাকে বিবাদী বলে; কিন্তু রাগের মধ্যে এমন স্বর পাওয়া যায় না। শাস্ত্রকারদিগের মতে দুই শ্রুতি অন্তরে যে স্বর, তাহাই বিবাদী;

---

* "যস্মিন গীতে অংশত্বেন পরিকল্পিতঃ ষড্‌জঃ তৎস্থানে মধ্যমঃ ক্রিয়মানো রাগো ন ভবেৎ, যস্মিন বা অংশত্বেন মূর্চ্ছনাবশান্মধ্যমঃ প্রযুক্তঃ তৎস্থানে ষড্‌জঃ প্রযুজ্যমানো জাতি রাগহানিং ভবতি।"

সঙ্গীত-রত্নাকর টীকা।

† "————নি গাবন্য বিবাদিনৌ।
রি-ধয়োরেব বা স্যাতাং তৌ তয়ো বা রি-ধবপি।" সঙ্গীত-রত্নাকর।

‡ "যেষাং পরস্পর বিবাদিত্বং সম্বাদিত্বঞ্চ নাস্তি তেবাদনুবাদিত্বম্। সঙ্গীত-রত্নাকর টীকা।

§ 'যদ্বাদিনা রাগস্য রাগত্বং সমুদিতং তৎপ্রতিপাদকত্বং নাম অনুবাদিত্বম্। ততশ্চ ষড্‌জ স্থানে ঋষভঃ প্রযুজ্যমানঃ ঋষভ স্থানে ষড্‌জঃ প্রযুজ্যমানঃ জাতি রাগ বিনাশকরো ন ভবতি।" সঙ্গীত-রত্নাকর টীকা।

কিন্তু কোন্ স্বরের দুই শ্রুতি অন্তরে তাহা প্রকাশ নাই। মনে কর বাদী স্বরেরই অন্তরে; তাহা হইলে ঝিঁঝোটীর বাদী স্বর গ-এর দুই শ্রুতি অন্তরে যে ম, তাহাই কি উহার বিবাদী স্বর? সে ম ঝিঁঝোটীর কিছুই হানি করে না, বরং ম না হইলে উহার রূপই থাকে না; রিও সেইরূপ; পও সেইরূপ। তবে কোন্ স্বর ঝিঁঝোটীর বিবাদী? সংস্কৃত গ্রন্থকারেরাই বলিতে পারেন। আরও দেখ, পুরিয়াতে গ স্বর বাদী; সেই গ-এর নীচে কি উপরে, দুই শ্রুতি অন্তরে, কোন স্বর পুরিয়াতে নাই।

অতএব শাস্ত্রকারদিগের লক্ষণ দৃষ্টে এইরূপ মীমাংসাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় যে, বাদী বিবাদী সংজ্ঞা স্বর সমূহের পরস্পর মিলের সম্বন্ধ (হার্ম্মনি) বাচক; তাহারা রাগের মধ্যে স্বরের অবস্থা বাচক নহে, ইহা মধ্যকালীয় কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থকারের ভ্রান্তি। ইহাতে এরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পূর্ব্বকালে হার্ম্মনি ব্যবহার হইত, নতুবা, বাদী সম্বাদীর অন্য অর্থ সঙ্গত হয় না।

এতদ্ব্যতীত 'যমল', 'শ্লিষ্ট','পূর্ব্বাশ্রিত','পরাশ্রিত' প্রভৃতি কয়েক প্রকার স্বরের নাম আছে, যদ্বারা রাগের মধ্যে স্বরের ব্যবহার স্থান নির্দ্দেশ করা হয়; যে দুই স্বর সর্ব্বদা পরপর গীত হয়, তাহাদিগকে যমল কহে। যে স্বর সর্ব্বদা অন্য স্বরের পরে কিম্বা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শ্লিষ্ট কহে। যে স্বর সর্ব্বদা অন্য স্বরের পরে গীত হয়, তাহাকে পূর্ব্বাশ্রিত কহে; এবং যাহা পূর্ব্বে গীত হয়, তাহাকে পরাশ্রিত কহে। পাঠকগণ ঐ লক্ষণ দেখিয়া অনায়াসেই বুঝিবেন যে, যে যে স্বর পূর্ব্বাশ্রিত ও পরাশ্রিত তাহারাই শ্লিষ্ট ও তাহারাই যমল। এমন অবস্থায় অনর্থক সংজ্ঞা বৃদ্ধি করাতে কি উপকার?

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ স্বরসমূহকে নানা প্রকারে বিন্যস্ত করিয়া, সেই সকল বিন্যাসের পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়াছেন; যথা প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, ক্রমরেচিক, প্রেঙ্খিত, সন্ধিপ্রচ্ছাদন ইত্যাদি। ইহাদিগকে কেহ বর্ণালঙ্কার, কেহ স্বরালঙ্কার, কেহ মূর্চ্ছনালঙ্কার নাম দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সকল স্বর-বিন্যাস সম্বন্ধেও মতভেদ হইয়াছে, সঙ্গীত-রত্নাকরের মতে—সা১, সা১, সা, ইহাকে প্রসন্নাদি বলে, কিন্তু সঙ্গীত-পারিজাত মতে—সা রি সা, রি গ রি, গ ম গ, এই ক্রমকে প্রসন্নাদি বলে; সঙ্গীত-রত্নাকর মতে - সা১, রি সা১, সা১, গ ম সা১, সা১ প ধ নি সা১, ইহাকে ক্রমরেচিত বলে, সংগীত-পারিজাত মতে—সা গ রি ম গ রি সা, রি ম গ রি প ম গ রি, এই ক্রমকে ক্রমরেচিত বলে, ইত্যাদি। উপযুক্ত সমালোচনার শাসনাভাবেই ঐ প্রকার যথেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে সংগীতের আসল বিষয় সকল

তিরোহিত হইয়া, কেবল কৃত্রিম কাল্পনিক বিষয়গুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতে প্রকৃত সংগীত বিজ্ঞানের অভ্যুদয় কি প্রকারে হইবে?

গমক:—গীত বাদ্যে যে প্রকার আশ্, মিড়, ঘষিট্, কৃন্তন, গিট্‌কারী প্রভৃতি আভরণ ব্যবহার হয়, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা তাহাদিগের এক সাধারণ নাম 'গমক' রাখিয়াছেন। তাঁহারা গমকের বহুতর প্রকার ভেদ করিয়া, তাহারও পৃথক পৃথক নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের লক্ষণ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত না হওয়াতে, এক এক গমকের অর্থ নানা লোকে নানা প্রকার করিতেছে। গমক যথা,—কম্পিত, প্রত্যাহত, দ্বিরাহত, স্ফুরিত, অনাহত, শান্ত; তিরিপ, ঘর্ষণ, অবঘর্ষণ, বিকর্ষণ, পুনঃস্বস্থান, অবগ্রস্বস্থান, কর্ত্তরী, স্ফুট, স্থচালু, মুদ্রা, ইত্যাদি। উক্ত প্রথম চারিটী গমক দুই স্বরের নানাবিধ কম্পন বোধক; তৎপর তিনটী—নানাবিধ গিট্‌কারী ব্যঞ্জক; তৎপর দুইটী—আশ্ ও ঘষিট্ বাচক; তৎপর তিনটী—নানাবিধ মিড জ্ঞাপক; কর্ত্তরী গমকে সেতারাদি যন্ত্রে কৃন্তন বুঝায়; ইত্যাদি।

রাগ-রাগিণী—আদি রাগ ও রাগিণী সম্বন্ধে গ্রন্থকারদিগের নানা প্রকার মত-ভেদের কথা ৮ম পরিচ্ছেদে কতক দেখাইয়াছি। কোন মতে যে বিংশতিটী আদি রাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই,—শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল, ভাব, মধ্যম, ষাড়ব, রক্তহংস, কোহ্লাস, প্রবভ, ভৈরভ, মেঘ, সোম, কামোদ, অভ্র, পঞ্চম, কন্দর্প, দেশাখ্য, কাকুভ, কৌশিক, ও নট্টনারায়ণ*। যে গ্রন্থকার ব্রহ্মার মত জাল করিয়াছেন, তিনি বলেন যে—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ, এই পাঁচটী রাগ মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে, এবং নট্টনারায়ণ রাগ পার্ব্বতী—দুর্গার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে †।

* "শ্রী রাগ নট্টো বঙ্গালো ভাব মধ্যম ষাড়বো।
রক্তহংসশ্চ কোহ্লাসঃ প্রভবো ভৈরব ধ্বনিঃ॥
মেঘ-রাগঃ সোম-রাগঃ কামোদশ্চাভ্র পঞ্চমঃ।
জ্ঞাতাং কন্দর্প দেশাখ্যৌ কাকুভান্তশ্চ কৌশিকঃ॥
নট্ট-নারায়ণশ্চেতি রাগা বিংশতিরীরিতা॥" সঙ্গীতসার-সংগ্রহ।

† "সদ্যোবক্ত্রাত্তু শ্রী-রাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ভৈরবো ভূত্তৎ পুরুষাৎ পঞ্চমো'ভবেৎ॥
ঈশাণাখ্যান্মেঘরাগো নাট্যারম্ভে শিবাদভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্যে নট্ট-নারায়ণো ভবেৎ॥" তথা।

রাগার্ণবের মতে আদি ছয় রাগ এই প্রকার, যথা—ভৈরব, পঞ্চম, নট, মল্লার, গৌড়মালব, ও দেশাখ্য*। এই মতে প্রত্যেক রাগের পাঁচ পাঁচটী রাগিণী। নারদ সংহিতার মতানুযায়িক ছয় রাগের নাম † পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহাদের রাগিণী এই প্রকার: মালবের রাগিণী—ধানসী, মালসী, রামকিরী, সৈন্ধবী, আশাবরী ও ভৈরবী; মল্লারের রাগিণী—বেলাবলী, পুরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা; শ্রীর রাগিণী—গান্ধারী, সুভগা, গৌড়ী, কৌমারী, বল্লারী ও বৈরাগী; বসন্তের রাগিণী—তুড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী, ও বিভাষা; হিন্দোলের রাগিণী—মায়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়ী, বরাড়ী ও মারহাটী (মহারাষ্ট্রী); কর্ণাটের রাগিণী—নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী।

নারদ সংহিতার এই মতটী আসল নারদের মত নহে; উহা সঙ্কলন মাত্র। ইহার গ্রন্থকার যে আধুনিক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ মতে হিন্দোলের রাগিণী বরাডী ও মারহাটী, এই দুইটী শব্দ অতি আধুনিক; ইহারা বিরাটী বা বৈরাটী, ও মহারাষ্ট্রী শব্দের অপভ্রংশ; এ অপভ্রংশ প্রাচীন কালের নহে।

কোন মতে এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী, কোন মতে পাঁচ পাঁচ রাগিণী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন এক মতে যে যে রাগিণী এক রাগের স্ত্রী, অন্য মতে তাহা অন্য রাগের স্ত্রী: যেমন,—হনুমন্ত মতে কেদারী দীপকের স্ত্রী, ব্রহ্মার মতে উহা শ্রী-রাগের স্ত্রী, নারদ সংহিতা মতে উহা মল্লারের স্ত্রী, ইত্যাদি। আবার এক মতে যাহারা রাগ, মতান্তরে তাহারা রাগিণী। যেমন—হনুমন্ত মতে হিন্দোল ও মালকোশ রাগ, ব্রহ্মার মতে রাগিণী; এবং ব্রহ্মার মতে বসন্ত রাগ, হনুমন্ত মতে রাগিণী; ব্রহ্মার মতের পঞ্চম রাগ, নারদ সংহিতা মতে রাগিণী, ইত্যাদি। কি রাগাদির জাতি, কি ঋতু ও সময়, কি স্বর-বিন্যাস, কি রস, সকল বিষয়েই গ্রন্থকারদিগের মতের পরস্পর ঘোর অনৈক্য; কোন বিষয়েই ঐক্য নাই। এই সকল অনৈক্য যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহাতেই প্রতীত হয় যে, কিছুই কিছু না, অর্থাৎ প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের ঐ সকল নিয়ম নিতান্ত কাল্পনিক, এবং উহা কেবল গায়ক ও বাদকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইতেই

* "ভৈরবঃ পঞ্চমো নাটো মল্লারো গৌড়মালবঃ।
দেশাখ্যশ্চেতি ষড্রাগাঃ প্রোচ্যন্তে লোকবিশ্রুতাঃ॥" সংগীতসার-সংগ্রহ

† "মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" তথা।

বিশেষ পটু। সঙ্গীতের মুল শাস্ত্র—ভরত ও হনুমন্ত কৃত গ্রন্থসকল—কালক্রমে লোপ পায়; তদন্তর্গত বিষয় সমূহ কতক মুখে মুখেই চলিয়া আইসে। তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্গীতের প্রধান প্রধান বিষয়, যেমন সপ্তস্বর, দ্বাবিংশ শ্রুতি, একবিংশ মূর্চ্ছনা, তিন গ্রাম, ছয় রাগ, ৩০ বা ৩৬ রাগিণী, প্রভৃতির সংখ্যা ও সংজ্ঞা স্থির করিয়া, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, কারণ মূল শাস্ত্র বর্ত্তমান না থাকাতে, তাহার দোহাই দিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে উত্তম সুযোগ হইয়াছিল।

ঐ প্রকার অনৈক্যের আরও কারণ এই যে, গ্রন্থকারগণ দূর দূর সময়ের, ও দূর দূর স্থানের লোক: কেহ খ্রীষ্টের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কেহ পরে; কেহ কাশ্মীর হইতে, কেহ দ্রাবিড় হইতে, কেহ অযোধ্যা হইতে, কেহ কাশী হইতে, গ্রন্থ সকল লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ পূর্ব্ব প্রণীত কোন প্রাপ্ত গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন, কেহ নিজে ব্যবসায়ী লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কোন একটী স্থায়ী নিয়ম অবলম্বন করিয়া রাগ-রাগিণীগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই। উহা গ্রন্থকারগণের স্বেচ্ছাধীন কল্পনা মাত্র। তাঁহারা সুরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যাহা পাইয়াছেন, সমস্ত যড়ে-সাপ্টায় সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থীকৃত করিয়াছেন। স্বর-বিন্যাসের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যানুসারে রাগ-রাগিণী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যাইলে, হিন্দু সঙ্গীতের আরও গৌরব হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতেই অনেক সময় মনে হয় যে, সঙ্গীতে কৃতকর্ম্মা লোকের ন্যায় মধ্য কালের ঐ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের তত সুরজ্ঞান ছিল না; কারণ সুরজ্ঞান থাকিলে স্বর-বিন্যাসানুসারে রাগ-রাগিণী সমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করাই স্বাভাবিক। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থ আমাদের এই প্রকারই মনে করিতে হইতেছে যে, এখন আমরা রাগাদির যে যে মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা সেকালে অন্যরূপ ছিল।

রাগ-রাগিণী সমস্তই যে সংগ্রহ, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, অধিকাংশ রাগিণী দেশের নামে খ্যাত: যথা, সৈন্ধবী—সিন্ধু, বঙ্গালী—বঙ্গ, সৌরটী—সুরাট, ভূপালী—ভূপাল, গুর্জ্জরী—গুজরাট, মালবী—মালোয়া, কামোদী—কাম্বোদিয়া, কর্ণাটী—কর্ণাট, গান্ধারী—কান্দাহার, টঙ্কা—টঙ্কদেশ (রাজপুতানা), বৈরাটী—বিরাট, কালাংড়া—কলিঙ্গ, মূলতানী—মূলতান, ইত্যাদি।

আদি ছয় রাগের নাম যে ছয় ঋতুর অবস্থানুযায়ী, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। হনুমন্ত মতে রাগের ঋতু এই প্রকার: যথা—গ্রীষ্মে দীপক, বর্ষায় মেঘ, শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালকৌশ, শিশিরে শ্রী, ও বসন্তে হিন্দোল। দীপক ও মেঘ এক প্রকার ঋতুরই নাম। বসন্তে হিন্দোল,—দোলোৎসব বসন্ত কালেই হয়,—দোলনের নামেই

হিন্দোল। সেকালে পশ্চিম-হিন্দুস্থানে বোধ হয় শরৎকালে মহাদেবের পূজা হইত, এইজন্য তদৃতুর স্বর-বিন্যাসের নাম ভৈরব রাখা হইয়াছে—ভৈরব মহাদেবের এক নাম। হৈমন্তিক স্বর-বিন্যাসের নাম মালকৌশ হওয়ার কারণ বোধ হয় এই হইতে পারে যে, মালকৌশ মল্লকৌশিকের অপভ্রংশ; কৌশিকের এক অর্থ ব্যালগ্রাহী—সাপুড়ে,—এতদ্দেশে সাপুড়েকেও মাল বলে; পুরাকালের হিন্দুস্থানী মালেরা বোধ হয় উত্তম গায়ক ছিল; এখনও হিন্দুস্থানী সাপুড়িয়ারা উত্তম তুম্বুড়ী বাজায়; পুরাকালে তাহারা যে স্বরে গান করিত সেই স্বর খানির নাম মল্লকৌশিক রাখা হইয়া থাকিবে; এবং হেমন্তে পথ ঘাট সমস্ত শুষ্ক হইয়া ভ্রমণোপযোগী হয়, সেই সময় মালেরা ফিরি করিতে বাহির হয় বলিয়া, মালকৌশ হেমন্তে গাওয়ার রীতি হইয়া থাকিবে। শিশির ঋতুতে শ্রী-রাগ গাওয়ার তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে, শীতকালে ধান্যাদি বহু প্রকার শস্য কাটা হয়; এই সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত; তজ্জন্য এই ঋতুর ব্যবহার্য্য স্বরবিন্যাসের নাম শ্রী হইয়াছে। শ্রী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইলেও পুংরাগের মধ্যে যে ধরা হইয়াছে এই ব্যাপারটী সংগ্রহের সাক্ষ্য দিতেছে; শীতকালে শস্য কাটা, কিম্বা লক্ষ্মী পূজা বিষয়ক স্বর ব্যতীত অন্য কোন স্বর না পাওয়াতে আদি সংগ্রহকার উহাকেই ছয় রাগ মধ্যে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নতুবা তাঁহারা কখনই ব্যাকরণ দোষ বহন করিতেন না। শ্রী-রাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবেচনা হয়, কেননা সকল মতেই উহা আদি রাগ এবং শিশিরে গেয়।

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাহিত্য বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, আশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা যে যে বিষয় ধরিয়াছেন, তাহাই এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহাদের কল্পনা বলে দেবতারাও যখন মনুষ্যের ন্যায় রূপগুণ বিশিষ্ট, তখন গানের স্বর সকলও মনুষ্যের ন্যায় রূপগুণ বিশিষ্ট না হয় কেন? এই জন্য স্বরবিন্যাস সমূহের কেহ পুরুষ কেহ স্ত্রী; আবার তাহারা সংসারী—স্ত্রী-পুত্র-বিশিষ্ট। বাইবেলের আদি পুরুষ আদমের স্ত্রী হবা যেরূপ আদমের শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, রাগিণীগণও সেইরূপ রাগ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ঘরকন্না করিতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীন গ্রন্থকারগণ জানিতেন যে, কালক্রমে রাগ-রাগিণীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইবে; তাহাদের সহিত আদি রাগ নিচয়ের একটা সম্বন্ধ না রাখিলে, ইহারা ক্রমে প্রাধান্য ও আদরহীন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইজন্য তাঁহারা এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, রাগেরা পুরুষ হইলে তাহাদের স্ত্রীর প্রয়োজন হইবে; এবং ভারতবর্ষের বড় লোকেরা যেমন বহুবিবাহপ্রিয়, রাগেরাও সেইরূপ এক এক জনে পাঁচ বা ছয়টী করিয়া বিবাহ করিল; সুতরাং তাহাদের বহু পুত্রও জন্মিল। রাগপুত্রেরাও বহু

বিবাহ করিল ; তৎপরে উপরাগ ও উপরাগিণী হইতেও বাকি থাকিল না। এইরূপে রাগ-রাগিণীর বংশ বৃদ্ধি হইয়া সংখ্যাতীত পরিবার হয়। এক্ষণে যে কোন স্বর (রাগ) বলিবে, তাহা ঐ আদি রাগ-রাগিণী হইতে যে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলিবার উত্তম পথ হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ রাগ-রাগিণীর কি প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে দেখা যাউক।

ভৈরব :—সঙ্গীত-দর্পণের মতে—

"ধৈবতাংশ গ্রহন্যাসো রি-প হীনত্বমাগতঃ।
ঔড়বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিক মূর্চ্ছনা।
ধৈবতোবিকৃতো যত্র ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অথাৎ ভেরব-রাগ ঔড়ব জাতীয় ; ইহাতেধৈবতাদি মূর্চ্ছনা, অর্থাৎ ধ-নি-সা-গ-ম-ধ ঠাট ; ইহার ধ বিকৃত। প্রাচীন মতে বিকৃত ধ স্থান-চ্যুত স্বর নহে, অতএব এই বিকৃতের ফল-গ্রহ হওয়া দুষ্কর। সঙ্গীত-নির্ণয়ের মতে—

"ভিন্ন ষড়্‌জসমুৎপন্নো ভৈরবোপি রি-বর্জ্জিতঃ।
ধ-গ্রহাংশো মধ্যমান্তো গেয়ো মঙ্গলকর্ম্মণি॥"

অর্থাৎ ভৈরব খাড়ব জাতীয়—রি-বর্জ্জিত, এবং ষড়্‌জ হইতে উৎপন্ন, ও মঙ্গল কার্য্যে গেয় ; ধ ইহার গ্রহ ও অংশ, এবং ম ইহার ন্যাস। কোন মতে ইহা প্রচণ্ড রসে গেয়, যথা—"প্রচণ্ড রূপ কিল ভৈরবোঽয়ং।"

ভৈরবী :—সঙ্গীত-দর্পণের মতে—

"সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাস মধ্যমা
সৌবীরী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যম-গ্রামচারিণী॥"

অর্থাৎ ভৈরবী সম্পূর্ণা জাতি ; ম ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ; ইহা মধ্যম গ্রামের রাগিণী, ইহা সৌবীরী মূর্চ্ছনাযুক্তা, অর্থাৎ ম-প-ধ-নি-সা-রি-গ ইহার ঠাট। সংগীত-রত্নাকরের মতে—

"ধাংশ ন্যাস গ্রহান্তার মন্দ্র গান্ধার শোভিতা।
ভৈরবী ভৈরবোপাঙ্গী সমাংশেন স্বরাভবেৎ॥"

অর্থাৎ ধ ভৈরবীর গ্রহ,অংশ ও ন্যাস ; মন্দ্র ও তার, এই দুই সপ্তকের গ ইহাতে ব্যবহা হয় ; এবং ইহার স্বর-বিন্যাস ভৈরবের ন্যায়। ভৈরবী হাস্য রসে গেয়া, তাহা ১১ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি। তার ও মন্দ্র গান্ধার শোভিতা এই মাত্র বলিলে এরূপ বুঝা যে, ভৈরবীতে মধ্য-সপ্তকের ব্যবহার হয় না, যাহা অসম্ভব ; অতএব ঐরূপ বর্ণন কার্য্যত সঙ্গত নহে।

শ্রী-রাগ :—সঙ্গীত-দর্পণের মতে—

"শ্রী-রাগঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
পূর্ণঃ সর্ব্ব গুণোপেতো মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
কেচিৎ কথয়স্ত্যেনমৃষভত্রয় সংযুতম্ ॥"

অর্থাৎ শ্রী-রাগ প্রথম মূর্চ্ছনা যুক্ত, অর্থাৎ সা-রি-গ ম-প ধ-নি ইহার ঠাট ; ইহ সম্পূর্ণ জাতীয় ; এবং তিন সা, কোন মতে তিন রি বিশিষ্ট, ও সর্ব্ব গুণ যুক্ত। ঐ তিন সা-এর তাৎপর্য্য, বোধ হয়, মন্দ্র, মধ্য ও তার, এই তিন সপ্তকের তিন সা। কিন্ত তাহাই বা কেমন হয় ? কারণ তিন সা কিম্বা তিন রি-তে দুই অষ্টম হয় ; সেকালে কি দুই অষ্টমের কমে শ্রী-রাগ মূর্ত্তিমান হইত না ? অথবা ঐ তিন সা-এর অর্থ শুদ্ধ ও দুই বিকৃত—চ্যুত ও অচ্যুত, এইরূপ তিন সা ; কিন্তু এরূপ অর্থে তিন রি পাওয় যায় না, কারণ রি কেবল শুদ্ধ ও বিকৃত, এই দুই প্রকার হয়। ফলতঃ এক সঙ্গে ঐ প্রকার তিন সা-এর ব্যবহার কার্য্যতও সঙ্গত নহে। এইরূপ তিন সা, তিন ম, তিন প ইত্যাদি, রাগ বিশেষে প্রায়ই বর্ণিত দৃষ্ট হয় ; ইহার বিশেষার্থ বুঝা দুষ্কর।

খাম্বাবতী :—সংগীত-পারিজাত মতে—

"খাম্বাবতী প-হীনা স্যাৎ কোমলীত কৃধৈবতা
গান্ধার মূর্চ্ছনাযুক্তা রিণা ত্যক্তোবরোহিকা ॥"

অর্থাৎ খাম্বাবতী (খাম্বাজ) রাগিণী খাড়ব জাতি, প-বর্জ্জিতা ; গান্ধার মূর্চ্ছনা যুক্তা, অর্থাৎ গ-ম-ধ-নি-সা-রি ইহার ঠাট ; ইহার ধ কোমল ; ইহাতে অবরোহণে রি ত্যাগ করা বিধি।

কেদারী :—সংগীত-দর্পণের মতে—

"কেদারী রি-ধ-হীনা স্যাদৌড়বা পরিকীর্ত্তিতা।
নিত্রয়া মূর্চ্ছনা মার্গী কাকলী-স্বর-মণ্ডিতা ॥"

অর্থাৎ কেদারী-রাগিণী ঔড়ব জাতি, রি ও ধ বর্জ্জিতা; মধ্যম-গ্রামের মূর্চ্ছনা মার্গী, অর্থাৎ নি-সা-গ-ম-প-নি, ইহার ঠাট; ইহা তিন নি ও কাকলী স্বর; অর্থাৎ বিকৃত-নি, যুক্তা।

ভূপালী :—সংগীত-দর্পণের মতে—

"গ্রহাংস ন্যাস ষড়্জা সা ভূপালী কথিতা বুধৈঃ।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া সম্পূর্ণা রস শান্তিকে।
রি-প হীনোড়বা কৈশ্চিদিয়মেব প্রকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ ভূপালী-রাগিণী সম্পূর্ণা, মতান্তরে ঔডব জাতি,—রি ও প বর্জ্জিতা; প্রথমা মূর্চ্ছনায় নিষ্পন্না, এবং শান্ত রসে গেয়া; সা ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস।

ঐ প্রকার আর অধিক রাগের উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, উহা দ্বারাই সংগীত কুতূহলী পাঠক সংস্কৃত-গ্রন্থকর্ত্তা'দগের রাগ-রাগিণী বর্ণনার রীতি বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদের এক আশ্চর্য্য সংস্কার এই ছিল যে, গাইবার সময় যদি ভ্রমে রাগ অশুদ্ধ হয়, তবে সুরসা গুর্জ্জরী রাগিণী গাইলে সেই দোষ মোচন হয় *।

রাগ-রাগিণী অসংখ্য ছিল। শুনা যায়, সংগীতনারায়ণ-কর্ত্তা বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সময়ে তাঁহার যোড়শ সহস্র গোপিনীবা প্রত্যহ প্রত্যেকে এক এক নূতন রাগ গান করিয়া তাঁহাব চিত্তাকর্ষণ করিত। প্রত্যুত তাঁহার ১৬ হাজার গোপিনী যেমনি সত্য, তাঁহাদের কৃত রাগ-রাগিণীও তেমনি সত্য। সে যাহা হইক, রাগ-রাগিণী স্বর-বিন্যাসের উদাহরণ মাত্র; অতএব এ পর্য্যন্ত যত প্রকার রাগের উৎপত্তি হইয়াছে, তত্তাবতের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা সাংগীতিক ব্যাকরণের কখন নায্য কার্য্য হইতে পারে না। সংস্কৃত-গ্রন্থকারগণ রাগ-রাগিণীর স্বরূপ যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ সন্দেহ হয় যে, সংগীতে তাঁহাদের হাতে মুখে প্রকৃত সাধনা ছিল না। সংগীতে সাধনা ও কর্ত্তব না থাকিলেও, কৃতবিদ্য লোকে যে পাঁচ প্রকার গ্রন্থ দেখিয়া নূতন সংগীত-পুস্তক লিখিতে পারেন, ইহার জীবিত দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যেই বর্ত্তমান।

তাল :—কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা তাল শব্দের এক আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি করেন; তাঁহারা বলেন যে, মহাদেবের পুং নৃত্য—'তাণ্ডব', এবং ভগবতীর স্ত্রী নৃত্য—'লাস্য', এই দুই শব্দেরআদ্যক্ষর লইয়া, "তাল" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে †। কিন্তু বাস্তবিক করতালি হইতেই

---

*" লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিৎ গায়ন্তি চ বিরাগতঃ।
সুরসা গুর্জ্জরী তস্য দোষং হন্তীতিকথ্যতে॥" সঙ্গীত-নির্ণয়।

† "তাণ্ডবস্যাদ্য বর্ণেন লকারো লাস্য শব্দ ভাক্।
যদা সঙ্গচ্ছতে লোকে তদা তালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" সঙ্গীতার্ণব।

যে তাল শব্দ গৃহীত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; অনেক গ্রন্থকারের মতও ঐ *। প্রাচীন মতে সংগীত যেমন দুই প্রকার.—মার্গ ও দেশী, মার্গ সংগীতের তালও দেবলোক ব্যতীত মর্ত্ত্যালোকে প্রচলিত নাই। মার্গ-তাল পাঁচটি, যথা—চচ্চৎপুট, চারপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পর্কেষ্টাক ও উদ্‌ঘট্ট। কি চমৎকার নাম! ইহারা মহাদেবের পঞ্চ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে †।

সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থে যে সকল দেশী তালের বিবরণ লিখিত আছে, তাহারা এক্ষণে প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ সেই সকল নামের মধ্যে কয়েকটী আধুনিক তালের নাম পাওয়া যায়; যথা—চতুস্তাল (চৌতাল), ষতিতাল (ষৎ), একতালী, রূপক, ত্রিপুট (তেওট বা তেওরা), ঝম্পা (ঝাঁপতাল), ইত্যাদি। কিন্তু ইহারা যে প্রকার মাত্রানুসারে বর্ণিত হইয়াছে, সেই মাত্রার ভিন্ন তাৎপর্য্য বশতঃ আধুনিক সংগীত-বেত্তাগণ উহাদিগকে সহসা চিনিতে পারেন না।

সংস্কৃত-গ্রন্থকারগণ পাঁচটী লঘু অক্ষরের উচ্চারণ কালকে 'মাত্রা' বলিয়াছেন ‡; ইহাতে মাত্রা যে কি পদার্থ, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছুই প্রকাশ পায় না। পাঁচটী লঘু অক্ষর, ক খ গ ঘ ঙ, উচ্চারণের সমষ্টি কালকেই কি মাত্রা বলা যাইবে, না ঐ প্রত্যেক অক্ষরের কালকেই মাত্রা বলিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় হয় না। যদি পাঁচটী অক্ষরের সমষ্টি কালকে মাত্রা বলা যায়, তাহা হইলে কিছুই অর্থ হয় না; আর যদি প্রত্যেক অক্ষরের কালকেই মাত্রা ধরা যায়, তবে ঐ স্থলে পঞ্চাক্ষরের কথাই বা বলিয়াছেন কেন? যাহা হউক, তাঁহারা উহারই অর্দ্ধমাত্র কালকে দ্রুত, এবং তাহারও অর্দ্ধ, অর্থাৎ সিকি মাত্রাকে অণুদ্রুত নামে অভিহিত করিয়া, গুরুর গ, লঘুর ল, প্লুতের প. দ্রুতের দ. এইপ্রকার সংকেতানুসারে § তালের রূপ বিবৃত করিয়াছেন. যথা.—"ষতি

* "হস্তদ্বয়স্য সংযোগে বিয়োগে চাপি বর্ত্ততে।
ব্যাপ্তিমান্ যো দশ প্রাণৈঃ স কালস্তাল সংজ্ঞকঃ"॥ রাগার্ণব।

† "চচ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ ষট্‌পিতাপুত্রকোপি চ।
সম্পর্কেষ্টাক উদ্‌ঘট্টস্তালাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পূর্ব্বৎ শিবস্য পঞ্চেভ্যো মুখেভ্যো নির্গতাঃ ক্রমাৎ।" সঙ্গীত-দর্পণ।

‡ "পঞ্চলঘ্‌ক্ষরোচ্চারকালো মাত্রা সমীরিতা।
তদর্দ্ধংদ্রুতমিত্যুক্তং তদর্দ্ধঞ্চাপ্যণুদ্রুতং॥" তথা।

§ "লকারে লঘুরেকঃ স্যাদ্ গকারেতু গুরুর্মতঃ।
পকারে প্লু তমুরেরং গণভেদাস্তথাপরং॥" তথা।

তালে লদৌ লদৌ"*, অর্থাৎষতি তালে প্রথমে একটী লঘু ও দ্রুত আঘাত, তৎপরে একটী দ্রুত ও লঘু আঘাত। "দ্রুতেনত্বেক-তালিকা", অথবা মতান্তরে "একমেব দ্রুতং যত্র সা ভবেদেক তালিকা", অর্থাৎ একটী দ্রুতে একতালী হয়। "চতুস্তালো দ্রুত ত্রয়ং লান্তং" অথবা মতান্তরে "চতুস্তালো গুরোঃ পরে ত্রয়ো দ্রুতাঃ", অর্থাৎ চতুস্তালে তিনটী দ্রুতের পর একটী লঘু, অথবা একটী গুরুর পর তিনটী দ্রুত। "লঘুযুগ্মাভিঘাতেন রূপকস্তাল ঈরিতা", অথবা "রূপকেতু বিরামান্ত দ্রুতদ্বন্দ্বমুদাহৃতঃ", অর্থাৎ যে তালে দুইটী লঘু আঘাত হয, তাহাকে রূপক তাল কহে, অথবা যাহাতে দুইটী দ্রুতের পর বিরাম ফাঁক)। "ঝম্পা তালো বিরামান্ত দ্রুত দ্বন্দ্বং লঘুস্তত:", অর্থাৎ দুইটী দ্রুত আঘাতের পর বিরাম হইয়া, তৎপরে একটী লঘু আঘাতে ঝম্পা তাল হয়।

কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, আধুনিক ষৎ, চৌতাল, রূপক, ঝাঁপতাল, একতালা প্রভৃতির প্রচলিত রূপ উক্ত তালান্তর্গত লঘু, গুরু ও দ্রুতের মধ্যেই সুন্দর বিবাজ করিতেছে। যথা:—চৌতালে যে চারিটী তালাঘাত বা তালি দেওয়া যায়, তাহার তিনটী পিঠা-পিঠী দ্রুত পড়ে, তৎপরে একটী বিলম্বে পড়ে †, তাহাই "দ্রুতত্রয়ং লান্তং", অথবা উহারই উল্টা "গুরোঃ পরে ত্রয়োঃ দ্রুতা", বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রূপকে কেবল দুইটী তালাঘাত দিয়া ফাঁক দিতে হয়, তাহাই উক্ত 'বিরামান্ত দ্রুতদ্বন্দ্বের' তাৎপর্য্য। ঝাঁপতালে দুইটী তালাঘাত দ্রুত পড়িয়া, ফাঁকের পরে আর একটী তালি পড়ে, তাহাই 'বিরামান্ত দ্রুতদ্বন্দ্ব' লঘুঃ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। একতালায় এক নিয়মে একটী তালাঘাতই বারম্বার পড়ে, সেই জন্য 'দ্রুতেন' বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল তালাঘাতের মধ্যে আর বিশ্রাম নাই। এইরূপে সংস্কৃত-গ্রন্থে বর্ণিত ও আধুনিক প্রচলিত তুল্য নামবিশিষ্ট তালসমূহের যে প্রকার পরস্পর সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে উহাদের একতা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ‡।

সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ তালসমূহের লঘু, গুরু, দ্রুত, প্রভৃতি নামে যে মাত্রার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ মাত্রা নহে; তাহা কেবল তালাঘাতের আন্দাজী পরিমাণ। অর্থাৎ লঘু গুরু প্রভৃতি ঐ আঘাতের স্থায়িত্ব পরিমাণের প্রকৃত অনুপাত নহে; ইহা

* তালের এই সকল সংস্কৃত বচন "সংস্কৃত-সঙ্গীতসারসংগ্রহ নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

† প্রচলিত তালসমূহের রূপ ও নিয়মাদি ১৫শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

‡ মৃদঙ্গমঞ্জরীর গ্রন্থকর্ত্তাগণ এই বিষয়ের রহস্যোদ্ঘাটনে অসমর্থ হইয়া, প্রচলিত ধ্রুপদীয় তাল কতিপয়ের সহিত সংস্কৃত গ্রন্থের লিখিত অন্যান্য তালের মিল দেখাইতে বৃথা যত্ন পাইয়াছেন। যেমন—চৌতালের সহিত 'শ্রীকান্ত', রূপকের সহিত 'দ্বিধাবর্ণ', ইত্যাদি। ইহা বিষম ভ্রান্তি। কারণ 'শ্রীকান্ত', 'দ্বিধাবর্ণ', ইহারা ভিন্ন তাল।

গ্রন্থকারদিগের নিরূপিত আনুমানিক পরিমাণ মাত্র। তাহার প্রমাণ এই :—সংস্কৃত-গ্রন্থকর্ত্তাগণ লিখিয়াছেন যে, 'একতালীতে' একটী দ্রুত মাত্রা ও 'করুণতালে' একটী গুরু মাত্রা, ব্যবহার হয়; ঐ দ্রুত ও গুরুর অর্থ যদি অর্দ্ধ মাত্রা ও দুই মাত্রা হয়, তবে সে কাহার অর্দ্ধ? কাহার দ্বিগুণ? কেননা অর্দ্ধ ও দ্বিগুণ আপেক্ষিক শব্দ; পরন্তু ঐ স্থানে আর অন্য মাত্রাই নাই যে তাহার তুলনায় অর্দ্ধ ও দ্বিগুণ হইবে। ঐ দ্রুতের পরিমাণ এক মাত্রা, কিম্বা দুই মাত্রা বলিলেই বা দোষ কি? কোন দোষ নাই। অতএব ঐ দ্রুত, লঘু, গুরু, প্রভৃতির সে অর্থ নহে। তবে দ্রুত কিম্বা গুরু বলার তাৎপর্য্য এই যে, যে তালির অর্থাৎ আঘাতের গতি সচরাচর জলদ, তাহাকে গ্রন্থকর্ত্তাগণ দ্রুত বলিয়াছেন; যে তালির গতি ঢিমা, তাহাকে গুরু বলিয়াছেন; ইত্যাদি। এইজন্য একই তালের আঘাত পরম্পরাকে এক গ্রন্থকার লঘু, অন্য গ্রন্থকার গুরু কিম্বা দ্রুত বলিয়াছেন; কারণ আঘাতের গতি সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ পছন্দ, তিনি তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন; ইহার দৃষ্টান্ত চতুস্তাল, রূপক, প্রভৃতির লক্ষণে দ্রষ্টব্য। অতএব আমরা যাহাকে মাত্রা বলি, তাহার অনুপাতানুসারে ঐ লঘু গুরু প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার আরও প্রমাণ এই যে, প্লুত যে কেবল তিন মাত্রা, তাহা নহে; কারণ শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন যে, "দূরাহ্বানেচ গানেচ রোদনেচ প্লুতো মতঃ", অর্থাৎ দূর হইতে ডাকিতে, গান করিতে, ও রোদনে, যে স্বর ব্যবহার হয়, তাহাকে প্লুত বলে; অতএব গুরু অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল হইলে প্লুত হয়, তাহা চারি, পাঁচ, ছয় প্রভৃতি মাত্রাও হইতে পারে। আরও বিশেষ এই যে, তিন মাত্রাপেক্ষা দীর্ঘতর স্থায়িত্ব জ্ঞাপক কোন সংজ্ঞা, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই। সঙ্গীতের তালের মধ্যে গণিতের যে সুন্দর সম্বন্ধ র'হয়াছে, তাহার কোন আভাস সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ তদ্ব্যতিরেকে তালের মাত্রার ও লয়ের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হওয়াও অসম্ভব *।

সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাগণ তালের চারি প্রকার গ্রহ, অর্থাৎ ধরণের উল্লেখ করিয়াছেন যথা, —সম, বিষম, অতীত ও অনাগত † কোন মতে বিষম গ্রহবাদে তিনপ্রকার গ্রহ ‡।

* মৃদঙ্গমঞ্জরীর শেষে সংস্কৃত তালসমূহের যেরূপ নব্য প্রণালীতে মাত্রা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যে প্রায় সমস্তই ভুল হইয়া গিয়াছে, ইহা এক্ষণে সঙ্গীত-নিপুণ পাঠকবৃন্দ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

† "সমাতীতানাগতাশ্চ বিষমশ্চ গ্রহা মতাঃ।
চত্বারঃ কথিতাস্তালে সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা বিচক্ষণৈঃ।" সঙ্গীত-দর্পণ।

‡ "তালো গীতগতেঃ সাম্যকারী তস্য গ্রহাস্ত্রয়ঃ।" সঙ্গীত-সময়সার।

ঐ সকল গ্রহের অর্থ সম্বন্ধেও বিভিন্ন গ্রন্থকারের বিভিন্ন মত। এ বিষয়ে ১৫শ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে সমালোচিত হইতেছে।

মৃদঙ্গমঞ্জরীর শেষভাগে যে ২৭৫ প্রকার প্রাচীন তালের, এবং কণ্ঠকৌমুদীর শেষ ভাগে যে ১৭৬ প্রকার প্রাচীন গীতের, তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেকের ভ্রম হইতে পারে যে, আধুনিক হিন্দু সঙ্গীতের অবস্থা অতি হীন, কেননা এখন তত প্রকার তাল ও গানের ব্যবহার নাই। প্রাচীনকালীয় তাল ও গীতের সংখ্যা ও তাহাদের নামের ঘটা দেখিয়া লোকে ঐরূপ প্রতারিত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু সঙ্গীত-দক্ষ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, সংস্কৃত পদ্যের ছন্দ যেরূপ বর্ণের ও মাত্রার সংখ্যা ও তাহাদের লঘু গুরুত্ব ভেদে অসংখ্য প্রকার, ঐ সকল তালও সেইরূপ *। আরও একই প্রকার তালের আট, দশটী করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে, যেমন 'অক্র' তালের ন্যায় তালের নয় প্রকার নাম; 'করুণ' তালের ন্যায় তালের আট প্রকার নাম, ইত্যাদি।

প্রত্যেক নূতন গ্রন্থকারই কতকগুলি করিয়া নূতন তাল কল্পনা করিয়া দিয়াছেন। পুরাকালে মুদ্রাযন্ত্রাভাবে সকলে সকলের রচিত গ্রন্থ কখন দেখিতে পাইতেন না, সেইহেতু এক গ্রন্থকার যে প্রকার তাল কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন, অন্য গ্রন্থকার তাহা না জানিয়া, সেই প্রকার তাল রচনা করিয়া, তাহার অন্য নাম দিয়া নিজ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সকল নানা কারণে তালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত তাল সঙ্গীত সমাজে কখনই ব্যবহৃত হয় নাই; যে কয়েকটী তাল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাহাই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহাই আমরা পাইয়াছি। এখনও কোন কোন ওস্তাদ ব্রহ্ম, রুদ্র, লছ্‌মী প্রভৃতি তালের গান গাইয়া থাকেন; কিন্তু চৌতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, কাওআলী প্রভৃতি গান করিতে যেরূপ স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়, এবং তজ্জন্য গায়কেরও যত খানি গুণীপনা প্রকাশ পায়, ব্রহ্ম, রুদ্র, প্রভৃতি তাল সকলে সেরূপ মজা ও ফল কিছুই হয় না। এইজন্য উহারা অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে।

ঐ সকল সংস্কৃত তালের নিয়মানুসারে এখনকার প্রত্যেক গানের ছন্দকেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তাল বলিতে পারি; বিভিন্ন গানের বর্ণসকল বিভিন্ন প্রকারে লঘু ও গুরু হয়, ইহা সকলেই জানেন: এক এক গানের এক এক প্রকার লঘু গুরুর নিয়ম নির্দিষ্ট রাখিয়া, তাহার পৃথক পৃথক তাল নাম দিলে, এবং তবলা ও মৃদঙ্গে তালের যত প্রকার

---

* "অর্দ্ধমাত্রা দ্রুতো মাত্রা ত্রিয়তং প্লুত উচ্যতে।
দ্রুতাদি রচনাজ্জাতাস্তাল ভেদোঽপ্যনেকধা॥" সঙ্গীত-সারসংগ্রহ।

পরন্ ব্যবহার হয়, তাহাদের প্রত্যেকের এক এক নাম দিলে, আধুনিক তাল সংখ্যা কতই যে বৃদ্ধি হইতে পারে, ইহা সঙ্গীতবিৎ গুণীমাত্রেই বুঝিতে পারেন। ইদানীং বাঙ্গালী কবিগণ প্রায়ই নূতন নূতন ছন্দে কবিতাদি রচনা করিয়া থাকেন ; অতএব এ পর্য্যন্ত শত শত বাঙ্গলা ছন্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই কি নাম আছে ? পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, বিষমপদী প্রভৃতি কয়েকটী জাতি-সাধারণ নাম মাত্র প্রচলিত অছে। আধুনিক সঙ্গীতের তালেও সেই প্রকার জাতি-সাধারণ নাম কয়েকটী প্রচলিত। চতুর্দ্দশাক্ষরে পয়ার হয় ; আবার দশাক্ষরে, দ্বাদশাক্ষরে, ষোড়শাক্ষরেও পয়ার হয় ; সেইরূপ ত্রিপদীও কত প্রকার, চৌপদীও কত প্রকার। সেই সমস্তের এক এক পৃথক নাম দিলে, বাঙ্গলা ছন্দের যেমন অসংখ্য নাম হয়, সেইরূপ কাওআলী তালে কতই ছন্দ রচনা করা যায়, একতালায়ও কত ছন্দ করা যায়, ষৎ তালেও কতই করা যায় ; ইহা তালের ও ছন্দের রহস্যজ্ঞ লোকে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। ঐ সকল ছন্দের পৃথক পৃথক নাম দিলে, আধুনিক তালও অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। পুরাকালের পণ্ডিতগণ সকল বিষয়েই অল্প তারতম্যে নূতন নূতন নাম দিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন, এবং পটুও ছিলেন। সংস্কৃত ধাতু কল্পতরু বিশেষ ; তদবলম্বনে নূতন শব্দ রচনা করা কিছুই কঠিন নহে।

গীত বিষয়েও ঐ প্রকার। সংস্কৃত-গ্রন্থকারগণ পদ্যের ছন্দ, ভাবার্থ, বিষয়, ও রাগ-রাগিণীর অঙ্গীয় অবস্থা প্রভৃতির বিভিন্নতানুসারে গীতের প্রকার-ভেদ করতঃ তাহাদের পৃথক পৃথক নাম দিয়া, গীতসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সংস্কৃত-সঙ্গীত-রত্নাকরস্থ স্বরাধ্যায়ের শেষ ভাগে গীতি-প্রকরণে কপাল, কম্বল, মাগধী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় গানের লক্ষণ দেখিলেই, উহা অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তত্তাবৎ বিষয়ের দৃষ্টান্তাদি এস্থলে দিলাম না। 'কণ্ঠকৌমুদীর' উপসংহারে দৃষ্ট হইবে যে, যে ১৬ প্রকার ধ্রুবক গানের কথা প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তাহারা একাদশাক্ষরের পদে এক এক অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া, ২৬ অক্ষরের পদ পর্য্যন্ত ১৬ প্রকার হইয়াছে *। এই প্রকার বিভিন্নতাকে কি গানের বিভিন্ন প্রণালী বলা যায় ? ইহাতে সংগীতকুতূহলী জনসাধারণ নিতান্ত প্রতারিত হইয়াছেন।

---

* "ষড়্ভিঃ পাদৈরুত্তমঃ স্যাৎ পঞ্চভির্মধ্যমোমতঃ।
অধমস্তু চতুর্ভিঃ স্যাদেবন্তু ধ্রুবকস্ত্রিধা॥
একাদশাক্ষরাৎ পাদাদেকৈকাক্ষরবর্দ্ধিতৈঃ।
খণ্ডৈর্ধ্রুবাঃ ষোড়শ স্যুঃ ষড়্বিংশত্যক্ষরাবধি।" সঙ্গীত-শাস্ত্র : (কণ্ঠকৌমুদী)।

সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের বর্ণিত অঙ্কচারিণী, কুণ্ঠবাঞ্ছিত, তাণ্ডিকাব্যাপ্তি, শরভলীলক, প্রভৃতি যে অসংখ্য প্রকার গান সে কালে প্রচলিত ছিল যাহা কণ্ঠকৌমুদীতে ব্যক্ত হইয়াছে,তাহাদের পরস্পর বিভিন্নতা ধ্রুপদ হইতে খেয়ালের কিম্বা টপ্পার যেরূপ বিভিন্নতা তত দূর কখনই নয়। উহাদের বিভিন্নতার নিয়ম যে কিরূপ উল্লিখিত ধ্রুবকের কয়েক প্রকার ভেদের নিয়মেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। আমাদের আধুনিক সংগীতে ঐ নিয়মে গানের অসংখ্য প্রকার ভেদ এখনি করা যাইতে পারে। মনে কর—ধ্রুপদ গানের মধ্যে যেমন 'হোরী' নামক এক প্রকারগান আছে, তাহা ধামার তালেই গাওয়া হয়; খেয়ালের 'গুল্‌নক্স' গান কেবল একতালাতেই গাওয়া হয়, টপ্পার মধ্যে ঠুংরী, গজল, খেমটা প্রভৃতি গান ক্রমান্বয়ে ঠুংরী, পোস্তা ও খেমটা তালেই গাওয়া হয়; সেইরূপ ধ্রুপদের, খেয়ালের ও টপ্পার অন্যান্য তালের গানেরও ঐ প্রকার পৃথক পৃথক নাম অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে। আরো, দোলোৎসবের গানকে যেমন হোরী বলে, সেইরূপ ঐ তালে ঝুলন যাত্রার গানকে 'ঝোলি', দুর্গোৎসবের গানকে 'শারদীয়' (এই বিষয়ে আগমনী ও বিজয়া প্রচলিতই আছে), বাসন্তীপূজার গানকে 'বাসন্তী', রথযাত্রার গানকে 'রাথিক', এই প্রকার কতই নাম দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য তালের গান সম্বন্ধেও ঐরূপ করা যায়। অতএব এক্ষণে সংগীত-রহস্যজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, গানের যে নানাবিধ তাল, রাগ, ছন্দ, বিষয় প্রভৃতি এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহার উলট-পালট মিশ্রণে লক্ষ প্রকার গান হয় কি না? আবার নূতন নূতন রচনা করিলে, কোটী প্রকার হয়। কিন্তু ঐ প্রকার অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে যত্নবান হওয়ায় কোনই ফল নাই; অত প্রকার নাম কি কখন মনে থাকে, বা ব্যবহার হয়? অতএব ঐরূপ অকিঞ্চিৎকর প্রভেদ জনিত গানের ও তালের প্রচুর নামের অভাবে, আধুনিক সংগীতের হীনতা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। প্রাচীন সংগীত প্রণালী হইতে আধুনিক সংগীত প্রণালী যে সহস্রাংশে উন্নতি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহার প্রমাণের অপ্রতুল নাই; ইহা সংগীতের ইতিহাস-দক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

১৩শ পরিচ্ছেদ ঃ—কণ্ঠের সহিত যন্ত্রের সঙ্গত।

গান গাওয়ার সময়, কণ্ঠের সাহায্যার্থে, কোন এক যন্ত্র গানের সঙ্গে সঙ্গে বাদিত হওয়ার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে; তাহাকেই 'সঙ্গত' কহে। তাম্বুরা বেয়ালাদি যন্ত্রদ্বারা স্বরের সঙ্গত হয়, এবং পাখোয়াজ ও বাঁয়া তবলা দ্বারা তালের সঙ্গত হইয়া থাকে। তাল-সঙ্গতের বিষয় তালের পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে। আরব্ধ পরিচ্ছেদে স্বর-সঙ্গতের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

তাম্বুরা

হিন্দুস্থানে কালাবঁতী ও পুরুষের গানে সচরাচর তাম্বুরার সঙ্গত, এবং অন্যান্য গানে সারঙ্গীর সঙ্গত, হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ কালাবঁতী গানেরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; অতএব তাম্বুরার কথাই অগ্রে বলা উচিত। তাম্বুরায় চারিটি তার থাকে। মধ্যের দুইটী পাকা—ইস্পাতের—তার, তাহাদের দুই পাশের তার দুইটী পিত্তলের। মধ্য তারদ্বয়ের একটীকে গায়কের প্রয়োজন মত চড়াইয়া অপরটীকে তাহারই সম-স্বরে বাঁধিতে হয়; এই তারদ্বয়কে খরজের যুড়ি কহে; উহা মুদারার খরজ। ইহাদের দক্ষিণ দিকে যে পিত্তলের তার, যাহাকে প্রথম তার বলা যায়, তাহাকে ঐ খরজের নীচে উদারার প-স্বরে বাঁধিবে; এবং ঐ যুড়ির বামদিকের যে পিত্তলের তার, যাহাকে ৪র্থ তার কহে, তাহাকে ঐ খরজের খাদ অষ্টম, অর্থাৎ উদারার খরজ, করিয়া বাঁধিবে। তাম্বুরার তারে সুতা দিয়া যে জোআরী করা হয়, তদ্বিষয়ে আমার আপত্তি আছে; তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তাম্বুরার স্বর বাঁধা অসম্ভব কার্য্য। অতএব যতদিন তাম্বুরা বাঁধার উপযুক্ত স্বর-বোধ না হয়, ততদিন শিক্ষকের নিকট হইতে স্বর বাঁধিয়া লইয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া তাম্বুরার তুম্বী কোলের উপর করিয়া, তারগুলি দক্ষিণ দিকে লইয়া ডাণ্ডী-নামক অর্দ্ধগোল যে লম্বা কাষ্ঠ, তাহার মধ্যদেশ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা ও অনামিকা কিম্বা মধ্যমা, যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, সেই অঙ্গুলী দিয়া এমন ভাবে আলগোছে ধরিবে, যেন তারগুলি করতলে না লাগে। এই প্রকারে ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ কাণের নিকট খাড়া করিয়া রাখিয়া, দক্ষিণ তর্জ্জনী দ্বারা ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ তার পর পর ধ্বনিত করিবে; তর্জ্জনী দ্বারা প্রত্যেক তারকে বৃদ্ধার দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া অমনি ছাড়িয়া দিবে, তাহা হইলে তার ভালরূপে ধ্বনিত হইবে।

এক্ষণে কোন্ ওজনে তাম্বুরার তার বাঁধিতে হইবে, সে বিষয় মীমাংসা করিতে হয়। যে গায়কের যে ওজনে গাওয়া অভ্যাস, তাহাকে সেই ওজনে তাম্বুরা চড়াইয়া লইতে হয়; এইটী সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সে ওজনটী সর্ব্বদা ধরিয়া রাখা মুস্কিল, কেননা তাম্বুরার কাণ অর্থাৎ খুঁটী গুলি প্রায়ই খসিয়া যায়। প্রয়োজনীয় ওজনে সর্ব্বদা স্বর মিলাইবার জন্য ইউরোপে এক প্রকার ইস্পাত নির্ম্মিত "সুর-শলাকা" (টিউনিং ফর্ক) প্রস্তুত হয়; তাহার ধ্বনি চিরস্থায়ী। স্বর বাঁধিবার জন্য সেই সুর-শলাকা ব্যবহার করা উচিত। উহা সা, ম, ধ, প্রভৃতি নানা প্রকার ওজনের প্রাপ্ত হওয়া যায়*। সর্ব্বসাধারণের কণ্ঠের ওজন পরিমাণের গড়পড়্তা অনুসারে, সুর-শলাকাতে খরজের ওজন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সা কিম্বা ম সুরের শলাকা কিনিয়া লইয়া, তাহারই সুরে কিম্বা যে ওজনে গায়কের সুবিধা হয় ও গান জমিতে পারে, সেই ওজনটী ঐ শলাকার সুর হইতে কতখানি উচ্চ বা নিম্ন, তাহা স্থির করিয়া রাখিয়া, তদনুসারে তাম্বুরা মিলাইলে, সর্ব্বদা উপযুক্ত সহজ ওজনে গাওয়া যাইতে পারিবে। কণ্ঠের উপযুক্ত মত ওজন না পাইলে, স্বর কখন অতিরিক্ত উচ্চ ও কখন অতিরিক্ত খাদ হইয়া গাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা হয়। আবার সকল গানেরও বিস্তার সমান নয়; কোন গানে অধিক উচ্চে চড়িতে হয়; কোন গানে অধিক খাদে নামিতে হয়। এইরূপ গান সকল একই ওজনে গাইলে কখনই গানের উচিত মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় না। অতএব কণ্ঠে সাধারণতঃ কোন্ গান কোন্ ওজনে ধরিলে ভাল হয়, তাহা উক্ত সুর-শলাকার সুর অনুসারে স্বরলিপিতে প্রকাশ থাকা উচিত; যেমন সা-সুরে, বা রি-সুরে বা ম-সুরে খরজ; অর্থাৎ উক্ত সুর-শলাকা হইতে ঐ সুর লইয়া, তাহার সহিত তাম্বুরার খরজ বাঁধিয়া গাইবে। সমস্ত ইউরোপীয় যন্ত্রে স্বর-গ্রামের ওজন একই

*কলিকাতার ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রাদি বিক্রেতাদিগের দোকানে টিউনিং ফর্ক পাওয়া যায়। কখন কখন চীনাবাজারেও পাওয়া যায়। মূল্য সামান্য। আকৃতি হাঁড়িকাঠের ন্যায়।

টিউনিং ফর্ক দুই প্রকার :—'একসুরা' ও 'অচলস্বারিক'। উপরে যে সুর-শলাকার কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা একসুরা, অর্থাৎ তাহাতে একটী সুরমাত্র ধ্বনিত হয়। অচলস্বারিক-শলাকা এক যোড়ার কম হয় না; ইহা গণিতের হিসাবানুসারে আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত। দুইটী শলাকাতে ৮টী স্বাভাবিক ও ৫টী বিকৃত স্বর, এইরূপ ১৩টী অর্দ্ধস্বর পাওয়া যায়। ঐ শলাকার দুই গায়ে দুইটী তার সংলগ্ন থাকে; তাহা উপর নীচ করিলে সুর পরিবর্ত্তন হয়। শলাকার প্রত্যেক পদে সমপরিমাণ (ইকোয়াল টেম্পেরামেণ্ট) অনুসারে অর্দ্ধস্বর কষিয়া খাঁজ কাটা থাকে এবং তথায় সুরের নামও লিখা থাকে, সেই খাঁজে খাঁজে উক্ত তারদ্বয় সরাইলে, সা, রি, গ প্রভৃতি নির্গত হয়। একটী শলাকায় কড়ি কোমল সহিত সা রি গ ম, অপরটীতে সবিকৃত প ধ নি সা১ পর্য্যন্ত থাকে।

প্রকার ও চিরস্থায়ী এবং সুর-শলাকার সহিত তাহাদের ঐক্য আছে; অতএব সুর-শলাকা না থাকিলেও পিয়ানো, হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রেও উক্ত খরজের ওজন পাওয়া যাইবে। কোন এক যন্ত্রের মূল সুর পরিবর্ত্তন না করিয়া, তাহারই ভিন্ন ভিন্ন পর্দ্দায় খরজ ধরিয়া গাইলে, 'খরজ পরিবর্ত্তন' কার্য্যের প্রয়োজন হয়। খরজ-পরিবর্ত্তন বিষয়ক নিয়মাদি ১৭শ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত প্রকটিত হইতেছে।

গান সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে গাইতে চেষ্টা করা উচিত, কেননা খাদ স্বরাপেক্ষা উচ্চ স্বর অধিক মনোহর; তাহার প্রমাণ,—বংশী, বালক ও স্ত্রীকণ্ঠ, কোকিল, শ্যামা, ইত্যাদি; ইহাদের স্বর কি সুন্দর, মধুর ও মনোহর, তাহা সকলেই জানে। স্ত্রীজাতি ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া যে তাহাদের সরু—উচ্চ—কণ্ঠস্বর কাণে মিষ্ট বোধ হয়, তাহা নহে। অনেক সুন্দরীর কণ্ঠস্বর মোটা হয়, কিন্তু তাহা তাহাদের রূপের খাতিরে কি সুমধুর লাগে? কখনই নহে; আবার অতি কুৎসিতা স্ত্রীর কণ্ঠ যদি সরু হয়, তাহার গান কে না শুনে? কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে স্মৃতি-উদ্দীপনা উহার কারণ; তাহাও নহে। স্ত্রীজাতিত্ব জন্যই যে তাহাদের সরু কণ্ঠ মিষ্ট, তাহা নহে; কণ্ঠই স্ত্রীজাতির মনোহারিত্বের অন্যতর কারণ। আধুনিক প্রাণীতত্ত্বের উন্নত মতানুসারে উহা প্রমাণ করা যায়। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণীয় পণ্ডিত ডাক্তার হেল্‌মজ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা খাদ স্বরাপেক্ষা উচ্চ স্বরের মাধুর্য্যাধিক্যের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন*। প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বিখ্যাত গায়ক মৃত আহম্মদ্ খাঁ—অতি উচ্চ কণ্ঠে গাইতেন। তিনি সচরাচর যে সুরে তাম্বুরা বাঁধিয়া লইতেন, তাহা সা চিহ্নিত সুর-শলাকার ম কিম্বা প-এর সহিত মিলিত।

গানের ওস্তাদেরা শাকরেদ্‌দের কণ্ঠের ওজন-সীমার প্রতি আসলে মনোযোগ করেন না। যে ওস্তাদের যে ওজনে গাওয়া অভ্যাস শাকরেদ্‌কে সেই ওজনে গাইতে উপদেশ করেন; তাহাতে অনেক সময় এরূপ ফল হয় যে ছাত্রের স্বাভাবিক সুকণ্ঠটী বিকৃত হইয়া যায়। সকলের কণ্ঠের ওজন-পরিমাণ

* "In this way we can explain in general why high voices have a pleasanter tone, and the consequent striving of all singers, male and female, to obtain high notes. Morever, in the upper parts of the scale slight errors of intonation produce many more beats than in the lower, so that the musical feeling for pitch, correctness, and beauty of intervals is much surer for high than low voices."

'The Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music' —Translated from German by A. J. Ellis 1875, p. 271.

একরূপ হয় না; কেহ স্বর অধিক চড়াইতে পারে, খাদে অধিক নামাইতে পারে না; কেহ অধিক খাদে নামাইতে পারে, চড়াইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত তাহা কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন না। অনেক সময় এরূপ হয় যে, ওস্তাদের খাদ গলায় গাওয়া অভ্যাস, কিন্তু শিষ্যের গলা তত খাদে নামে না; ইহার কণ্ঠের ওজন উচ্চ; ওস্তাদ, সেই শিষ্যের স্বাভাবিক শক্তির বিরুদ্ধে, তাহাকে খাদে গাওয়াইয়া যথেষ্ট কষ্টে ফেলেন। শেষে ফল এই হয় যে, শিষ্যের কষ্টে-শ্রেষ্ঠে যে খাদ বাহির হয়, তাহাতে গান সুললিত হয় না; লাভের মধ্যে তাহার যে স্বাভাবিক সুন্দর উচ্চ স্বর টুকু থাকে, তাহাও বুজিয়া বিকৃত হইয়া যায়। হয়ত ঐ উচ্চ স্বরে গান সাধনা করিলে শিষ্য একজন উৎকৃষ্ট সুমধুর গায়ক হইতে পারিত। আবার তদ্বিলোমে, অনেক সময় এমন হয় যে ওস্তাদ উচ্চ গলায় গাইয়া থাকেন, ছাত্র তত চড়িতে পারে না; ছাত্রকে জোর করিয়া চড়াইতে অভ্যাস করান্, শেষে তাহার খাদ স্বরও থাকে না, উচ্চ স্বরও হয় না। বালকের ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠ, পুরুষের কণ্ঠ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ওস্তাদদিগের নিকট উহাদের গান শিক্ষা করাই বড় কষ্টকর হয়। বালক-শিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ এস্থলে দেওয়া অনুপযোগী বোধ হয় না। যথা:—

শিক্ষক খাদে গান ধরিয়া বালককে তাহার উচ্চ অষ্টমে গাওয়াইতে চেষ্টা করিবেন; এইটী সাধারণ নিয়ম। বালক বালিকাকে শিখাইবার সময় শিক্ষক কখনই তাম্বুরা ব্যবহার করিবেন না। বেয়ালা, এস্রার, অথবা সারঙ্গীর সঙ্গত এ সময় নিতান্ত প্রয়োজন; কেননা ঐ সকল যন্ত্র বালকের কণ্ঠের সম ওজনে বাদিত হইয়া, তাহার অভ্যাসের প্রকৃত সাহায্য করে। শিক্ষক নিজে প্রথমে গানটী উচ্চ অষ্টমে ধরিয়া, বালক-শিষ্যকে তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া, যতদূর পারেন তাহার সহিত সম ওজনে গাইয়া, পরে গানের যে উচ্চ অংশ শিক্ষকের গাওয়া অসম্ভব, কি অধিক কষ্টকর, কিম্বা টাকী, হইয়া পড়িবে, তাহা খাদে দেখাইয়া দিবেন। বালক-দিগকে প্রথম হইতেই স্বরলিপি দৃষ্টে গাইতে চেষ্টা করান উচিত নহে। অগ্রে মুখে মুখে আট দশটী ভিন্ন ভিন্ন ঠাটের সরল সিধা গান শিখাইয়া, তাহা সুচারুরূপে গাইতে পারিলে, তৎপরে স্বরলিপির উপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ মুখে মুখে শিখাইবার সময় মধ্যে মধ্যে সারগমের যে কয়েক প্রকার সাধন অভ্যাস করাইতে পারেন, শিক্ষক তজ্জন্য মনোযোগী হইবেন। বালকের যে সময়ে গলায় বয়সা ধরে, সে সময় এক বৎসর কাল তাহার গান অভ্যাস ক্ষান্ত দেওয়া উচিত; নতুবা স্বাভাবিক মর্দানা আওয়াজ হওয়ার ব্যাঘাত কখন কখন হয়। অস্মদ্দেশে বালককে গান শিক্ষা দেওয়ার প্রথা নাই; অতএব তদ্বিষয়ে আর অধিক উপদেশ এ গ্রন্থে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, তাম্বুরার সুরের সহযোগে কণ্ঠ সাধন করা তত উচিত নহে। তখন তাহার কেবল আওয়াজেরই দোষ দেখান হইয়াছে; এক্ষণে তাহার স্বর বাঁধিবার নিয়মে কি দোষ আছে, তাহার সমালোচন পূর্ব্বক সংশোধনের উপায় অবধারণ করা যাউক। যে নিয়মে তাম্বুরার স্বর বাঁধা হয়, তাহাতে উহা একাকী শুনিতে কতক মিষ্ট বোধ হয়। কিন্তু গানের সহিত তাম্বুরার সঙ্গত কি তৃপ্তি-জনক? অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল সা ও প, এই দুইটীমাত্র স্বর পাওয়া যায়। গ্রামস্থ সকল স্বরের সহিতই কি সা ও প-এর মিল আছে? তাহা নাই; অতএব উহারা অনেক স্থলেই গানের মাধুর্য্য নষ্ট করে। যে যে রাগিণীতে গ, প ও নি স্বর প্রবল, যেমন ইমন-কল্যাণ, বেহাগ, কালাংড়া ইত্যাদি, তাহাদের সময় তাম্বুরার আওয়াজ অসঙ্গত হয় না; কেননা খাদ খরজের তারে গ ও প, এবং প-এর তারে নি মধ্যে মধ্যে ধ্বনিত হয় *। যে সকল রাগে গ ও নি কোমল, তাহাদের সময় তাম্বুরার ধ্বনি কাকু হইয়া পড়ে। কিন্তু অভ্যাসে সকলই সহ্য হয়; তজ্জন্যই সংগীত সমাজে ঐ প্রকার দোষ অনুভূত হয় না। অনেক রাগে প বর্জ্জিত; সে সকল রাগ গান করার সময়, তাম্বুরার প-এর তার ম-এ বাঁধা উচিত। কিন্তু সা-এর সহিত ম-এর মিল তত মিষ্ট হয় না বলিয়া ঐরূপ করিয়া সকলে বাঁধে না; এই স্থানে এক বৃহৎ অসঙ্গতি রহিয়াছে। অতএব গানের সহিত প্রচলিত নিয়মে তাম্বুরার সঙ্গত কখনই উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না; উহা অতি নিকৃষ্ট সঙ্গত। তাম্বুরা কালাবঁৎদিগের নিকটই বিশেষ আদরণীয়; অপর সাধারণের নিকট তত নহে। সর্ব্বদা শুনা অভ্যাস বশতই উহা আমাদের কানে সহ্য হইয়া অতৃপ্তিকর বোধ হয় না; বরং অভ্যাস প্রভাবে উহার অভাবে গান ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। গানের সহিত কোন্ প্রকার স্বর-সঙ্গত সম্যগুপযোগী ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার বিচার করিতে হইলে, অগ্রে সঙ্গতের প্রয়োজন দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ, কোন্ ওজনে গান ধরিলে গাইবার সুবিধা হয়, এবং গাইতে গাইতে কণ্ঠ যাহাতে সেই ওজনের বাহিরে না যায়, এইজন্য যন্ত্রের প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ, অনেকক্ষণ গাইতে হইলে, নিয়মিতরূপে দম রাখা কঠিন হয়, যন্ত্রের সঙ্গতে দমভঙ্গ-জন্য গানের রস

* তারের ধ্বনি একক অর্থাৎ একস্বর নহে। তারের স্বাভাবিক মূল স্বরের সহিত আর আর যে সকল স্বরের অধিক মিল, যেমন উহার অষ্টম, দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ স্বর, তার কম্পিত হইলে ইহারা মূল স্বরের অনুষঙ্গে ধ্বনিত হয়। এই সকল স্বরকে উহার "যোগাংশ" (হার্ম্মনিক্স) কহে। ইহাই স্বর-গ্রামোৎপত্তির মূল। কোন ইংরাজী শব্দবিজ্ঞান গ্রন্থে ঐ বিষয়ের বিস্তারিত রহস্য দ্রষ্টব্য।

ভঙ্গ হইতে পারে না, এবং অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ গাইতে গাইতে উপস্থিত হয়, সে সকলই যন্ত্রে ঢাকিয়া লয়। এই দ্বিতীয় প্রয়োজন জন্যই যন্ত্রের সঙ্গত অপরিহার্য্য। তাম্বুরা দ্বারা তাহা হয় কি? কখনই নহে। কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে গানটী সম্পূর্ণ রূপে না বাজিলে কখনই উল্লিখিত বিষয়ের সাহায্য হয় না। অতএব যে যন্ত্রদ্বারা গানের আদ্যোপান্ত সাহায্য হইবে সেই যন্ত্রের সঙ্গতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এস্রার, সারঙ্গী, সারবীণ ঐ কার্য্যের যথার্থ উপযোগী; বিশেষ এই সকল যন্ত্র ছড় দিয়া বাদিত হওয়াতে, ইহাদের আওয়াজ কণ্ঠস্বরের ন্যায় ইচ্ছামত হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং মৃদু ও সরল করা যায়, তাহাতে গানের সমূহ সাহায্য হয়। হার্ম্মোনিয়ম কিম্বা পিয়ানো ঐ কার্য্যে তত উপযোগী নহে, কেননা ঐ সকল যন্ত্রে হিন্দু সঙ্গীতের রস একেবারে নষ্ট হয়; সেইজন্য উক্ত যন্ত্রে হিন্দুস্থানী সুরের গান বাজান নিতান্ত অনুচিত * (৪১ পৃষ্ঠা দেখ)। ইউরোপের কেবল বেয়ালা আমাদের সঙ্গতের উত্তম উপযোগী।

গানের সহিত প্রচলিত নিয়মে তাম্বুরার সঙ্গত সম্বন্ধে প্রাচীন সংগীত-শাস্ত্রে বিশেষ কোন অনুজ্ঞা নাই। দেবর্ষি নারদ যে বীণা যন্ত্র সর্ব্বদা বাজাইয়া গান করিতেন, তাহাতে গানটী সম্পূর্ণ বাজিত, ইহা সকলেই জানে। হিন্দুস্থানে অন্যান্য সকল প্রকার গানেই সারঙ্গী কিম্বা সারিন্দার সঙ্গত হইয়া থাকে। কালাবঁৎ গায়কেরা যন্ত্রীদিগকে চিরকালই তাচ্ছিল্য করেন; সেইজন্য যন্ত্রীর সাহায্য না লইয়া নিজে তাম্বুরা ধরিয়া গাওয়ার প্রথা হইয়া গিয়াছে। আরও, সর্ব্বদা যন্ত্রী সহসা কোথা পাওয়া যায়? পাইলেও, তাহাকে পারিতোষিকের বখ্‌রা দিতে হয়; বখ্‌রা দিলেও, যখন যে গান দরবারে গাইতে হয়, যন্ত্রীকে তাহার কিঞ্চিৎ উপদেশ পূর্ব্বাহ্নে না দিলেই বা সঙ্গতের সহিত গানের সুমিল কি প্রকারে হয়? উপদেশ না দিলেও, দুই এক বার সঙ্গে সঙ্গে গাইলেই যে পাকা যন্ত্রী, সে সেই গান আদায় করিয়া লইবেই। কিন্তু কালাবঁতেরা অন্যকে গান দিতে কত ইচ্ছুক, তাহা অনেকেই জানে। এই সকল কারণে ওস্তাদী গানে সারঙ্গ্যাদি যন্ত্রের সঙ্গত বিস্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, তাম্বুরার সঙ্গত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নিজে নিজে সারঙ্গী বাজাইয়া কালাবঁতী করাও যথেষ্ট পরিশ্রমের কার্য্য, এবং ঐ প্রকার যন্ত্র বাদনেও সম্যক্ নিপুণতার প্রয়োজন। শিক্ষার নানা অসুবিধার মধ্যে এত বিদ্যা লোকের কোথা হইতে হইবে?

* পিয়ানো ও হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে স্পৃহা হইলে ইউরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। তবে ঐ সকল যন্ত্রের অনুরোধে আমাদের সঙ্গীতকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের কায়দায় পরিণত করা যদি ভাল ও সুবিধা বোধ হয় সে ভিন্ন কথা; তাহা লোকের রুচির উপর নির্ভর।

এক্ষণে তাম্বুরায় যেরূপ সঙ্গত হয়, তাহাতে গাইতে গাইতে সুর যাহাতে ছাড়িয়া না যায়, কেবল তাহারই যে কিছু সাহায্য হয়; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া তাম্বুরায় যে একঘেয়ে বাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা কি সুখদায়ক? কখনই নহে। উহাতে গানের সাহায্য না হইয়া বরং গোলমাল হয়। অভ্যাস বশতঃ ঐ একঘেয়ে কার্য্য সহ্য হইতেছে বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধন গান গাইয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। আমাদের শ্রোতৃবর্গের রুচি মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, কখনই ঐ একঘেয়ে প্রণালীর আদর থাকিবে না; উহা অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রকার অভাব সকল দূরীকৃত হইলে, তবে জাতীয় সঙ্গীত ক্রমে উন্নত হওয়ার পথে দাঁড়াইবে।

ভিখারী বৈষ্ণবেরা যে 'একতারা' বাজাইয়া গান করে, তাম্বুরা সেই একতারারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সঙ্গীতের কিশোরাবস্থায় ঐ প্রকার সামান্য সুর-সঙ্গত ভিন্ন উচ্চতর সঙ্গত আশা করা যায় না। ফলতঃ হিন্দু সঙ্গীতের বাল্যাবস্থা অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার বর্ত্তমান পূর্ণ যৌবনোচিত বেশ ভূষা এখনও সংগৃহীত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিজে নিজে সারঙ্গী, এস্রার, বেয়ালা প্রভৃত যন্ত্র বাজাইয়া ওস্তাদী গান গাওয়া সহজসাধ্য নহে। তাহা না পারিলেও, যে সঙ্গতে রাগের মূর্ত্তি ভালরূপ প্রকাশিত হওয়ার সাহায্য হইতে পারে, এমন ভাবে সুর দিলেও গানের অনেক মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাম্বুরাতেও সে কার্য্য হইতে পারে; তাহা হইলে উহার একঘেয়েমীও দূর হয়। তজ্জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন :—

তাম্বুরায় আরও দুইটী তার যোগ করিয়া ছয়টী তার বিভিন্ন সুরে বাঁধিতে হইবে; যে রাগের যে যে সুর গ্রহ ও ন্যাস, এবং বাদী ও সম্বাদী, সেই চারি সুরে চারি তার এবং খরজ সুরে দুইটী তার—এই প্রকারে তাম্বুরা বাঁধিয়া, তাহা প্রচলিত রীতির ন্যায় অনবরত না বাজাইয়া, যখন যখন ঐ সকল সুর গানে স্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হইবে, তদনুসারে তার কয়টী ধ্বনিত করিলে গানের শোভা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইবে। এ বিষয়ে এক্ষণে এক অসুবিধা এই যে, আধুনিক সঙ্গীতে বাদী, সম্বাদী, গ্রহ ও ন্যাস, এই সকল প্রাচীন কথার নাম মাত্র আছে, রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, এক্ষণে ঐ সকল সুরের নিশ্চয়তা নাই। অতএব এক্ষণে ঐ নামগুলি ব্যবহার না করিয়া, যে যে সুর গানের মধ্যে প্রধান, সেই কয়েকটী সুরে তাম্বুরার তারগুলি বাঁধিতে হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক গান গাইবার সময় তাম্বুরার খরজের তার ব্যতীত অন্যান্য তারের সুর বদলাইতে হইবে। তাহাতে কোনই হানি নাই। এস্রার, সারঙ্গী প্রভৃতি তরফ বিশিষ্ট যন্ত্রে নূতন ঠাটের রাগ বাদন কালীন, বাদকেরা সর্ব্বদাই তারের সুর বদলাইয়া থাকেন।

তাম্বুরা বাঁধার জন্য, প্রত্যেক গানের স্বরলিপির উপর, সঙ্গতের সুর কয়েকটি একবার লিখিত থাকা উচিত; গাইবার সময় তদনুসারে তার বাঁধিয়া, যখন যখন ঐ সকল সুর স্পষ্ট বিধানে কণ্ঠে উচ্চারিত হইবে, তখন সেই সেই সুরের তারে আঘাত হইবে। যেমন, ইমনে প১ ন১ স র গ; কেদারায় প১ ধ১ ন১ স ম; কানড়ায় প১ নো স র ম; ভৈরবীতে প১ ধো১ স গো ম; ইত্যাদি। অন্য সুরের সময়, এবং দ্রুত আরোহণাবরোহণের সময় খরজের যুড়ী ধ্বনিত হইবে। আবার এক রাগের ভিন্ন ভিন্ন গানেও সঙ্গতের সুর বিভিন্ন হইতে পারে। এই প্রকার সঙ্গতই যে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ, তাহা নহে; কেননা গানের ব্যবহার্য্য আরও যে যে সুর উহাতে বাকি থাকিতেছে (যেমন কড়ি-ম), তাহাদের সময় খরজ ধ্বনির তত মিল হইবে না*। কিন্তু সংক্ষেপে ঐ প্রকার সঙ্গত ব্যতীত উত্তমতর সঙ্গত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় ভাগে দুই একটী গানে তাম্বুরার সঙ্গত স্বরলিপি যোগে লিখিয়া দেখান যাইবে।

চলিত নিয়মাপেক্ষা ঐরূপ করিয়া তাম্বুরা বাজান কিছু কঠিন হইবে বটে, সে অতি সামান্য। বিনা পরিশ্রমে কোথায় সুখ পাওয়া যায়? ইউরোপে ইদানীং এরূপ প্রথা হইয়া পড়িয়াছে যে, গায়ক পিয়ানো বাজাইতে না পারিলে তাহার প্রতিষ্ঠা নাই; সেই পিয়ানো বাদন যেরূপ কঠিন, তাহার সহিত তাম্বুরার তুলনাই হয় না। উপরে যে অভিনব সঙ্গত প্রণালীর প্রস্তাব করা হইল, যাঁহার উহা ভাল না লাগিবে, তিনি প্রচলিত নিয়মে তাম্বুরা বাজাইয়া গাইবেন; তাহারও নিষেধ নাই। একেবারেই কোন নূতন প্রণালী যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে, এরূপ আশা করা নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা। আমাদের গানে প্রচলিত তাম্বুরার সঙ্গত-প্রণালীর উন্নতি হওয়া আবশ্যক; তদ্বিষয়ে সঙ্গীত সমাজের মনঃসংযোগ করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তবে লেখকের মনে যে নিয়ম ভাল বোধ হইল, তাহাই উপরে প্রকাশিত হইল। অন্যান্য সঙ্গীতবিজ্ঞ লোকে

* গানের সহিত উচিত মত সুর-সঙ্গতের প্রয়োজন হইতেই ইউরোপে 'বহুমিল' শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়া তাহা এক্ষণে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ কারণ ইউরোপীয় সঙ্গীতে বহুমিল ভিন্ন অন্য প্রকার সুর-সঙ্গত ব্যবহার নাই, এবং সেইজন্যই ইউরোপীয় অর্কেষ্ট্রা, ব্যাণ্ড, প্রভৃতি বাদ্যে এত প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুমিল প্রণালী সঙ্গীত বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ। ইহার প্রকৃত নিয়মানুসারে গানে সুর-সঙ্গত প্রযুক্ত হইলে, গীতাদি যে কতদূর বিচিত্র ও সুশ্রাব্য হয়, তাহা বহুমিল-জ্ঞাত লোকমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে বহুমিলের নিয়ম এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। সহসা সে নিয়মে সঙ্গত-প্রণালী আমাদের গানে ব্যবহার করিলে, অনভ্যাসবশতঃ অনেকে তাহার সৌন্দর্য্য প্রণিধান নাও করিতে পারেন; বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ও সাধনা ব্যতিরেকে তদনুযায়িক সঙ্গত যন্ত্রে বাদন করাও সহজসাধ্য নহে। এই হেতু সে প্রকার সুর সঙ্গতের বিষয় এ গ্রন্থে উল্লেখ করিলাম না। গ্রন্থান্তরে তদ্বিষয়ক নিয়ম ও উপদেশাদি প্রকাশ করার বাসনা রহিল।

উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রণালী উদ্ভাবন পূর্ব্বক তাহার প্রস্তাবনা করিলে আরও ভাল হয়। এই রূপেই ত বিদ্যার উন্নতি হইয়া থাকে। নতুবা চিরকাল যাহা হইয়া আসিতেছে, তদপেক্ষা ভাল আর কি হইবে—এরূপ মনে করিলে, চিরকাল মাতৃক্রোড়েই থাকিতে হয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে লোকের উচিত বুদ্ধি হয় বলিয়াই জন-সমাজের এত উন্নতি হইয়াছে।

১৪শ পরিচ্ছেদ—মাত্রা, ছন্দ ও তালাদির বিবরণ।

গীত ক্রিয়ার কাল, অর্থাৎ যে সকল স্বরে গান হয়, তাহাদের স্থায়িত্বের কাল, কখন পরিমিত-কখন অপরিমিত রূপে, ব্যয়িত হইয়া থাকে। যে গীতে কাল ব্যয়ের কোন পরিমাণ থাকে না, তাহাকে 'কথকতা' অথবা 'আলাপ' বলা যায়; যে গীতে কালের পরিমাণ থাকে, তাহাকে 'গান' বলা যায়।

লয় ও তাল:—গীতের আদ্যোপান্তে কাল-পরিমাণের নিয়ম এক সমান রাখাকে 'লয়' কহে ("লয়ঃ সাম্যম্" ইতি অমরকোষঃ) *। সেই লয়কে, অর্থাৎ কাল-পরিমাণের তুল্যতাকে, রক্ষা ও শাসন করাই তালের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ গান ক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে 'তাল' † কহে। লয় প্রকাশ করণার্থ গানের কোন কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ করিতে হয়; সেই বলবৎ উচ্চারণের নাম 'প্রস্বন' (*accent*)। এক করতলের উপর অপর করতলের আঘাত দ্বারা অর্থাৎ কর-তালি-দ্বারা ঐ প্রস্বন প্রদর্শিত হয় বলিয়া, গানকালের ঐরূপ পরিমাণ করার নাম তাল রাখা হইয়াছে ‡।

---

* সঙ্গীতসারে লয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, "যথা—কালের অবিচ্ছেদ গতির নাম লয়"; এবং মৃদঙ্গমঞ্জরীতে—"হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অর্দ্ধ এবং অণু এই পাঁচটী মাত্রানুযায়িক কালের অবিচ্ছেদ গতির নাম লয়" এইরূপ লিখা হইয়াছে, যাহার কোন অর্থ হয় না। অসমান অনিয়মিত রূপেও গানকালের গতি অবিচ্ছেদ থাকিতে পারে, তাহা হইলেও কি লয় হয়? কালের অবিচ্ছেদ গতির মধ্যে নিয়ম, অনিয়ম—দুইই থাকিতে পারে। অতএব লয়ের ঐরূপ ব্যাখ্যা অতিশয় অশুদ্ধ। 'তবলামালা' নামক তালবিষয়ক পুস্তকেও গ্রন্থকার লয়ের উক্ত প্রকার অশুদ্ধ ব্যাখ্যার নকল করিয়াছেন।

† "তালোপাত্ত গতেঃ সাম্যকারী———।" সঙ্গীত-সমরসার।

‡ তালঃ কালক্রিয়ামাণং লয়ঃ সাম্যমথাস্ত্রিয়াং। অমরকোষ।

মাত্রা :—গানকালের উক্ত সম পরিমাণ অসংখ্য প্রকারে করা যায়; সেই জন্য ছন্দ অসংখ্য প্রকার। যে একটী আদর্শ কালের অনুপাতানুসারে ঐ পরিমাণের সমতা হয়, ও যাহার গণনানুসারে ছন্দের বিভিন্নতা হয়, সেই কালটীর নাম 'মাত্রা'*। মাত্রার সমপরিমাণানুসারে সাঙ্গীতিক ক্রিয়াব্যাপক সকল কালই বিভাগ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মাত্রাই লয়।

মাত্রা শিক্ষা :—মনে কর, ১—২—৩—৪, এই চারিটী অঙ্ক সমান সমান কালে উচ্চারণ করিয়া, ও ১-এর উপর প্রস্বন ও তালি দিয়া, উহাদিগকে যদি চারি বার আবৃত্তি করা যায়, যেমন ১́ ২ ৩ ৪ | ১́ ২ ৩ ৪ | ১́ ২ ৩ ৪ | ১́ ২ ৩ ৪, তাহা হইলে একটী ছন্দের উদ্ভব হয়; ইহার প্রত্যেক প্রস্বন বা তালির কাল সমান চারি ভাগে বিভক্ত হইতেছে বলিয়া, সেই প্রত্যেক ভাগ—অর্থাৎ ঐ প্রত্যেক অঙ্ক—ঐ ছন্দের মাত্রা; অতএব ঐ ছন্দটীর মাত্রা-সমষ্টি ষোল, ইহা সহজেই বুঝা যায়; উহার নাম

* সঙ্গীতসার ও মৃদঙ্গমঞ্জরীতে মাত্রার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকৃত অর্থ হয় নাই। গ্রন্থকারগণ মাত্রার অর্থের জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের মত অবলম্বন করাতেই মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, বর্ণোচ্চারণ কালের নাম মাত্রা "এবং হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ও ব্যঞ্জন এই চার প্রকার মাত্রা সঙ্গীতে ব্যবহার হয়।" আশ্চর্য্য ভ্রম, ঐ প্রকার কথা সঙ্গীত-বিজ্ঞোচিত হয় না; কারণ সুরের স্থায়িত্ব বহুতর প্রকারে হইয়া থাকে। আরও, মৃদঙ্গমঞ্জরীতে সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের "পঞ্চ লঘ্বক্ষরোচ্চার কালোমাত্রা সমীরিতা" এই শ্লোকার্দ্ধের মর্ম্মানুসারে মাত্রার অর্থ অবধারিত করিতে গিয়া গ্রন্থকার সমূহ ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছেন। (১২শ পরিচ্ছেদে তালের বিবরণ দেখ।) মাত্রার বিশুদ্ধ অর্থ—জ্ঞানাভাবেই ঐ সকল গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন তালের নিয়ম যে রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা ক্রমে দেখাইতেছি। সুর ও তাল, এই দুইটী মাত্র জিনিস লইয়া সঙ্গীত হয়। অতএব লয় ও মাত্রার বিশুদ্ধ উপপত্তি বোধ না থাকিলে সঙ্গীতের রীতিমত ও পরিশুদ্ধ স্বরলিপি করা অসম্ভব; কেননা কেবল সুর লিখিলেই স্বরলিপি হয় না। গানের কিম্বা গতের সুর-সমূহের ও তালের বোল বিষয়ক অক্ষরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করা সহজ কার্য্য নহে; সেই স্থায়িত্বানুযায়িক-তালের জন্যই স্বরলিপির যে কিছু কাঠিন্য। অতএব সুরের স্থায়িত্ব বিশুদ্ধ ও সুবোধ না হইলে স্বরলিপি দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষা করা অসম্ভব। ঐ ত্রুটি প্রযুক্তই সঙ্গীতসার, কণ্ঠকৌমুদী, যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা, প্রভৃতি গ্রন্থগুলির স্বরলিপি সম্যক ফলোপদায়ক হয় নাই।

তবলামালাতেও মাত্রার উক্ত অসঙ্গত ও অপরিষ্কার ব্যাখ্যার অনুকরণ করা হইয়াছে, সুতরাং মাত্রার বিশুদ্ধ নিয়মাভাবে উহাতেও তালের ঠেকার বোলগুলির যে প্রকার মাত্রা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রায়শই অশুদ্ধ ও অসঙ্গত হইয়াছে; তাহা পরে দেখাইতেছি। তালের মাত্রা দেখাইবার জন্য এই পুস্তকে ঠেকার বোলসমূহে যে প্রকার মাত্রা চিহ্ন যোগ করা হইয়াছে তদ্দারা অক্ষরগুলির প্রকৃত স্থায়ীকাল কোন রূপে বোধ হইতে পারে না। প্রত্যেক অক্ষরের স্থায়িত্ব জানিতে না পারিলে পুস্তক দেখিয়া কখনই তাল শিক্ষা করা সম্ভব হয় না।

হইল 'চতুর্মাত্রিক' ছন্দ। আবার, ১—২—৩ কেবল এই তিনটী অঙ্ক ঐরূপ উচ্চারণ করতঃ, ১-এর উপর প্রস্বন ও তালি দিয়া, বার বার আবৃত্তি করিলে, যেমন ১´২ ৩ | ১´২ ৩ | ১´২ ৩ | ১´২ ৩, এইরূপ আর এক ছন্দের উদয় হয়; তাহার প্রত্যেক তালি সমান তিন ভাগ হওয়াতে, সেই প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ অঙ্কও ঐ ছন্দের মাত্রা; সুতরাং ঐ ছন্দের মাত্রা সমষ্টি ১২, এবং উহার নাম হইল 'ত্রিমাত্রিক' ছন্দ। ঐ অঙ্কগুলি যদি এক এক সেকেণ্ডে এক একটি উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে মাত্রার কাল-পরিমাণ এক সেকেণ্ড হইবে; কিম্বা যাহার যেরূপ নাড়ীর গতি, সেই প্রত্যেক গতির সহিত যদি এক একটি অঙ্ক উচ্চারণ করা যায়, তথায় মাত্রার পরিমাণ এক নাড়ী হইবে; এইরূপ অন্য কোন পরিমাণও হইতে পারে। মাত্রা-কালের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; যখন যে পরিমাণে তাহা স্থায়ী করা যাইবে, তাহাই ছন্দের আদ্যোপান্ত সমান ও অখণ্ড থাকিবে। ঐরূপ কোন কালানুসারে প্রত্যেক অঙ্ক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, ভূমিতে অঙ্গুলীর টোকা দিতে হয়, এবং প্রস্বনের উপরিস্থ টোকাটী অপেক্ষাকৃত জোরে দিতে হয়; তাহারই এক একটী টোকা এক এক মাত্রার উত্তম প্রতিরূপ ও নিদর্শক হয়, এবং তদ্দ্বারা লয় অনুভূত হইয়া মাত্রার সমপরিমাণের শাসন ও অভ্যাস হইয়া থাকে। এই স্থানে ৪৮ পৃষ্ঠার প্রথম পারাগ্রাফস্থ উপদেশ সকল স্মরণ করিতে হইবে।

উক্ত ১ ২ প্রভৃতি অঙ্কস্থানে বর্ণ উচ্চারিত হইলেই, গানের মত হয়। উক্ত প্রথম ছন্দে ১৬টী অঙ্ক একই ভাবে উচ্চারিত হওয়াতে, একঘেয়ে মত শুনায়। উহাকে বিচিত্র করিতে হইলে ১৬ অপেক্ষা কম সংখ্যক অঙ্ক বা বর্ণ কতক উচ্চারণ করিলেই তাহা হয়। মনে কর, যদি ১২টী 'লা' বর্ণ উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই ঐ ১৬ মাত্রা পূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে কোন কোন লা-এ যে একের অধিক মাত্রা পড়িবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ১২ মাত্রায় ১২ লা উচ্চারণ করতঃ, বাকি চারি মাত্রা উহারই কোন চারিটী লা-এ যোগ করিলে, চারিটী লা-এ দুই দুই মাত্রা, ও আটটী লা-এ এক এক মাত্রা পড়িয়া ১৬-মাত্রা পূর্ণ হয়। আবার, উক্ত ১৬ মাত্রা যেমন চারি চারি মাত্রা অনুসারে চারি ভাগ হইয়াছে, ঐ ১২টী লাও তেমনি চারি ভাগ হইলে, প্রত্যেক ভাগে তিনটী করিয়া লা পড়ে, ইহা অতি সহজ কথা; সেই তিনটী লা-এর একটী লা দুই মাত্রার কালে, অর্থাৎ এক মাত্রার দ্বিগুণ কালে ও আর দুইটী লা এক এক মাত্রার কালে উচ্চারিত হইলে, চার মাত্রা পূর্ণ হয়; কিম্বা আরও

বিচিত্রতার জন্য কোন ভাগে চারি মাত্রায় চারি লা, অপর ভাগে দুই মাত্রা করিয়া দুই লা, ইত্যাদি কোন প্রকারে উচ্চারিত হইতে পারে। যথা,—

| ১´ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১´ ২ ৩ ৪ |
| লা — লা লা | লা লা লা — | লা লা লা লা | লা — লা — |

ঐ লা-এর পর কসি স্থানে আ উচ্চারণ করিবে, তাহা হইলে লাআ এই প্রকার উচ্চারণ হইয়া, লা দুই মাত্রা দীর্ঘ হইবে। স্বরলিপির ব্যবহৃত মাত্রার সংকেত যোগে উহা লিখিলে, এই রূপ হয় :—

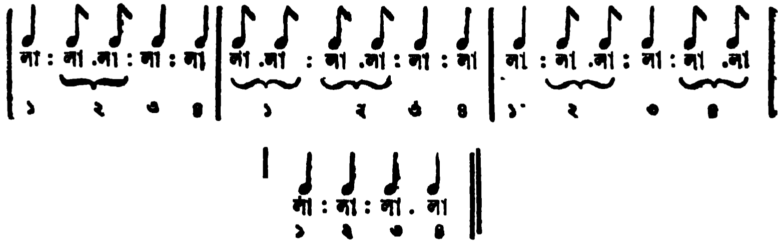
| লা : — : লা : লা | লা : লা : লা : — | লা : লা : লা : লা | লা : — : লা : — |
| ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ |

আবার ঐ ১৬ মাত্রায় যদি ১৬ অপেক্ষা অধিকতর বর্ণ উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে কোন দুইটী বর্ণ কোন এক মাত্রা কালের মধ্যে কাজেই লইতে হইবে; এবং এক মাত্রার মধ্যে যদি দুইটী বর্ণ সমকালে উচ্চারিত হয়, তাহার প্রত্যেকেতে অর্দ্ধ মাত্রা করিয়া লাগে,—ইহা বুঝিতে বোধ হয় কঠিন হইবে না। অর্দ্ধ মাত্রা এই রূপেই ব্যবহার হয়। মনে কর, যদি ২১টী লা ১৬ মাত্রার মধ্যে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সহজে ১৬ মাত্রায় ১৬ লা, ও বাকি ৫টী লা ঐ ১৬ লা-এর কোন পাঁচটীর সহিত তত্তৎ মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে, তাহা হইলেই ১৬ মাত্রা থাপিবে; যথা,

১´ ২ ৩ ৪ ১´ ২ ৩ ৪ ১´ ২ ৩ ৪ ১´ ২ ৩ ৪
লা লালা লা লা লালা লালা লা লা লা লালা লা লালা লা লা লা লা

মাত্রা তাররূপে ব্যবহার হইলে, ঐ রূপ যোড়া যোড়া কিম্বা যে কয়েকটীতে একটী

পূর্ণ মাত্রা হয়, ততটা ভিন্ন ব্যবহার হয় না। ঐ উদাহরণ স্বরলিপিতে লিখিলে এই রূপ হয়, যথা—



এইরূপে ছন্দ সকল গঠিত হইয়া থাকে। গানের অক্ষর সকল ঐ প্রকার নিয়মে নানা রূপে স্থায়ী হইয়া লঘু গুরু হয়; এবং ঐ রূপেই তালের ও ছন্দের মাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সঙ্গীত-ক্রিয়া-ব্যাপক কালকে তুল্য পরিমাণে বিভাগ করার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই: সঙ্গীত ক্রিয়া তুল্য কালে সম্পন্ন হইলে, একটী গীত কিম্বা গত্ আরব্ধ হইয়া, কিরূপ নিয়মানুসারে পর পর কার্য্য হইবে, শ্রোতা পূর্ব্বাহ্ণেই তাহার আভাষ পাইয়া প্রস্তুত থাকিতে পারেন; এবং সেই আভাষানুসারে শ্রোতার মনে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সঙ্গীত-শিল্পী তাহা যতদূর পূরণ করেন, শ্রোতা ততদূর পরিতৃপ্ত হন। তুল্য কাল হইলেই, শ্রোতা গানের কিম্বা গতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে পারেন, কেননা তুল্যতার নিয়ম একই রূপ ও অপরিবর্ত্তনীয়। অসমান কালের কোনই নিয়ম থাকে না; সেই জন্য 'কি যে হইবে' তাহাও জানা যায় না; এই কারণ বশতঃ তাল-হীন সঙ্গীত সম্পূর্ণ তৃপ্তিজনক হয় না। এই জন্য সকল যুগে ও সকল দেশেই সঙ্গীতের কাল তুল্য পরিমাণে বিভক্ত হইয়া ব্যবহার হইতেছে। যে কাজ করা যায়, তাহা যদি অপরে বুঝিতে পারে, তাহা হইলেই সেই কাজের আদর হয়; কেননা তদ্দ্বারা অন্যের মনাকর্ষণ হয়। অতএব তাহা বুঝিবার জন্যই শিক্ষা ও উপদেশের প্রয়োজন; এই হেতু সঙ্গীতে অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তি, অর্থাৎ সমজ্‌দার লোকে, অধিক রস পাইয়া থাকেন। সঙ্গীতে কালের যেমন তুল্যতা রক্ষার প্রয়োজন, ধ্বনিরও সেই রূপ একটী অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের প্রয়োজন; সেই জন্যই নাদসাগর হইতে সা রি গ ম প্রভৃতি এরূপ কয়েকটী নিয়মিত ধ্বনি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহাদিগকে চিনা যাইতে পারে। অনিয়মিত ধ্বনি ও কাল কখনই শিক্ষা হইতে পারে না। বুঝিবার অক্ষমতার ও অনভ্যাস বশতই বিদেশীয় কাব্য

ও সঙ্গীত ভাল লাগে না; কিন্তু তাহা শিক্ষা করিলে তাহাতে যথেষ্ট রস পাওয়া যায়। সেইরূপ, রাগর-াগিণী না বুঝিলে, খেয়াল ধ্রুপদের মজা পাওয়া যায় না।

ছন্দ :—সঙ্গীতের কালকে সর্ব্বদা এই ভাবে তুল্য বিভাগ করিলে, সঙ্গীত এক-ঘেয়ে হইয়া পড়ে, অতএব কাল-পরিমাণের অভিনবতা—বিচিত্রতার জন্য ছন্দের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক ছন্দে কালেরও তুল্যতা রক্ষা হয়; এবং স্বরসকল নানা প্রকার নিয়মানুসারে লঘু গুরু হইয়া, সঙ্গীতের কাল-ক্রিয়ার সুন্দর বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়। এই জন্য ছন্দ এত মনোহর। মাত্রার সমান পরিমাণানুসারে যে কোন নিয়মিত কার্য্য করা যায়, তাহাতেই এক প্রকার ছন্দ হয় বটে; কিন্তু ছন্দে আরও একটু বিশেষত্ব আছে; যথা :—

যে পরিমিত মাত্রাবিশিষ্ট রচনার মধ্যে কার্য্য সকল বারম্বার লঘু গুরু হইয়া, মধ্যে মধ্যে তাহা নিয়মিত অন্তরে প্রস্বনদ্বারা বিভাগ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'ছন্দ' কহে। নিম্নে নানাবিধ ছন্দের উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

পজ্ঝটিকা*। [মোহমুদ্গর।

মা কুরু ধনজনযৌবন গর্ব্বং; হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়ামযমিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

চৌপৌআ। [পিঙ্গল (প্রাকৃত)।

সম্ভু সীসহি গঙ্গা, গোরি অধঙ্গা, গিম পিন্ধিঅ ফণিহারা।
কণ্ঠে ট্ঠিঅ বীসা, পিন্ধন দীসা, সন্তারিঅ সংসারা॥

পংক্তি। [ছন্দঃকুসুম।

প্রেম যথা অধিকার করে, মান কি গৌরব তুচ্ছ তথা।
মানবশে হয় গর্ব্ব মনে; গর্ব্বিত বঞ্চিত সখ্য সুখে॥

মানবক। [ছন্দোমঞ্জরী।

আদি-গতং তুর্য্য-গতং, পঞ্চমকং চান্তগতং।
স্যাদ্গুরুচেৎ তৎকথিতং, মানবক ক্রীড়মিদং॥

* ছন্দ সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত কাব্যছন্দের উদাহরণ প্রদত্ত হইল, কেননা সঙ্গীতের ছন্দ, সুর যোগ ব্যতীত সামান্য বাক্যে উচ্চারিত হইলে, কাব্যছন্দের ন্যায়ই শুনায়। কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের তাল, এতদুভয়ের মূল নিয়ম একই প্রকার।

উপরে সংস্কৃত ছন্দের উদাহরণ অধিক করিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃত ছন্দ সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গলা ভাষায় পাওয়া যায় না। সংস্কৃতে ছন্দের পারিপাট্য, বিচিত্রতা ও মধুরতা যেরূপ অধিক এমন অন্য ভাষায় নাই এই জন্যই সংস্কৃত পদ্যের এত মাধুর্য্য।

রঁভনিরখ তমসবন্ধ ঘোরা রবি কিরণগন্ধ,
মাপিকর্ণাদি লম্ব বৃদ্ধি রহসনেব তামসী। (পিঙ্গল)

লঘুত্রিপদী। [সদ্ভাবশতক।

করিব বলিয়া, রহিলে বসিয়া করা কভু নাহি হয়।
করণীয় যাহা আশু কর তাহা, বিলম্ব উচিত নয়॥

হরিগীত। [পদ্যপাঠ।

শিখিবে কালে যাহা, থাকিবে চির তাহা।
অকালে বৃথা শ্রম, বালির বাঁধ সম॥

ভুজঙ্গপ্রয়াত। [অন্নদামঙ্গল।

মহা রুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।
বভম্ভম্ বভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥

সঙ্গীতের তালগুলি এক একটী ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ স্বরসমূহের নানাবিধ স্থায়িত্বের কাল সকলের মধ্যে পরস্পর আনুপাতিক সম্বন্ধ অর্থাৎ কেহ কাহার দ্বিগুণ বা অর্দ্ধ বা সিকি,—ইত্যাদি; ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই জন্য ছন্দ যেমনই কেন নূতন হউক না, একবার কতক সুর শুনিলেই তাহার নিয়ম বুঝা যায়। যে ছন্দ শীঘ্র বুঝা যায় না, তাহাতে অবশ্যই কোন দোষ থাকে। যে রূপ মাত্রা লইয়া ছন্দ গঠিত হয়, তাহা গানের অক্ষর সংখ্যানুরোধে নানা প্রকারে খণ্ডীকৃত হইলেও সাকল্যে পূর্ণ ভাবেই থাকে, অর্থাৎ ছন্দের মাত্রা সমষ্টি একটি পূর্ণ রাশি; কারণ তুল্য কালিক ক্রিয়া দ্বারা কালাত্মক রাশির বিভাগকল্পনাই ছন্দের মূল।

স্বরলিপিতে ছন্দের পদবিভাগ।

উপরে ছন্দের যে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহাদের মধ্যে তালি ও প্রস্থন স্থান নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে: (রেফ চিহ্নিত বর্ণ সমূহের উপর তালি ও প্রস্থন।) যথা—

১. র্মা কুরু র্ধনজনযৌ র্বন র্গর্ব্বং; হ্রতি নির্মেষাৎ র্কালঃ র্সর্ব্বং।

২. জয় সীসহি গঙ্গা, গৌরি অধঙ্গা, গিব পিন্ধিঅ ফণিহারা।

৩. প্রেম যথা অধিকার করে, মান কি গৌরব তুচ্ছ তথা।

৪. আদি-গতং তুর্য্য-গতং, পঞ্চমকলান্তর্গতং।

৫. রজনিরন্ধ তমসবন্ধ ঘোরা রবি কিরণগন্ধ,

৬. করিব বলিয়া রহিলে বসিয়া, করা কভু নাহি হয়।

৭. শিখিবে কালে যাহা, থাকিবে চির তাহা।

৮. মহা রুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

চারিটী প্রস্বনের ন্যূনে একটী ছন্দ কিম্বা তাল হইতে পারে না। ঐ প্রস্বন স্থানে করতালি কিম্বা কোন আঘাত দেওয়াকে তাল কিম্বা তালি দেওয়া কহে, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। ছন্দের মধ্যে প্রস্বন দুই প্রকার: প্রবল ও দুর্ব্বল। উপরে যে প্রস্বন দেখান হইল, তাহা প্রবল প্রস্বন; তদ্ব্যতীত অন্য স্থানে যে প্রস্বন, তাহা দুর্ব্বল প্রস্বন; তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। সঙ্গীতের স্বরলিপিতে প্রস্বন ও তালি পরিষ্কার রূপে প্রদর্শনার্থ, সাংকেতিক ও সার্গম, উভয় স্বরলিপিতে, প্রত্যেক ছন্দকে প্রস্বনানুসারে ছেদদ্বারা বিভাগ করা হয়; তাহা করিলে, বর্ণের উপর প্রস্বন-সূচক আর কোন চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ছেদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণে প্রস্বন, এরূপ বুঝিতে হইবে; যথা,—

মা | কুরু | ধন জন | যৌবন | গর্ব্বং

সাংকেতিক ও সার্গম, উভয় স্বরলিপির মাত্রা-চিহ্ন ও তালি বিভাগানুসারে, উক্ত ছন্দ কয়েকটীর তালি ও মাত্রা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

| মা : — | কু : রু | ধ : ন | জ : ন | যৌ :— | ব : ন | গ : — | র্ব্বং :— || ১

:অ : মু | ণী : — : স : হি | ণ : — : শা : | গো :—: রি : অ | ধ :—: মা :—

| থি : ম : পি :— | ত্তি : অ : ক : পি | হা :—: মা :— | : || ২

| প্রে :—: ম : ব | ধা :—: অ : ধি | কা :—: র : ক | রে :—: : || ৩

| আ :—: দি | ম : ভং :— | ভু :—: ধ্যা | প : ভং :— || ৪

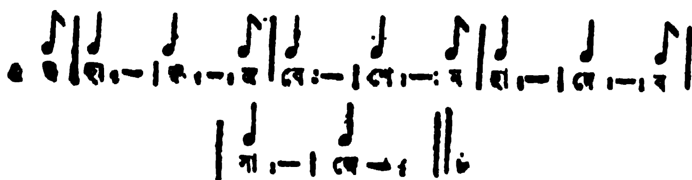
| য : অ : নি । র :—: ছ | ত : ম : স । ব : — : ছ | ঘো :—: রা । —: র : বি

| কি : র : ণ । গ :—: ছ || ৫

অ : রি : ব | ব : লি : যা | রূ : হি : লে | ব : সি : য়া | ক : রা : ক | ভু : না : হি

হ : ষ : | : : || ৬

শি : খি : বে | কা : লে | যা : হা | থা : কি : বে | চি : র | তা : হা || ৭



উক্ত বৃহৎ ছেদের পরবর্ত্তী বর্ণে প্রবল প্রস্বন, এবং ক্ষুদ্র ছেদের পরবর্ত্তী বর্ণে দুর্ব্বল প্রস্বন। দুইটি বৃহচ্ছেদের মধ্যবর্ত্তী অংশকে পদ অথবা গণ * বলা যায়। উক্ত ১ম ও ৩য় ছন্দের প্রত্যেক পদে চারি মাত্রা; তথায় মেচককে মাত্রা ধরা হইয়াছে। ২য় ছন্দের প্রত্যেক পদে আট মাত্রা; তথায় কৌণিককে মাত্রা ধরা হইয়াছে। ৪র্থ ছন্দের প্রত্যেক পদে তিন মাত্রা, ও মেচক তথায় মাত্রা। ৫ম ও ৬ষ্ঠ ছন্দের প্রত্যেক পদে ছয় মাত্রা, ও কৌণিক তথায় মাত্রা। ৭ম ছন্দের এক পদে তিন মাত্রা, তৎপর পদে চারি মাত্রা, এই রূপ দুই পদের আবর্ত্তন। ৮ম ছন্দের প্রতি পদে পাঁচ মাত্রা। প্রস্বনের অনুরোধে ২য় ও ৮ম ছন্দের শেষ পদের কতক অংশ প্রথম পদের পূর্ব্বে গিয়াছে। ছন্দোবিশেষে প্রায়ই এরূপ হয়; ইহা কিছুই অসঙ্গত নহে; কারণ ছন্দের বারম্বার আবৃত্তি হইলে, চক্রের ন্যায় তাহার পূর্ব্ব পরের নিশ্চয়তা থাকে না, এবং ঐ শেষ পদও ঐ রূপ খণ্ডীকৃত দেখায় না†। এই ছন্দকে 'বৃত্ত'ও বলে। উক্ত ক্ষুদ্র ছেদের স্থানে বৃহচ্ছেদ দিয়া, এক পদকে দুই পদ করিয়াও, লিখা যাইতে পারে, তাহাতে বরং শিক্ষার্থীবৃন্দের অভ্যাসের সুবিধা হয়। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কতক-

* গণ্যতে ইতি গণঃ, যাহা গণনা করা যায়, তাহাকে গণ বলে; অর্থাৎ এক, এক দুই, এক দুই তিন বা এক দুই তিন চার, ইত্যাদি গণনা ক্রমে যে মাত্রা সমূহ সম্বদ্ধ হইয়া ছন্দ গঠিত হয়, তাহাই গণ, যেমন এক-ক্রিয়া বা একমাত্রিক গণ, দ্বি-ক্রিয়া বা দ্বি-মাত্রিক গণ, ত্রি-ক্রিয়া বা ত্রিমাত্রিক গণ, চতুঃ-ক্রিয়া বা চতুর্মাত্রিক গণ, ইত্যাদি।

† এইরূপ যে কেন হয়, তাহার মূল তত্ত্ব এই,—ছন্দের সমাপ্তিকে আক্ষেপ রহিত ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য, কাব্যের কিম্বা সঙ্গীতের সকল ছন্দই প্রবলতর প্রস্বন বিশেষের উপর শেষ করা বিধি; অতএব যে ছন্দের গণগুলি অতি দীর্ঘ, যেমন আট মাত্রা বা ছয় মাত্রা, অর্থাৎ স্থূল কথায় চারি মাত্রার কম নয়, সেই ছন্দ ঐ সুদীর্ঘ গণের ১ম, বা ২য়, বা ৩য় মাত্রায় শেষ হইলে (কেননা তত দূর পর্যন্ত প্রস্বনের এলাকা) পুনরায় ছন্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে, উক্ত গণের বাকি মাত্রাগুলির কাল পূরণার্থ এত ক্ষণ বিরাম দিতে হয় যে তাহাতে বিরক্তি ধরে। এই জন্য অল্পক্ষণ বিরাম দিয়া, ঐ গণের শেষ হইতেই পুনর্ব্বার ছন্দ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা হয়, যেমন উল্লিখিত 'চৌপোআ' ছন্দে। উক্ত লঘুত্রিপদী ছন্দের শেষে অত বিরাম কতক বিরক্তিকর, এইজন্য সব শেষে আর দুইটী বর্ণ উচ্চারণ করা যাইতে পারে, যেমন "ওহে, করিব বলিয়া," ইত্যাদি; উক্ত পংক্তি ছন্দের শেষেও দুই নিস্তব্ধ মাত্রায় দুইটী লঘু বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে, এবং তাহা প্রচলিতও আছে, যেমন তোটক ছন্দ।

গুলি মাত্রা মিলিয়া একটী পদ বা গণ হয়; এবং সেই রূপ চারি পদে অর্থাৎ গণে, অথবা চারিটী প্রস্বনে একটী তাল হয়। সার্গম স্বরলিপিতে তালের যে যে স্থানে পর্দ্দবিভাগ হয়, তত্রত্য মাত্রা জ্ঞাপক কোলন চিহ্ন উঠাইয়া দিয়া, সেই স্থলে দাঁড়ি বসাইতে হয়; সুতরাং ঐ ছেদ তথায় কোলনের অর্থই প্রকাশ করে।

তালি ও ফাঁক:—উক্ত চারি পদ অথবা প্রস্বনকে সাধারণ কথায় তিন তালি ও এক ফাঁক* বলা যায়। কোন কোন তালে যে উহাপেক্ষা অধিক কিম্বা অল্প তালি ও ফাঁক দেওয়া যায়, তাহা কেবল সঙ্গীত ব্যবসায়ীদিগের স্বেচ্ছাধীন ব্যবহার; নতুবা ছন্দের মূল নিয়মে সকল তালকেই তিন তালি ও এক ফাঁকে বিভাগ করা যায়। যে তালের যে ছন্দ, তাহার একবার পূর্ণ আবৃত্তিকে তালের এক 'ফের' বা 'আওর্দ্দা' কহে। (আবৃত্তি শব্দের অপভ্রংশে 'আওর্দ্দা' হইয়াছে।) গীতাদিতে তালের এক এক ফের কোথায় পূর্ণ হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য তিন পদে তিন তালি, ও এক পদে ফাঁক দেওয়া হয়। তালের ঐ এক ফেরে কাব্যছন্দের এক চরণ হয়; উহারই চারি ফেরে যেমন একটি পূর্ণ ছন্দ হয়, তেমনি সেই চারি ফেরে ধ্রুপদের এক তুক অর্থাৎ কলি হয়। উক্ত এক এক পদের মধ্যগত মাত্রার সংখ্যা ভেদে তাল ভেদ হয়; এবং তালের মাত্রাসমষ্টি সমান হইলেও, পদ মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়ার লঘু-গুরুত্ব ভেদে, অর্থাৎ গীতের মাত্রাধার অক্ষরের লঘু-গুরুত্ব ভেদে, তালের ছন্দ ভেদ হইয়া থাকে।

ছন্দের প্রকার ও জাতি

কাব্যের ছন্দ যেমন দুই প্রকার,—বর্ণবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত, সঙ্গীতের ছন্দও সেই রূপ দুই প্রকার হইতে পারে। কিন্তু বর্ণবৃত্ত ছন্দ সঙ্গীতে অতিশয় একঘেয়ে হয় বলিয়া তাহা সচরাচর ব্যবহার হয় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দই সঙ্গীত কার্য্যের বিশেষ উপযোগী, এই জন্য সকল তালই মাত্রাবৃত্ত।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে হ্রস্ব স্বরে যে রূপ লঘু ও দীর্ঘ স্বরে গুরু উচ্চারণ হয়, সঙ্গীতে গানের বর্ণসকল প্রায়ই সে নিয়মের অধীন হয় না। সঙ্গীত-ছন্দের অনুরোধে হ্রস্ব স্বরও গুরু রূপে, ও দীর্ঘ স্বরও লঘু রূপে উচ্চারিত হইতে পারে। ব্যাকরণে ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্দ্ধমাত্রিক বলে বটে; কিন্তু কি কাব্যের কি সঙ্গীতের, কোন ছন্দই ব্যঞ্জন অর্থাৎ হসন্ত বর্ণ মাত্রা ও বর্ণ সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হয় না। ছন্দে হসন্ত বর্ণের কোন পৃথক মাত্রা নাই; উচ্চারণ সময়ে উহাতে কেবল জিহ্বা বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মাত্র। কাব্য ছন্দে উহা পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বরের গুরুতা সম্পাদন করে; ইহাতে

* ফাঁকের অর্থ ১৫শ পরিচ্ছেদের প্রথমেই দ্রষ্টব্য।

প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্যঞ্জন বর্ণের জন্য যদি কোন মাত্রা ধরিতে হয়, তাহা পূর্ণ, অর্দ্ধ নহে।

সঙ্গীতের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, অর্থাৎ তালসকল, প্রধানত তিন জাতি; যথা—১. চতুর্মাত্রিক তাল: যেমন কওয়ালী, আড়া, ঠুংরী ইত্যাদি; ২. ত্রিমাত্রিক তাল: যেমন একতালা, খেম্‌টা, ইত্যাদি; ৩. ঐ দুই জাতির তাল মিশ্রণে উৎপন্ন বিষমপদী তাল: যেমন যৎ, ঝাঁপতাল, ইত্যাদি; দ্বিমাত্রিক ও অষ্টমাত্রিক তাল চতুর্মাত্রিকেরই অন্তর্গত; এবং ষন্মাত্রিক তাল ত্রিমাত্রিকের অন্তর্গত। পর পরিচ্ছেদে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়ম লিপিবদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্ব-দর্শিত প্রথম তিনটি ছন্দ চতুর্মাত্রিক; ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ছন্দ ত্রিমাত্রিক; তৎপরে শেষ দুইটি ছন্দ বিষমপদী,—তাহার মধ্যে হরিগীত ছন্দ * যৎ কিম্বা তেওরার অনুরূপ এবং ভুজঙ্গপ্রয়াত ঝাঁপতালের অনুরূপ। ২ম, ২য়, ও ৫ম, এই তিনটী ছন্দ মাত্রাবৃত্ত; অবশিষ্ট ছন্দগুলি বর্ণবৃত্ত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কালের সমান পরিমাণের নাম লয়; সেই লয়ই ছন্দের জীবন; অতএব ছন্দের মাত্রাকে যতবার সমান দুই ভাগ করা যায়, তাহারও এক এক ভাগকে সেই ছন্দের মাত্রা বলা যাইতে পারে, কারণ তাহাতে লয়ের ব্যতিক্রম হয় না। এই হেতু চতুর্মাত্রিক ছন্দকে অষ্ট কিম্বা ষোড়শ মাত্রিকও বলা যায়, যেমন মনে কর, চতুর্মাত্রিক ছন্দের এই

| ♩ ♩ ♩ ♩ | চারি সেচকের স্থানে, এইরূপ | ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ |

আট কৌণিক প্রয়োগ হইতে পারে, তথায় কৌণিককে মাত্রা ধরিলে, উহা কাজেই অষ্টমাত্রিক হইয়া পড়ে। আবার ঐ আট কৌণিক স্থানে ১৬ দ্বিকৌণিক বসাইয়া, সেই দ্বিকৌণিককে মাত্রা ধরিলে, তখন তাহাকে কাজেই ষোডশমাত্রিক ছন্দ বলিতে হয়। আবার তাহারই বিলোমে (ইন্‌ভার্স্‌লী), চতুর্মাত্রিককে দ্বিমাত্রিক কিম্বা একমাত্রিকও বলা যাইতে পারে। সেইরূপ ত্রিমাত্রিক ছন্দকে ষন্মাত্রিক অথবা দ্বাদশমাত্রিকও বলা যায়। কিন্তু সুবিধার জন্য কালের যে গরিষ্ঠ তুল্য বিভাগের উপর গানের অধিকাংশ অক্ষর পড়ে, সেই বিভাগানুযায়িক কালকেই মাত্রা রূপে গ্রহণ করা বিধি†।

---

* হরিগীত ছন্দ বর্ণবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত, দুই প্রকারই হয়; মাত্রাবৃত্ত যথা,—

"মহিষ মর্দ্দিনি, সিংহ নাদিনি, সিংহ বাহিনি চণ্ডিকে।
বিন্ধ্য বাসিনি, বিকট হাসিনি, যমমহিষ ভয় খণ্ডিকে॥"

† 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা' নামক গ্রন্থে ছন্দের এক অদ্ভুত ভ্রমাত্মক মত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ব্যাকরণের দোহাই দিয়া, প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রের মত উল্টাইতে বৃথা যত্ন পাইয়াছেন অর্থাৎ ব্যাকরণের মতে ব্যঞ্জন বর্ণ অর্দ্ধমাত্রিক বলিয়া, তিনি ছন্দের মধ্যে সংযুক্তাক্ষরে পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বরকে গুরু উচ্চারণ জন্য দুই মাত্রিক বলিতে চাহেন না; তাহাকে দেড় মাত্রিক, এবং দীর্ঘ স্বরকে আড়াই মাত্রিক বলিতে উপদেশ করিয়াছেন। ইহা যে বৃহৎ ভ্রান্তি, তাহা ছান্দসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ঠেকা:—গীতাদিতে তালের ছন্দ ও লয় বিশুদ্ধ হইতেছে কি না, তাহার প্রমাণ ও শাসনার্থ, বাঁয়া মৃদঙ্গাদি যন্ত্রে লঘু গুরু আঘাত পরম্পরা দ্বারা তালের ছন্দটী গানের সহিত বাদন করার রীতি ভারতীয় সঙ্গীতে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত; ইহাকেই

তাঁহার ঐ মতে একই ছন্দের সকল চরণে মাত্রাসমষ্টির যে সমতা থাকে না, তাহাও তিনি একবার মনে করেন না। বোধ হয় তাঁহার এরূপ সংস্কার যে, ছন্দের সকল চরণে মাত্রাসমষ্টি সমান থাকার প্রযোজন নাই। উক্ত গ্রন্থকার কেবল দুই মাত্রা কালকেই গুরু বলেন না; এক মাত্রার অধিক হইলেই গুরু; তাহা সওয়া, দেড়, পৌনে দুই, আড়াই প্রভৃতি মাত্রাও হইতে পারে, এইরূপ লিখিযাছেন। ইহাকেই বলে যথেচ্ছাচার। সর্ব্বপ্রধান ছন্দোগ্রন্থ 'পিঙ্গল' প্রণেতা বলিতেছেন, "স গুরু বক্র দ্বিমত্তো" অর্থাৎ গুরু সংজ্ঞা বক্র রেখাদ্বারা সঙ্কেতিত এবং তাহা 'দ্বিমত্তো', অর্থাৎ দুই মাত্রা কাল ব্যাপিযা তাহার উচ্চারণ থাকিবে। ছন্দোমঞ্জরীরও সেই মত। এ বিষযে লক্ষ লক্ষ প্রমাণ আছে। অতএব ছন্দ শাস্ত্রকর্ত্তারা লঘু গুরুর যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা অতীব ন্যাযসঙ্গত ও স্বভাবানুমোদিত; তাহার অন্যথাচরণ করা অবিবেকতা বা অজ্ঞতার ফল। যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার ছন্দোলঙ্কার প্রস্তাব মধ্যে গ্রন্থকার সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থের কতকগুলি বর্ণবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ, উদাহরণসহ লিপিবদ্ধ করিযা সকলেতেই কাওযালীর তাল প্রযোগ করিযাছেন, সুতরাং তাহা অনেক স্থলেই অসঙ্গত হইযাছে; কেননা সকল ছন্দের মাত্রা সমষ্টি কাওয়ালীর ন্যায় আট মাত্রা নহে। এই হেতু অনেক ছন্দেই কাওযালীর তিন তালি এক ফাঁক যোগ করিতে গিযা গোঁজা মিলন হইযাছে। তাহার এক দৃষ্টান্ত এই:—'সখি বলে সকরুণে, চল ধনী ধন দিতে", এই রূপ সতী ছন্দের চারি চরণে বিশ মাত্রা যাহা ৮-এর বিভাজ্য নহে, সুতরাং ইহাতে কাওযালীর ন্যায তাল যোগ করিয়া গ্রন্থকার শেষে মিলাইতে পারেন নাই, উহা ফাঁকে আরম্ভ করিযা, ১ম তালিতে শেষ করা হইয়াছে। ইহাতে কাওযালীর আড়াই ফের মাত্র হয়; আরও চারি মাত্রা যদি ঐ ছন্দে থাকিত, তাহা হইলে উহাতে কাওযালী তাল, প্রকৃষ্টরূপে না হউক, কতক সঙ্গত হইত, কেননা তখন তাহাতে কাওয়ালীর পুরা তিন ফের পাইত। উল্লিখিত সতী ছন্দ ঝাঁপতালের অবিকল অনুরূপ, উহাতে ঝাঁপতাল কিরূপ সুন্দর সঙ্গত হয তাহা দেখাই, যথা,—

২ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১
| স:খি | ব:লে:— | স:ক | রু:ণে:— | চ:ল | ধ:নী | ধ:ন | দি:তে:—‖

কোন কোন ছন্দের চারি চরণের মাত্রা সমষ্টি ৮-এর বিভাজ্য হইলেও কাওযালীর তাল তাহাতে সুসঙ্গত হইবে না। উক্ত গ্রন্থে বৃহতী ছন্দের যে উদাহরণটী দেওয়া হইয়াছে, যথা—"নটবর তরুণী বেশে, গদ গদ মন উল্লাসে।" ইহার দুই চরণে ২৪ মাত্রা থাকাতে, কাওয়ালীর পুরা তিন ফের উহাতে মিলিতে পারে। কিন্তু ঐ ছন্দের যে প্রকৃতি, তাহা উহার এক চরণেই প্রকাশ আছে, অপর তিন চরণ প্রথম চরণের পৌনরুক্তি মাত্র,—ছন্দ মাত্রেই এই নিযম। কাওয়ালীর ছন্দ উহা হইতে অনেক পৃথক, কাওয়ালীর মাত্রা-সমষ্টি আট, আর ঐ বৃহতীর মাত্রা সমষ্টি বার। বৃহতী ছন্দ চৌতাল কিম্বা একতালার অনুরূপ, যথা—

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| ন:ট | ব:র | ত:রু | ণী:— | বে:— | শে:—‖

কন্যা, মধুমতী, ও পংক্তি ছন্দের সহিত কাওযালীর সম্পূর্ণ মিল হয়। উক্ত গ্রন্থে ঐ প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বিস্তর। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, গ্রন্থকার সংস্কৃত কাব্যছন্দ সমূহের প্রসঙ্গ করিতে সেতার-শিক্ষা-বিধায়ক গ্রন্থ ভিন্ন আর উপযুক্ততর স্থান পান নাই।

"ঠেকা" দেওয়া বলে। ঐ সকল আঘাতের প্রস্বন, ও লঘু-গুরুত্বানুসারে তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী নাম কল্পনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যথা,—ধা তেটে ধিন তাক, তা দিং থুন না, ইত্যাদি। ইহাদিগকে ঠেকার 'বোল' কহে। প্রত্যেক তালের বোল পৃথক ; তাহা মুখস্থ করিয়া, প্রস্বনানুসারে যথাস্থানে হাতে তালি ও ফাঁক দিয়া উচ্চারণের অভ্যাস করিলে, তালের ছন্দ উত্তম শিক্ষা হয়। পর পরিচ্ছেদে ঠেকার বোল সহিত প্রচলিত তাল সমূহের ছন্দ প্রকটিত হইতেছে।

তালাঙ্ক :—৫ম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে, সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে মণ্ডল, বিশদ, মেচক, কৌণিক প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা সুরের বিভিন্ন স্থায়িত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ বর্ণ গুলির কোন একটী মাত্রা রূপে গৃহীত হইয়া ছন্দ লিখিত হয় ; এবং সচরাচর মেচক ও কৌণিক, এই দুই বর্ণই ছন্দোবিশেষে মাত্রা রূপে গৃহীত হইয়া থাকে, ইহা ৪৯ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত হইয়াছে। তালের অর্থাৎ ছন্দের প্রত্যেক পদে যত গুলি করিয়া মাত্রা থাকে তাহা সাংকেতিক স্বরলিপিতে কুঞ্চিকার পার্শ্বেই ভগ্নাংশ সদৃশ অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ থাকে ; তাহাকে "তালাঙ্ক" নামে কহা যায়। তদ্দ্বারা পদান্তর্গত মাত্রার সংখ্যা যেমন বুঝা যায়, তেমনই মেচক কিম্বা কৌণিক, কোন্ বর্ণটী মাত্রা রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও জানা যায়। সাঙ্কেতিক স্বরলিপির এই নিয়মটী অতীব চমৎকার ; একটী গানের কিম্বা গতের মধ্যে ছন্দের পরিবর্ত্তন হইলে, গায়ক কিম্বা বাদক তালাঙ্ক দৃষ্টে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে পারে। সার্গম স্বরলিপিতে ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারটী অত সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। ঐ তালাঙ্ক কি রূপে গঠিত হয় ও বুঝিতে হয় তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে :—

মণ্ডল যেমন সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম, উহাকে ১-এর ন্যায় পূর্ণ রাশিবৎ স্থিরতর রাখিয়া, অপরাপর বর্ণকে উহারই ভগ্নাংশ রূপে ব্যক্ত করা যায় ; যেমন বিশদকে $\frac{১}{২}$, মেচককে $\frac{১}{৪}$, কৌণিককে $\frac{১}{৮}$, এই প্রকার ভগ্নাংশে লিখা যায়। ঐ ভগ্নাংশই তালাঙ্ক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তালের প্রত্যেক পদে যতটি মাত্রা হয়, তাহার সংখ্যা ঐ ভগ্নাংশের উপর স্থানে থাকে ; এবং স্থায়িত্ব জ্ঞাপক যে বর্ণটি মাত্রা রূপে গৃহীত হয়, তাহা মণ্ডলের যত অংশ, সেই অঙ্কটি ঐ ভগ্নাংশের নিম্ন স্থানে থাকে ; যথা :—যে তালের প্রত্যেক পদে চারি মাত্রা, তাহার তালাঙ্কের উপরিস্থ অঙ্ক ৪ হইবে, এবং সেই তালে যদি মেচককে মাত্রা রূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ তালাঙ্কের নিম্নস্থ অঙ্কও ৪ হইবে, কেননা মেচক মণ্ডলের চতুর্থাংশ ; অতএব ঐ তালাঙ্কটী $\frac{৪}{৪}$ হইবে। যে তালের প্রত্যেক পদে তিন মাত্রা, ও সেই মাত্রা যদি কৌণিক দিয়া লিখা যায়, তাহার তালাঙ্ক $\frac{৩}{৮}$

হইবে। এই প্রকার নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন তালের অঙ্ক বিভিন্ন অঙ্ক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা নিম্নে—

চতুর্মাত্রিক ছন্দের তালাঙ্ক { $\frac{৪}{৪}$=(মণ্ডলের ৪টী সিকি) অর্থাৎ প্রতিপদে ৪ মাত্রার প্রত্যেকে মেচক।
$\frac{৪}{৮}$=(মণ্ডলের ৪টী অষ্টমাংশ) অর্থাৎ প্রতিপদে ৪ মাত্রার প্রত্যেকে কোঃ।

দ্বিমাত্রিক ছন্দের { $\frac{২}{২}$=(মণ্ডলের ২টী অর্দ্ধ) অর্থাৎ প্রতিপদে ২ মাত্রার প্রত্যেকে বিশদ।
$\frac{২}{৪}$=(মণ্ডলের ২টী সিকি) অর্থাৎ প্রতিপদে ২ মাত্রার প্রত্যেকে মেচক।

ত্রিমাত্রিক ছন্দের { $\frac{৩}{৪}$=(মণ্ডলের ৩টী সিকি) অর্থাৎ প্রতিপদে ৩ মাত্রার প্রত্যেকে মেচক।
$\frac{৩}{৮}$=(মণ্ডলের ৩টী অষ্টমাংশ) অর্থাৎ প্রতিপদে ৩ মাত্রার প্রত্যেকে কৌণিক।

বিষমপদী ছন্দের তালাঙ্ক দুইটী, কখন তিনটীও হইতে পারে। কারণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন পদে মাত্রার সংখ্যা বিভিন্ন। এই হেতু কোন তালের অঙ্ক $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{২}{৪}$; কোন তালের $\frac{২}{৮}$ ও $\frac{৩}{৮}$; কোন তালের $\frac{৩}{৮}$ ও $\frac{৪}{৮}$; কোন তালের $\frac{২}{৮}$, $\frac{৩}{৮}$ ও $\frac{৪}{৮}$; ইত্যাদি। কোন্ কোন্ তালের কি কি তালাঙ্ক, তাহা পর পরিচ্ছেদে লিখিত হইতেছে।

যতি :—ছন্দের মধ্যে জিহ্বার বিরামার্থ, অথবা শ্বাস গ্রহণার্থ, যে বিচ্ছেদের স্থান থাকে, তাহাকে ছান্দসিকগণ 'যতি' নামে কহেন*। ছন্দের যেখানে সেখানে বিশ্রাম লওয়া যাইতে পারে না, তাহা হইলে ছন্দ ভঙ্গ হইয়া যায়। সামান্যতঃ যতির নিয়ম এই :—মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যে কয়েকটী মাত্রা, ও বর্ণবৃত্তের যে কয়েকটী বর্ণ, যে ছন্দের গণ, তাহাদের পরই যতির স্থান। সংস্কৃত-ছন্দোবিদ্‌গণ বলেন যে, যতি দ্বারা ছন্দের লয় রক্ষা হয় †। সুতরাং ছন্দের যথা তথা যতি হইতে পারে না, তাহা হইলে লয় ভঙ্গ হয় ; এইজন্য ছন্দের গণে গণে যতির স্থান হওয়াই উৎকৃষ্ট নিয়ম। যেমন :—পজ্ঝটিকা ছন্দে প্রতি চারি মাত্রার পরে যতি ; অনুষ্টুপে, মানবকে, চারি অক্ষরের পর ; তোটকে, ভুজঙ্গপ্রয়াতে, তিন তিন অক্ষরে ; পয়ারে চারি অক্ষরে ও শেষে দুই অক্ষরে, ইত্যাদি। কিন্তু ছন্দের প্রত্যেক চরণের শেষেই যতির প্রধান স্থান। একটী দীর্ঘ স্বর না হইলে জিহ্বার বিশ্রামের স্থান হয় না। এই জন্য সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় ভাল ভাল ছন্দে প্রত্যেক চরণান্তে একটী দীর্ঘ স্বর সর্ব্বদাই ব্যবহার হয় ; কোথাও শব্দানুরোধে হ্রস্ব স্বর

---

* "যতির্জ্জিহ্বেষ্ট বিশ্রাম স্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদ বিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।" (ছন্দোগোবিন্দ।)

† "লয় প্রবৃত্তি নিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে।" (সোমেশ্বর।)

থাকিলেও, তাহা যতির জন্ত দীর্ঘ রূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। নিয়ে একটী সামান্ত বাঙ্গলা শ্লোক দ্বারা পাদান্তে গুরু উচ্চারণের তাৎপর্য্য দেখাইতেছি ;—

"মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল।"

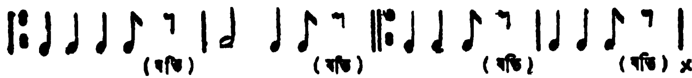
ঐ ছন্দটী তিন তিন মাত্রানুসারে গণবদ্ধ হইয়া রচিত, ইহা সহজেই বুঝা যায় ; অর্থাৎ 'মালতী' এই তিনটী অক্ষর তিন মাত্রায় উচ্চারিত ; উহাতে ত্রিমাত্রিক গণ চারিবার উচ্চারিত হইয়া এক চরণ পূর্ণ হইয়াছে। ঐ মা-এ কিম্বা তী-এ দীর্ঘ স্বর আছে বলিয়া গুরূচ্চারণ হইবে না *। পরন্ত শেষে 'ফুল', এই শব্দটী তিন মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘোচ্চারিত হইবে, নতুবা লয় রক্ষা হইবে না। প্রকৃত যতির জন্য, অর্থাৎ জিহ্বার বিশ্রাম জন্য, পাদান্তে তিনটী অক্ষরে তিন মাত্রা না হইয়া, একটী অক্ষরে তিন মাত্রা হইয়াছে (ল-টী হসন্ত জন্য বর্ণ সংখ্যার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে)। ঐ ফুল স্থানে যদি 'কুসুম', এই রূপ তিনাক্ষরিক শব্দ দেওয়া যায়, যথা—'মালতী মালতী মালতী কুসুম,' তাহা হইলে উচ্চারণ অতীব একঘেয়ে হইয়া যায়, এবং জিহ্বা তথায় বিশ্রামেরও সময় পায় না। ফুল্ শব্দ থাকাতে ছন্দের গতি কেমন বিচিত্র হইয়াছে ; বালকেও ঐ ছন্দ পছন্দ করে। ঐ রূপ পাদান্তে গুরু উচ্চারণ বিশিষ্ট ছন্দই যথার্থ ছন্দ, ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। এই জন্য ঘটী যন্ত্রের টক্‌টকী শব্দ সমমাত্রিক হইলেও, তাহাকে প্রকৃত ছন্দ বলা যায় না, কেননা তাহাতে ঐ প্রকার যতি-বিশ্রাম নাই †।

সঙ্গীতের তালে যতি দিতে হইলে, তাহার নিয়ম এই হইতে পারে যে, যে কয়েকটী মাত্রা গণবদ্ধ হইয়া তাল গ্রথিত হয়, তাহাদের পরেই যতির স্থান ; যেমন চতুর্মাত্রিক তালে চারি মাত্রার পর ; ত্রিমাত্রিক তালে তিন মাত্রার পর ; পঞ্চমাত্রিক তালে পাঁচ মাত্রার পর ; ইত্যাদি। যথা ;—

---

* বাঙ্গালা ছন্দমাত্রেরই নিয়ম এই যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ সকল বর্ণই এক এক মাত্রায় উচ্চারিত হয়। এই হেতু বাঙ্গলা ছন্দ সকল প্রায়ই নিস্তেজ, বিচিত্রতা হীন ও একঘেযে।

† ডাক্তার সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়কৃত যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকাতে যতির যে ব্যাখ্যা হইযাছে, তাহা অর্থশূন্য ও অসঙ্গত। যথা—"প্রবৃত্তিসূচক নিয়মানুযায়িক ছন্দোগত বিশ্রাম বিশেষের দ্বারা কোন তাল বিশেষের লযের অন্য তাল বিশেষের সহিত যাহা কিছু বিভেদ দেখা যায়, তাহার নাম যতি।" ঐ গ্রন্থের প্রথম মুদ্রাঙ্কণের ৩৮ পৃষ্ঠায় যতির এক আশ্চর্য্য উদাহরণও দৃষ্ট হয়, ঢিমাতেতালার (শ্লথ ত্রিতালীর) প্রত্যেক পদে যেটী দুর্ব্বল প্রস্বন, তাহাকেই যতি বলা হইযাছে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদের তৃতীয মাত্রার উপর যতি দেখান হইয়াছে। বিশুদ্ধ নিয়মানুসারে ঢিমাতেতালার প্রত্যেক চারি মাত্রার পরই যতির স্থান।



স্বরলিপিতে তালের প্রত্যেক পদ যেমন প্রস্বনে আরম্ভ হয়, তেমনি যতিতে শেষ হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতে গণে গণে যতি দেওয়ার রীতি নাই, এবং তাহা হইতেও পারে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ছন্দের প্রধান সামগ্রী প্রস্বন; তদ্দ্বারা ছন্দের রূপ ও লয় উভয়ই সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ছন্দবিদ্‌গণ প্রস্বন অর্থে কোন সংজ্ঞা ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু একটা কিছু না হইলেও ছন্দের রূপ ও লয় সুপ্রকাশিত হয় না, এই হেতু, ঐ কার্য্য সমাধার্থ, তাঁহারা যতি বিরামের নিয়ম করিয়াছেন। পরন্তু অবিচ্ছেদ লয়ে পঠিত বা গীত ছন্দের আবৃত্তির মধ্যে গণে গণে বিরাম দেওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক কার্য্য নহে; তাহাতে বরং রচনার অর্থ বিকৃত হইয়া যায়, কিন্তু প্রস্বনে তাহা হয় না। কেবল যতিদ্বারা ছন্দের রূপ ও লয় দেখাইতে যাইলেও, প্রস্বন সহজে আপনিই আসিয়া পড়ে, ছন্দের রূপ লয় বিকাশের সহিত প্রস্বনের সম্বন্ধ অলঙ্ঘ্য ও অপরিহার্য্য। কাব্যছন্দে ও সঙ্গীতের তালে, সকলেতেই, প্রস্বন অতি উপযোগী।

সঙ্গীতে জিহ্বার বিশ্রামার্থ ছন্দের বিচ্ছেদকে যতি বলা যায় না; তাহাকে 'ন্যাস'* বলে, যাহার ইংরাজী নাম 'কেডেন্স'—অর্থাৎ ছন্দের নিবৃত্তি। ঐ ন্যাস পূর্ণ, অপূর্ণ ভেদে চারি প্রকার; যেমন এক ছন্দের শেষ হইলে অপন্যাস, দুই ছন্দের শেষ হইলে সংন্যাস, তিন ছন্দের শেষে বিন্যাস, এবং যেখানে সুরের ও তালেরও শেষ, এবং ছন্দের ও পদ্যের ও শেষ, তথায় পূর্ণন্যাস বলা যায়। যথা,—

আদিগতং তুর্য্যগতং, পঞ্চমকং চান্তগতং।
(অপন্যাস) (সংন্যাস)
স্যাদ্‌গুরুচেৎ তৎ কথিতং, মানবকক্রীড়মিদং॥
(বিন্যাস) (পূর্ণন্যাস)

কিম্বা ঐ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত করতঃ, একটু বিচিত্র করিয়া, সঙ্গীতের প্রকৃতিতে পরিণত করিলে এই রূপ হয়;—

| না :— : না | না : না :— | না :— : না | না : না :— |

(অপন্যাস)

---

* "ন্যস্তে—স্থাপ্যতে যস্মিন্ যেন বা গীতমিতি ন্যাসঃ।" (সঙ্গীত-রত্নাকর টীকা।)

—না :— : না | না :—: না | না : না : না | না :— :— |

(সংন্যাস)

| না :— : না | না : না :— | না : না :— না | না : না :— |

(বিন্যাস)

| না : না : না | না : না : না | না :— : – | না : :

(পূর্ণন্যাস)

উক্ত পূর্ণ ন্যাসের স্থানে ছন্দের সমাপ্তি অতীব স্বাভাবিক, অর্থাৎ ঐ স্থানে ছন্দের আকাঙ্ক্ষা একেবারে মিটিয়া যায়; কারণ তথায় পদ্যও শেষ হয়, এবং ছন্দও শেষ হয়। ঐ রূপ নিয়মের ছন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; উহাতে বাঁয়া আদির ঠেকা কিম্বা তালি না দিলেও, উহার রূপ ও লয়, এবং আরম্ভ ও শেষ আপনিই বুঝা যায়। পরন্তু ঐ প্রকার ছন্দ-রচনা বিশেষ কৌশল সাপেক্ষ। আমাদের সঙ্গীতের প্রচলিত তালে ঐ রূপ ছন্দ ব্যবহার নাই; সুতরাং তাহাতে নানাবিধ ন্যাসেরও স্থান নাই; অতএব ঐ ন্যাস প্রচলিত সঙ্গীতের উপযোগী নহে। আমাদের প্রচলিত তালসমূহে প্রস্বন নিতান্ত অব্যক্ত জন্য, তালি না দিলে তাহাদের ছন্দ ও লয়, এবং আরম্ভ ও শেষ প্রকাশ পায় না; এই হেতুই গানে কিম্বা গতে বাঁয়া মৃদঙ্গাদির সঙ্গত প্রয়োজন হয়, কেননা তদ্ব্যতিরেকে তালের ছন্দ ও লয় পরিব্যক্ত হয় না।

আমাদের সঙ্গীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইলে তাহা আরও মনোহর হয়, সন্দেহ নাই। কেননা ঐ প্রকার ছন্দের জন্যই সংস্কৃত পদ্যের এত মাধুর্য্য। কিন্তু ঐ রূপ সঙ্গীত সহসা সাধারণের তৃপ্তিজনক হইবে না, কেন না লোকের এক প্রকার তাল ব্যবহার করা দৃঢ় অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; তাহা অপেক্ষা কোন নূতন নিয়মের তাল উৎকৃষ্টতর হইলেও, প্রথমত অস্বাভাবিক মত বোধ হইবে। সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা রচিত হইয়া, তাহা যেমন লোক-রঞ্জক হয় নাই, ঐ প্রকার ছন্দোযুক্ত সঙ্গীতেরও সেই অবস্থা প্রথমতঃ হইবে বটে; কিন্তু লোকের কিঞ্চিৎ অভ্যাস হইয়া তাহাতে রস বোধ হইলে, এবং তাহার সৌন্দর্য্য বুঝিলে, ক্রমেই যে তাহা ভাল লাগিবে, তাহার সন্দেহ নাই; কেননা সঙ্গীত ভিন্ন সামগ্রী। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কয়েকটী প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা পদ্য, গানে পরিণত করিয়া, তাহাতে ঐ প্রকার ছন্দে স্বর-যোজনা পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাতে পদ্যের ছন্দে সুরের ছন্দ কেমন সুন্দর মিলিত হইয়াছে। উহা গাইবার সময় কোন্ ঠেকার প্রয়োজন হইবে না; তাহাতে আপনিই লয় ও ছন্দ রক্ষা হইবে।

সম্ঃ—আধুনিক সঙ্গীতে যে স্থানে তালের বিশ্রাম হয়, তাহাকে "সম্" কহে। তালের যে চারিটী প্রস্বন থাকে, তাহারই একটী সম্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ সম্ই তালের এক মাত্র ন্যাস; সম্ ভিন্ন বিশ্রাম করা কিম্বা সমাপ্ত করার স্থানান্তর নাই। পর পরিচ্ছেদে তালের চারি প্রকার গ্রহের বিবরণ মধ্যে সময়ের মূল অর্থ দ্রষ্টব্য।

"সেতার শিক্ষা", "সঙ্গীত শিক্ষা" প্রভৃতি আমার পূর্ব্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এই ˆ চিহ্নকে সমের চিহ্ন বলিয়া যে উক্ত হইয়াছিল, তাহা সঙ্গত হয় নাই; কারণ ইউরোপীয় সঙ্গীতে উহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব এখন হইতে উহা সেই রূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইবে; তদনুসারে উহার নাম "বিরতি" রাখা গেল। উহা স্বরের শিরোদেশেই আদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং সেই স্বরের নিরূপিত স্থায়িত্বাপেক্ষা, সাধকের ইচ্ছামত, তাহা দীর্ঘতর রূপে স্থায়ী হইবে। ইহাতে ছন্দ ও তাল ভঙ্গ হইবে বটে, তাহাতে দোষ নাই; কারণ সেই স্থানে স্বরবিন্যাসের প্রকৃতিই ঐ প্রকার। প্রচলিত হিন্দুস্থানী সুরে ঐ 'বিরতি' চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় ভাগে ইউরোপীয় সুরে যে কয়েকটী বাঙ্গলা গান লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ঐ চিহ্ন পাওয়া যাইবে। অধুনা সমের জন্য অন্য প্রকার চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করা হইল; তাহা পর পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রচলিত তালগুলির সমাপ্তি স্থানে যে বিশ্রাম, তাহাও তত স্বাভাবিক নহে; কেননা গানের পদ্যের শেষে তালের সমাপ্তি আসিয়া মিলে না। যথা—

"ভালবাসি ব'লে কি হে আসিতে ভালবাস না।"

(ভালবাসিব—এই স্থানে সম্; ও তালের সমাপ্তি।)

এই হেতু ঐ সকল তালের রূপ ও লয় শিক্ষার্থীর শীঘ্র আয়ত্ত করা কঠিন হয়। তালের সমাপ্তি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য, ছন্দের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি জন্য, ঠেকার বোলে "তেহাই" ব্যবহার করার রীতি হইয়াছে; তেহাই-এর উপর গান ছাড়িলে, কতক পূর্ণ ন্যাসের ন্যায় তাল-ছন্দের পরিসমাপ্তি হয়। ঠেকার পরনের যে শেষ ভাগে এরূপ বোল ব্যবহার হয়, যাহাতে পর পর তিনটী সমকালিক প্রস্বন অতি প্রবল রূপে পড়ে, ও যাহার শেষ প্রস্বনটীতে সম্ দেওয়া হয়, তাহাকেই 'তেহাই' বলে। পর পরিচ্ছেদে চৌতালের বিবরণ মধ্যে ঠেকার পরনের শেষে তেহাই-এর উদাহরণ দ্রষ্টব্য। যে সকল গান সম্ হইতে উত্থাপিত হয়, তাহাতে তালের সমাপ্তি এক প্রকার পদ্যের শেষে পড়ে; কিন্তু সকল গানই সম্ হইতে আরম্ভ হয় না। তালের যে কোন স্থান হইতে গানারম্ভ হইতে পারে; কিন্তু সমই গানের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। এই সকলের উদাহরণ ২য় ভাগে গানের স্বরলিপিতে পাওয়া যাইবে।

সার্গম স্বরলিপিতে ছন্দসকল যে প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে, তাহার এক একটা সাদা ঠাট নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, যথা :—

চতুর্মাত্রিক ছন্দ। (অথবা)

| : : : | : : : | : | : | : | : |

দ্বিমাত্রিক ছন্দ। ত্রিমাত্রিক ছন্দ।

| : | : | : ‖ : : | : : | : : |

ষণ্মাত্রিক ছন্দ।

| : : | : : | : : | : : ‖

বিষম-পদী ছন্দ।

| : | : ‖ : : | : : : ‖

উক্ত উদাহরণে পুরা পুরা মাত্রারই সংকেত দেখান হইল। মাত্রা ভগ্ন হইলে অর্থাৎ অর্দ্ধ, সিকি প্রভৃতি মাত্রা লিখিতে হইলে, যে রূপ সংকেত ব্যবহার হয় তাহা ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে। এক্ষণে ছন্দের মধ্যে তাহাদের সমাবেশ কিরূপ তাহার উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

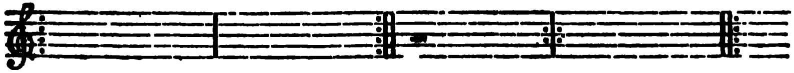
| . : : . : | , . , : : . , : | . |

১/২ ১/২ ১ ১/২ ১/২ ১ ১/৪ ১/৪ ১/৪ ১/৪ ১ ১/২ ১/৪ ১/৪ ১/৪ ১/৪ ১/২

সার্গম স্বরলিপিতে সুরের স্থায়িত্ব যথেষ্ট পরিষ্কার রূপে জ্ঞাপন জন্য, স্বরাক্ষরের পূর্ব্বে ও পরে, দুই দিকেই মাত্রা ব্যবহার হয়, যেমন : স : ইহা এক মাত্রা। : স. ইহা এক মাত্রার প্রথমার্দ্ধ। .স : ইহা মাত্রার দ্বিতীয় অর্দ্ধ। : স, ইহা এক মাত্রার প্রথম সিকি। ,স: ইহা এক মাত্রার চতুর্থ সিকি। : , স. স, : ইহা এক মাত্রার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিকি, ইত্যাদি।

স্বরলিপিতে পৌনরুক্তির সঙ্কেত।

১০ম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, গানের এক এক কলির মধ্যে তালের এক ফের হইতে চারি পাঁচ ফের পর্য্যন্ত থাকে। তালের প্রস্বর, অর্থাৎ তালি ও ফাঁক, অনুসারে গানের সুর সকল এক এক ছেদ দ্বারা বিভাগ করিয়া লিখিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। গানের কলির শেষ হইলে, তথায় দ্বিত্বছেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছন্দের অনুরোধে গানের কোন কোন অংশ দুই বার গাওয়ার প্রয়োজন হয়, সেই পৌনরুক্তির জন্য সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে উক্ত দ্বিত্বচ্ছেদের গাত্রে দুইটী কিম্বা চারিটী বিন্দু প্রয়োগ করা হয়। সেই বিন্দুই পৌনরুক্তির সঙ্কেত বুঝিতে হয়, দ্বিত্বচ্ছেদের যে দিকে বিন্দু থাকে, সেই দিক্‌কার অংশের পৌনরুক্তি বুঝিতে হয়, যথা :—



সার্গম স্বরলিপিতে পৌনরুক্তির জন্য ঐরূপ সঙ্কেত ব্যবহার হওয়ার সুবিধা নাই; ইহাতে "প্রথম হইতে", অথবা সাঁটে "প্রঃ হঃ", এই কথা লিখিয়া পৌনরুক্তির বিজ্ঞাপন হয়; যথা :—

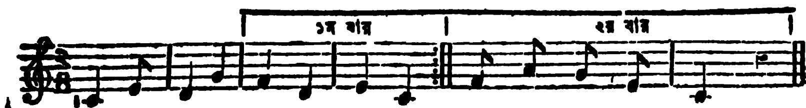
| স :- | গ :- | প :- | স১ :- | গ১ :- | স১ :- | প :- | গ :- ‖
প্রঃ হঃ

যে স্থানে দুই তিন কলির পর প্রথম কলির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়, তথায় এই :৪: চিহ্নটী দুই বার প্রয়োগ হয়; ইহার নাম "চিহ্নাৎ", অর্থ চিহ্ন হইতে, অর্থাৎ ঐ চিহ্নের নিকট আসিলে, পূর্ব্বে যেখানে ঐরূপ চিহ্ন ছাড়িয়া আসা হইয়াছে, তথা হইতে প্রথম দ্বিত্ব রেখা পর্য্যন্ত পুনরুক্তি, ও তথায় সমাপ্তি, বুঝিতে হইবে। যথা :—



সার্গম স্বরলিপিতে দ্বিত্বচ্ছেদের নিকট "চিহ্ন হইতে" কিম্বা সাঁটে "চ. হ." এইরূপ লিখা থাকিলে, ঐ প্রকার কার্য্যের প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। সার্গম স্বরলিপিতে চিহ্নাৎ অনেক বার যদি ব্যবহার হয়, তাহা হইলে কোন চিহ্ন হইতে পৌনরুক্তি, তাহা জ্ঞাপন জন্য 'প্র. চ. হ.' অর্থাৎ প্রথম চিহ্ন হইতে, কিম্বা, 'দ. চ.হ.' অর্থাৎ দ্বিতীয় চিহ্ন হইতে, এই প্রকার করিয়া লিখিতে হইবে।

ছন্দের মধ্যে এরূপও অনেক সময় হয় যে, পুনরাবৃত্তিতে ছন্দের ন্যাসের নিকট, দুই এক পদ পরিবর্ত্তিত রূপে গীত হয়; তথায় ছন্দের পর ঐ পরিবর্ত্তিত পদ কয়েকটী লিখিত হইয়া, তাহাদের উপরে এইরূপ [২য় বার], ও তাহারা যাহার পরিবর্ত্ত, তাহাদের উপরে [প্রথম বার], এই প্রকার সঙ্কেত প্রযুক্ত হয়; ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, প্রথম বারে যেমন আছে, তেমনি গাইয়া, পৌনরুক্তির সময় ঐ "১ম বার" অঙ্কিত পদ পরিত্যাগে, তৎস্থানে "২য় বার" চিহ্নিত পদ গাইতে হয়; যথা—



সার্গম স্বরলিপিতেও ঐ প্রকার সংকেত ব্যবহার হইতে পারে। পরন্তু ঐরূপ সংকেত ব্যবহার না করিয়া, পৌনরুক্তিতে যে প্রকার হইবে, তৎসহিত ছন্দটি প্রথম হইতে পুনর্ব্বার লিখিলেই ভাল হয়।

—•—

১৫শ পরিচ্ছেদ :—প্রচলিত তালসমূহের মাত্রা ও ছন্দ নির্ণয়।

চতুর্মাত্রিক জাতি।

যে সকল ছন্দে চারি মাত্রা অন্তরে প্রস্বন ও তালি দেওয়া যায়, অথবা যাহাদের প্রত্যেক তালির কালকে সমান চারি অংশে, কিম্বা ২-এর যে কোন শক্তিদ্বারা তুল্য বিভাগ করা যাইতে পারে, তাহাদিগকে 'চতুর্মাত্রিক তাল" কহে। ইহাদের সমগ্র মাত্রাসমষ্টি ষোল; এবং ইহাদিগকে চারি মাত্রা বিশিষ্ট সমান চারি পদে বিভাগ করতঃ, একটী পদে ফাঁক, ও অপর তিনটীতে তিনটী তালি দেওয়া যায় বলিয়া, ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'তেতালা' নামে কহা যায় *।

তালি ও ফাঁকের লিখন সংকেত এইরূপ :—এই (০) শূন্য ফাঁকের সঙ্কেত; এই (+) চিহ্ন সমের সঙ্কেত; এবং ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক দ্বারা স্থানানুসারে অন্যান্য তালির সংকেত বুঝিতে হইবে। ফাঁকের অর্থ এই যে, কোন প্রস্বনেতে তালি না দিয়া, যে অঙ্কটী উপরে থাকে, তাহা তৎকালে চিৎ করা, ইহাকেই ফাঁক দেওয়া বলে। অগ্রে ফাঁক, না তালি, তাহার নিশ্চয় নাই; তালির পর ফাঁকই স্বাভাবিক। যে সকল তালে তিন তালি ও এক ফাঁক, তাহাতে দ্বিতীয় তালির উপরই 'সম্'; এইটি সাধারণ নিয়ম। সংকেত যোগে তিন তালি এক ফাঁক

* সঙ্গীতসার ও যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার গ্রন্থকর্ত্তাগণ তেতালার সংস্কৃত "ত্রিতালী" বলিয়া এই তালকে ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে যে, পূর্ব্বকালে এই তাল ব্যবহার ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ত্রিতালী নামে কোন তালের উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। বাস্তবিক তেতালা সম্পূর্ণ আধুনিক তাল।

লিখিলে এইরূপ হয়, যথা—১+৩ ০। স্বরলিপিতে প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রায় ঐ সকল তালি চিহ্ন আদিষ্ট হয়। যে তালিতে সম হইবে, তাহার গণনীয় অঙ্কটী উহ্য থাকিবে; যেমন উল্লিখিত দ্বিতীয় তালিতে ২ না দিয়া, সম্‌চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে; ২ তথায় উহ্য আছে, এম্‌নিই বুঝা যায়। আবার ১ম তালিতে যদি সম্ হয়, তাহাতে ১ না দিয়া, সম্‌চিহ্নই দেওয়া হয়।

চতুর্মাত্রিক তালের চারি পদে মাত্রার সন্নিবেশ কিরূপ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই—১৬৪ ও ১৬৫ পৃষ্ঠায়—বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ষোল মাত্রায় তিন তালি ও এক ফাঁক প্রয়োগ করতঃ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে, যথা:—

১ + ৩ ০

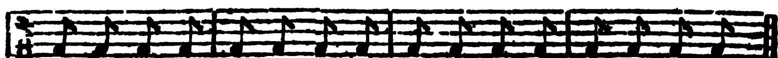
| ১—২—৩—৪ | ১—২—৩—৪ | ১—২—৩—৪ | ১—২—৩—৪ ||

উহারই এক একটী অঙ্ক এক মাত্রার প্রতিরূপ; এবং সেই মাত্রা দুই ভাগ, চারি ভাগ, আট ভাগ, এই রূপে ভাগ হইয়া ব্যবহৃত হইতে পারে।

কাওআলী, আড়াঠেকা, মধ্যমান, ঠুংরী, ছেপ্‌কা, কাহারবা, এই সকল তাল চতুর্মাত্রিক। ইহারা সকলে সমমাত্রিক হওয়াতে, ইহাদের এক তালের গানে অন্য তালের ঠেকা প্রয়োগ করিলে লয় ভঙ্গ হয় না; কিন্তু উত্থান, প্রস্বনের নিয়ম, ও পদান্তর্গত বর্ণনিচয়ের লঘু-গুরুতাভেদে উহারা পরস্পর হইতে অনেক ভিন্ন, এবং তাহাতেই উহাদের নিজ নিজ মূর্ত্তির পরিচয়। তাহা নিম্নে বিস্তারিত রূপে প্রকটিত হইতেছে।

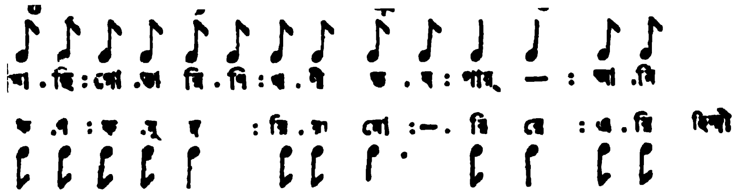
কাওআলী তাল।

তেতালার দ্রুত গতির নাম কাওআলী অথবা জলদ-তেতালা। ইহা হিন্দুস্থানের কাবাল জাতির নিকট হইতে গৃহীত হওয়াতেই, কাওয়ালী নামে উক্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাতে চারিটী অতি হ্রস্ব, কিম্বা দুইটী মাত্রাবিশিষ্ট চারিটী পদ থাকে, এবং প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রায় প্রস্বন ও তালি পড়ে; তন্মধ্যে সমের প্রস্বন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। দ্বিতীয় তালিতেই ইহার সম্। স্বরলিপিতে ইহা সচরাচর দুই দুই মাত্রার হিসাবে, পদ ভাগ করিয়া লিখা যায়; অতএব ইহার তালাঙ্ক $\frac{2}{4}$। ইহার ঠেকা যথা:—

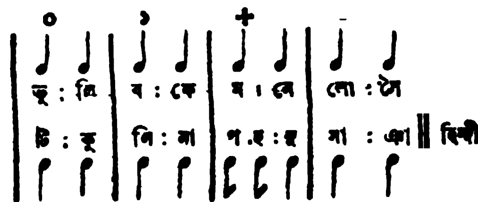


| ধা .ধিন্ : ধিন্ .ধা | ধা .ধিন্ : ধিন্ .ধা | ধা .তিন্ : তিন্ .তা | না .ধিন্ : ধিন্ .ধা |

ঐ ছন্দের যে কোন মাত্রা বা তালি হইতে কাওআলীর গান উত্থাপিত হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক সময়ে ফাঁক হইতেই গানের উত্থাপন দৃষ্ট হয়। কাওআলীর প্রত্যেক পদে অক্ষর সংখ্যার, ও তাহাদের লঘু গুরুত্বের, নিশ্চয়তা নাই। প্রতি পদান্তর্গত অক্ষরসমূহ যে কোন প্রকারে লঘু ও গুরু হইয়া, তাহাদের সমষ্টি-কাল চারিটী হ্রস্ব কিম্বা দুইটী দীর্ঘ মাত্রা পরিমিত হইলেই ঐ ছন্দের উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহার গানে একটী তালি হইতে তৎপরবর্ত্তী তালির কাল মধ্যে, অর্থাৎ কাওআলীর প্রত্যেক পদে, সচরাচর চারিটী লঘু বর্ণ, কিম্বা একটী গুরু ও দুইটী লঘু বর্ণ থাকে; এবং প্রায় সততই পদের প্রথম মাত্রায়, অর্থাৎ প্রস্বনের স্থানে, একটী বর্ণ থাকে। যথা :—



আর এক প্রকার দ্রুতগতি বিশিষ্ট কাওআলী ছন্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারও প্রায় প্রত্যেক পদে দুইটী দীর্ঘ বর্ণ থাকে। ইহাকে অনেকে "আদ্ধাকাওআলী" নামে কহে। যথা :—



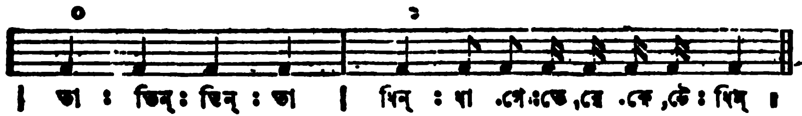
ঢিমা-তেতালা*।
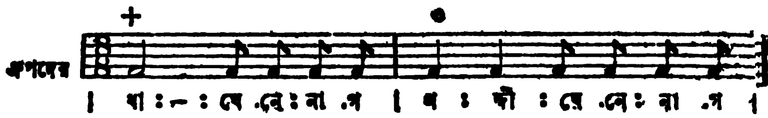
তেতালার বিলম্বিত গতিকে ঢিমা-তেতালা বা ঢিমা-কাওআলী কহে। ইহার সকলই কাওআলীর ন্যায়, কেবল গতিভেদ মাত্র। ইহার চারিটী পদের প্রত্যেকটিতে

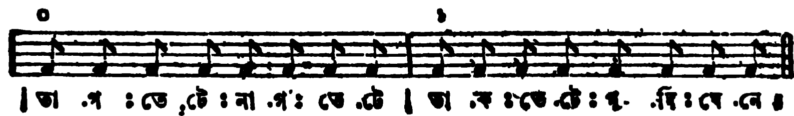
* কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন কালে এই তাল 'পটতাল' নামে ব্যবহার হইত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থে 'পট' নামক কোন তালের উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। আধুনিক কালাবৎগণ ধ্রুপদ গানে ঢিমা-তেতালাকে পটতাল বলিয়া উল্লেখ করেন।

চারিটী দীর্ঘ মাত্রা থাকে। সাংকেতিক স্বরলিপিতে ইহার তালাঙ্ক ৪/৪। খেয়াল ও ধ্রুপদ, উভয়বিধ গানেই ঢিমা-তেতালা ব্যবহার হয়। ইহার ঠেকা যথা :—









এই তালের গান ঠা-দূনে * গাওয়া যায়; কারণ ইহার প্রত্যেক তালিকে ২-এর শক্তিদ্বারা বিভক্ত করিলে, প্রবন ও বর্ণ সমূহ লয় অতিক্রম করে না। কিন্তু ধ্রুপদেও এই তালের গান ঠা-দূন করিয়া গাওয়ার রীতি দৃষ্ট হয় না। বিলম্বিত গতি হেতু ইহার এক ফেরের মধ্যে কাওআলীর দুই ফের সমাধা হয়। সেতারের মজিদ্‌খানি গতের তাল ঢিমা-তেতালা। গান যথা—



পট তাল :—ধ্রুপদে ঢিমা-তেতালার গতি অতিশয় ঢিমা হয় বলিয়া, লয় রক্ষা করা দুষ্কর হয়; অতএব লয় সহজ করার জন্য ইহার প্রত্যেক পদকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে তালি, অপর ভাগে ফাঁক দেওয়া হয়, অর্থাৎ ঢিমা-তেতালার প্রতি পদে যে চারি মাত্রা থাকে, তাহার প্রথম মাত্রায় তালি ও তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক দিলে, লয় অনেক সহজ হয়: ইহারই নাম পটতাল। সুতরাং পটতালের কেবল দুই পদ,—একটী তালি, ও একটী ফাঁক। যথা :—

* 'ঠা' স্থা ধাতুৎপন্ন তিষ্ঠ শব্দের বিকৃতি। ইহার অর্থ ধীর বা ঢিমা। 'দূন' দ্বিগুণ শব্দের বিকৃতি, পারিভাষিক অর্থ দ্বিগুণ দ্রুত। পরে 'লয়ের গতিভেদ' শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

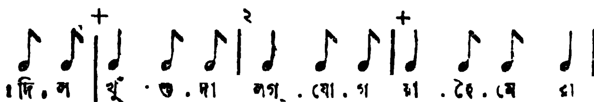
+
| ধা :— | ধে. নে : না .গ | গ : দী | ধে .নে : না .গ | ইত্যাদি।

ঠুংরী তাল।

এই তাল কাওআলীর প্রকার ভেদ মাত্র, অর্থাৎ ইহাতেও চারিটী হ্রস্ব মাত্রা অন্তরে প্রস্বন ও তালি পড়ে। কিন্তু কাওয়ালী অপেক্ষা ঠুংরীর গানে তোটক, মোদক, পজ্ঝটিকা, পদ্মাবতী, এই প্রকার কোন ছন্দের আভাব থাকে, যেমন লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর গান *। যে চতুর্মাত্রিক তালের গানের অক্ষর সকল বারম্বার এরূপে লঘু গুরু হয়, যাহাতে প্রত্যেক চারি মাত্রা অন্তরে স্বভাবত প্রবল রূপে প্রস্বন দিতে ইচ্ছা হয়, সেই প্রকার গানের সহিত কাওআলীর ঠেকায় প্রস্বনের প্রাবল্য সম্পাদিত না হওয়াতে, সেই ঠেকায় সমধিক প্রস্বন বিশিষ্ট যে বোল ব্যবহার হইয়াছে, তাহারই নাম ঠুংরী। উল্লিখিত কোন ছন্দের ন্যায় গানের গতি হইলেই, তাহা ঠুংরী তালের অন্তর্গত ; তদ্ব্যতীত অর্থাৎ প্রস্বনবিশিষ্ট ছন্দোবিহীন চতুর্মাত্রিক তালের গান কাওআলীর অন্তর্গত ; ঠুংরী হইতে কাওআলীর এই মাত্র প্রভেদ। কাওআলীতে সমের প্রস্বন ব্যতীত অন্যান্য তালির প্রস্বন অতি দুর্ব্বল ; ঠুংরীতে সকল প্রস্বনই বলবৎ হওয়াতে, মনে হয়, যেন সম্ শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইতেছে ; এই জন্য ঠুংরীতে এক তালির পরই, অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বিতীয় তালিতেই সম্ হয়। অতএব দুই তালিতেই ইহার ঠেকার ছন্দ পূর্ণ হওয়াতে, ইহা কাওআলীর অর্দ্ধ হইয়াছে। স্বরলিপিতে ঠুংরীতেও কাওআলীর ন্যায় প্রতি তালিতে দুইটী দীর্ঘ মাত্রা ধরা যায়, অতএব ইহারও তালাঙ্ক ২/৪। ঠেকা যথা :—

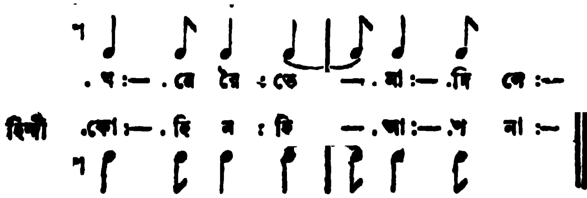


ঐ প্রথম ধা-এর উপরই সম্। এই তালের সকল স্থান হইতে গানারম্ভ হইতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর উর্দ্দূ গানটীর ছন্দ অবিকল তোটক :—



* যেমন 'শাহজাদে আলম তেরে লিয়ে', ইত্যাদি।
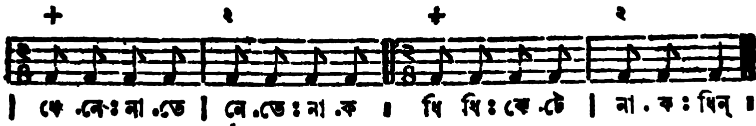
যদি ঠুংরীর গানের প্রত্যেক কলির প্রস্বন সংখ্যা ৪-এর বিভাজ্য হয়, তবে তিন তালি এক ফাঁক অনুসারে তাহাতে কাওআলীর ঠেকা দেওয়া যায়। ঠুংরী-তালীর অনেক গানের আস্থায়ীতে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, সমের প্রস্বনকে প্রবল করণার্থ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্বনের উপর কোন বর্ণ থাকে না। যথা :—



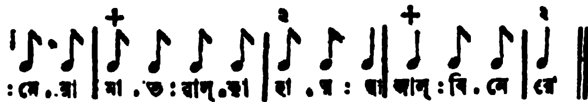
ছেপ্‌কা ও কাহারবা তাল।

ছেপ্‌কা ও কাহারবা তালের মাত্রা, প্রস্বন, ও পদ বিভাগ প্রভৃতি সকলই ঠুংরীর ন্যায়। ছেপ্‌কার ঠেকা কেবল নৃত্যেই ব্যবহার হয়। ইহাদের ঠেকা যথা :—

ছেপ্‌কা। কাহারবা।



রওআনী, কাহার প্রভৃতি জাতীয় লোকে যে চতুর্মাত্রিক ছন্দে সচরাচর গান করে, সেই ছন্দের নাম কাহারবা। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এই তাল প্রচলিত। ইহারও দুইটী মাত্র তালি, এবং উল্লিখিত প্রথম ধি-তে সম্*। ঠুংরী অপেক্ষাও ইহার গানের প্রস্বন সকল অধিক প্রবল; এবং প্রায় প্রত্যেক মাত্রায় বর্ণ ব্যবহার হওয়াতে মাত্রায় মাত্রায় তালি দিতে প্রবৃত্তি হয়। গান যথা :—



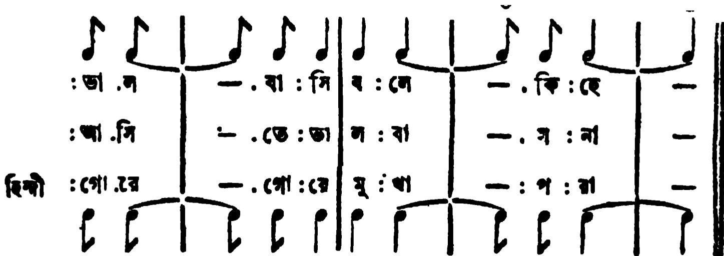
আড়াঠেকা তাল।

আড় অর্দ্ধ শব্দের বিকৃতি। অর্দ্ধ শব্দের অপভ্রংশে প্রথমে আড্ডাই, তৎপরে

---

* সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-রত্নাকর, ও মৃদঙ্গমঞ্জরীতে কাহারবাকে যে পাঁচ মাত্রার তাল বলা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অশুদ্ধ। তবলামালাতে কাহারবার মাত্রা নিরূপণ শুদ্ধ হইয়াছে।

আড়াই হয়; সেই আড়াই হইতে আড়া হইয়াছে। যেখানে দুই মাত্রা অনুসারে প্রস্বন ও তালি পড়িতেছে, সেই তালির স্থান অতিক্রম করিয়া, আড়াই মাত্রার পরে, পদের প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করাকেই আড়ে গাওয়া বলে; এবং তাহারই উল্টা অর্থাৎ অপ্রস্বনিত ধ্বনিতে তালি দেওয়াকে আড়ে তালি দেওয়া কহে। যে ছন্দের তালি বিভাগের উপরে গানের কোন অক্ষর থাকে না, এবং বাদ্যের বোলে ধা, ঘে প্রভৃতি মহাপ্রাণ* বর্ণের প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ যেখানে নিতান্ত প্রস্বনহীন বর্ণে তালি পড়ে, তাহাকেই আড় ছন্দ বলা যায়। যেখানে দুই মাত্রা ক্রমে প্রস্বন হইয়া পদ ভাগ হইতেছে, তথায় প্রত্যেক পদের প্রস্বন মাত্রা ত্যাগে দ্বিতীয় মাত্রায় তালি দিলে, তাহাকেও আড়ে তালি দেওয়া বলে। কাওআলীর গান আড় করিয়া গাওয়াতেই আড়াঠেকার উদ্ভব হইয়াছে; অতএব আড়ারও মাত্রাসমষ্টি ও তালাঙ্ক কাওআলীর ন্যায়, অর্থাৎ ইহা ১৬টী হ্রস্ব কিম্বা ৮টী দীর্ঘ মাত্রায় পূর্ণ। ঐ মাত্রাসমষ্টি সমান চারি তালিতে বিভক্ত হইয়া, প্রত্যেক তালির মধ্যে, ষোড়শাক্ষরিক পয়ার ছন্দের যে গান, তাহার প্রত্যেক অর্দ্ধভাগের দুই দুই অক্ষর উচ্চারিত হয়; কিন্তু উক্ত চারি তালির মধ্যে সমের মাত্রা ব্যতীত, অন্যান্য তালির মাত্রার উপর কোন অক্ষর উচ্চারিত হয় না; এইহেতু ইহার ছন্দ আড়, যথা:—



স্বরলিপিতে প্রতি পদে ঐ প্রকার দুইটী দীর্ঘ মাত্রা অনুসারে আড়াতাল লিখা যায়। পরন্তু ইহার ছন্দ আরও পরিষ্কার রূপে অন্বয় করার জন্য, উক্ত অর্দ্ধ মাত্রাকে এক মাত্রা রূপে লইয়া, প্রত্যেক ফেরে ষোলটী হ্রস্ব মাত্রা ধরিতে হয়; সুতরাং সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে ইহার তালাঙ্ক $\frac{8}{8}$ হওয়াই উচিত। আড়াতালের গানের বর্ণসমূহ যে রূপে প্রস্বনিত ও লঘু গুরু হইয়া, উক্ত ষোড়শ মাত্রার বন্ধন হয়, যদ্দ্বারা আড়া ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, তদনুসারে ইহা ছয়টী অসমান পদে বিভক্ত

* বর্গের চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। ঠেকার বোলে যে স্থানে প্রস্বনের আয়োজন, তথায় মহাপ্রাণ বর্ণই ব্যবহার হয়।

হইয়া থাকে ; প্রথম ও দ্বিতীয় পদে তিন তিন মাত্রা, এবং তৃতীয় পদে দুই মাত্রা ; শেষ তিনটী পদও ঐ রূপ। যথা :—

| ১—২—৩ | ১—২—৩ | ১—২ | ১—২—৩ | ১—২ ॥

উহার প্রথম দুই পদে বর্ণের প্রথমটী লঘু ও তৎপরটী গুরু, তৃতীয় পদে একটী গুরু বর্ণ, ইহাতেই সম্‌; চতুর্থ পদে একটী ত্রিমাত্র প্লুত বর্ণ; পঞ্চম পদে ১ম পদের ন্যায় দুইটী বর্ণ ; এবং ষষ্ঠ পদ বর্ণ শূন্য,—ইহাতে ফাঁক ; উদাহরণ নিম্নে। আড়ার ঠেকাতেও অবিকল ঐ রূপ ছন্দ। ফলত ইহার গানে প্রথম ভাগের ছন্দ হইতে দ্বিতীয় ভাগের ছন্দ যেমন পৃথক, ঠেকায় সে রূপ নহে ; ঠেকায় উভয় ভাগেরই ছন্দ অবিকল এক রূপ। যথা :—

গান	তা : ল :—	বা : সি :—	ব :—	লে :— ;—	কি : হে :—	— :—
	১— ২—৩	১— ২—৩	১—২	১—২—৩	১— ২—৩	১—২
ঠেকা	তা : ধিন্:—	তা : ধিন্:—	ধিন্ :—	তা :ধিন্:—	ধিন্ : তা :—	তিন্ :—

এই প্রকার মাত্রানুসারে প্রস্বন পড়াতে, আড়ার প্রথম উত্থাপন ভাগ শ্রবণ মাত্রেই পঞ্চমসওআরী বলিয়া ভ্রম হয়। উক্ত সম্‌ ও ফাঁক পদের প্রথম মাত্রায় প্রস্বন পড়িবে, এ প্রকারে ঐ ছন্দ তেতালার নিয়মে চারি মাত্রানুসারে বিভক্ত হইলে যে রূপ হয়, এবং ঠেকার বাদ্যে যে যে মাত্রায় প্রস্বন পড়ে, তাহা এই প্রকার, যথা :—

১ + ৩ ০

১—২´ | ৩—১—২´—৩ | ১—২—১—২´ | ৩—১—২´—৩ | ১´—২ ॥ অথবা

১ + ৩ ০

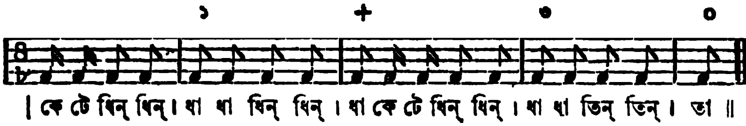
৩—৪´ | ১—২—৩´—৪ | ১´—২—৩—৪´ | ১—২—৩´—৪ | ১´—২ ॥

অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পদের ৩য় মাত্রায় প্রস্বন, এবং সম্‌ ও ফাঁকের পদে ১ম ও ৪র্থ মাত্রায় প্রস্বন। এই জন্য ঠেকার বোলে ঐ সকল প্রস্বনিত মাত্রায় মহাপ্রাণ বর্ণ 'ধ' ব্যবহার হইয়াছে। ঠেকা যথা :—

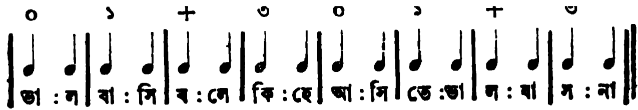
১ + ৩ ০

৪ তা : ধিন্ | — : তা : ধিন্ : — | ধিন্ :— : তা : ধিন্ | — : ধিন্ : তা :— | তিন্ :—॥

ঐ স্বরলিপিতে যে যোজক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই আড়ের পরিচয়। ছন্দের অনুরোধে ফাঁকের পদটী দুই ভাগ হইয়া, শেষার্দ্ধ ভাগ আদিতে পড়িয়াছে, অর্থাৎ ঐ স্থান হইতে—ফাঁক পদের ৩য় মাত্রা হইতে আড়ার ছন্দ উত্থাপিত হয়। উপরে প্রথমেই ঐ রূপ বিভাগানুসারে গানের ছন্দের উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। বাঁয়া আদির বাদ্যে বিচিত্রতার জন্য কখন কখন এরূপ বোলও ঠেকাতে ব্যবহার হয়, যাহাতে যোজক নাই, কেবল প্রস্বনের তারতম্যে ছন্দ রক্ষা হয়; যথা:—



উক্ত ধা-গুলিতে আসলে প্রস্বন হইবে না; ধা-একাবর্ত ধিন্ ধিন্-এতেই যথেষ্ট প্রস্বন দিতে হইবে। আড়া তালের গান কাওয়ালী তালে গাইতে হইলে, তাহার ছন্দ এইরূপ হইবে, যথা:—



এক্ষণে কাওআলী হইতে আড়ার বিভিন্নতা যে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে *।

মধ্যমান তাল

এই ছন্দ আড়ার দ্বিগুণ, অর্থাৎ মধ্যমানের এক ফের মধ্যে আড়া ছন্দের দুই ফের প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাওআলীর সহিত ঢিমা-তেতালার যে সম্বন্ধ, আড়ার সহিত মধ্যমানেরও সেই সম্বন্ধ। মধ্যমানের মাত্রাসমষ্টি—১৬টী দীর্ঘ, অথবা ৩২টী হ্রস্ব মাত্রা; যথা,—

---

* বাঙ্গলা সঙ্গীত-রত্নাকর, সঙ্গীতসার, কণ্ঠকৌমুদী, মৃদঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে আড়ার মাত্রাসমষ্টি নয় (৯) ধরা হইয়াছে; এবং সেই সমষ্টিকে সমান চারি তালিতে বিভক্ত করত, প্রত্যেক তালির পরিমাণ (২।·) সওয়া চারি মাত্রা স্থির করা হইয়াছে। ইহা এক বিষম ভ্রম। গ্রন্থকারগণ মাত্রা যে কি পদার্থ তাহা একেবারেই জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কাওআলী হইতে আড়ার যে ছন্দের প্রভেদ আছে, তাহা নিরূপণ করিতে না পারাতে, তাঁহারা উহাদের মাত্রাসমষ্টিতে বিভিন্নতা বোধ করিয়া, কাওআলী অপেক্ষা আড়ার প্রত্যেক তালিতে সিকি মাত্রা অধিক দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা যে নিতান্ত ভুল, তাহা উপরে আড়ার প্রকৃত ছন্দের ব্যাখ্যাতে বুঝা যাইবে। তবলামালা নামক পুস্তকে আড়াঠেকার উল্লেখই হয় নাই।

১—২´—৩—১—২´—৩ | ১´—২—১—২´—৩—১—২´—৩ |

| ১´—২—১—২´—৩—১—২´—৩ | ১´—২—১—২´—৩—১—২´—৩ | ১´—২ ॥

ইহার গানের ছন্দ উত্থান হইতে প্রথম আট মাত্রা পর্য্যন্ত প্রায় অবিকল আড়ার ন্যায়; কিন্তু আড়ার ন্যায় সপ্তম মাত্রায় মধ্যমানের সম্ না পড়িয়া, যে পঞ্চদশ মাত্রায় আড়ার ফাঁক, তথায় মধ্যমানের সম্। তেতালার নিয়মে ইহাকে সমান চারি পদে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে তিন তালি ও এক ফাঁক দেওয়া বিধি। ঐ ফাঁক পদের তৃতীয় মাত্রা হইতে উত্থাপন হয়; এবং ঠেকার বাদ্যে প্রত্যেক পদের ৪র্থ ও ৭ম মাত্রায় প্রস্বন পড়ে। উত্থাপন হইতে ক্রমান্বয়ে সপ্তম, ত্রয়োবিংশ ও একত্রিংশ মাত্রায় ইহার প্রথম ও তৃতীয় তালি এবং ফাঁক পড়ে। ইহাতে চারি তালির ভাগ ও প্রস্বন যথা:—

১

৩—৪´—৫—৬—৭´—৮ | ১—২—৩—৪´—৫—৬—৭´—৮

\+ ৩ •

| ১—২—৩—৪´—৫—৬—৭´—৮ | ১—২—৩—৪´—৫—৬—৭´—৮ | ১—২ ॥

সম্ ভিন্ন অন্যান্য তালির উপর প্রস্বন নাই। স্বরলিপিতে ইহা প্রত্যেক পদে আটটী হ্রস্ব মাত্রার হিসাবে লিখা যায়; ইহার তালাঙ্ক ৮/২। ইহার ঠেকা যথা:—

: ধা : ধিন্ :—: ধা : ধিন্ :— | ধা :—: ধা : ধিন্ :—: ধা : ধিন্ :— | ধা :—

৩—৪ ৫—৬—৭—৮ | ১—২—৩—৪—৫—৬—৭—৮ | ১—২—
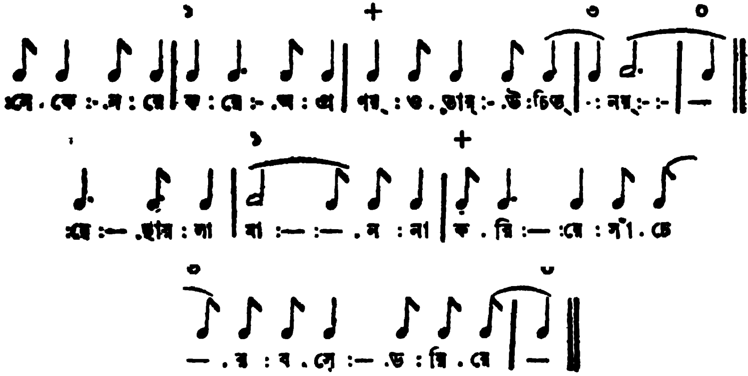
: ধা : ধিন্ :—: ধা : তিন্ :— | তা :—: না : ধিন্ :—: ধা : ধিন্ :— | ধা :—॥

৩—৪—৫—৬—৭—৮ | ১—২—৩— ৪—৫—৬—৭—৮ | ১—২ ॥

মধ্যমান ছন্দে প্রায়শই গানের বর্ণের লঘু গুরুত্বের নিশ্চয়তা নাই। ইহার সম্ ভিন্ন অন্যান্য তালির উপর প্রায়ই অক্ষর থাকে না; যদিও থাকে, তাহাতে প্রস্বন নাই; এই হেতু ছন্দ অতিশয় আড়। অনেক গানে, উত্থাপন হইতে সম্ পর্য্যন্ত, সমের অক্ষরটীর সহিত নয়টী বর্ণ থাকে; ইহাদের প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম বর্ণ লঘু; দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম ও নবম বর্ণ গুরু; এবং ষষ্ঠ বর্ণ প্লুত। আস্থায়ীতে এক ফেরের প্রথমার্দ্ধ ঐ রূপ; দ্বিতীয়ার্দ্ধে কয়েকটী বর্ণ, কাল পূরণার্থে যে কোন প্রকারে লঘু গুরু হওয়া ভিন্ন, কোন বিশেষ নিয়মে নিবদ্ধ নহে। অন্তরাতে প্রত্যেক ফেরের

পূর্ব্ব ও পরার্দ্ধ আস্থায়ীর প্রথমার্দ্ধের ন্যায়। আস্থায়ীতে সমের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী লঘু, তৎপরে একটী গুরু, এই রূপ দুই বর্ণ সততই থাকে; অন্তরাতে তাহা দেখা যায় না*। গান যথা:—

(সার্গম লিপিতে চারি মাত্রানুসারে বিভক্ত)



ত্রিমাত্রিক জাতি।

দুই-এর শক্তিদ্বারা ৩-কে ঘাতিত করিয়া তদ্দ্বারা কালের বিভাগ কল্পনাকে ত্রিমাত্রিক ছন্দ কহে; অর্থাৎ যে সকল ছন্দে তিন তিন মাত্রা অন্তরে প্রস্বন ও তালি পড়ে, অথবা যে ছন্দের প্রত্যেক তালি সমান তিন অংশে বিভক্ত হয়, সমান দুই অংশে বিভক্ত হইতে পারে না, তাহাকে ত্রিমাত্রিক তাল কহে। ইহাদের মাত্রাসমষ্টি বার, কিম্বা ছয়, কিম্বা চব্বিশ। ত্রিমাত্রিক তালে মাত্রার বিন্যাস যথা:—

| ১́—২—৩ | ১́—২—৩ | ১́—২—৩ | ১́—২—৩ ॥

ঐ চারি পদের তিনটীতে তিন তালি, ও একটীতে ফাঁক দেওয়া যায়। খেম্‌টা, আড়্‌খেম্‌টা, একতালা, ভরৃতজা, দাদ্‌রা, ইহারা ত্রিমাত্রিক তাল। এই সকল তাল সমমাত্রিক হইলেও, উত্থান, প্রস্বনের নিয়ম, ও পদমধ্যগত বর্ণ সমূহের লঘু-গুরুতা

* সঙ্গীতসার, মৃদঙ্গমঞ্জরী, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে মধ্যমানকে তেতালার মধ্যলয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। লয়ের গতিভেদে কখন ছন্দ ভেদ হয় না; তেতালার যে মধ্যলয়, সেও কাওয়ালী, কেবল কিঞ্চিৎ ঢিমা। তাহা হইতে মধ্যমানের ছন্দ অনেক প্রভেদ। 'মধ্যমান' এই নামের জন্যই ঐ রূপ ভ্রম হয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী পৃথক ছন্দ। ইহা ঢিমা-তেতালার তুল্য রূপ। ঐ সকল গ্রন্থে যখন আড়াঠেকার ছন্দ নির্ণয়ে ভ্রম হইয়াছে, তখন মধ্যমানেও সেই রূপ ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

ভেদে, পরস্পর হইতে অনেক ভিন্ন, এবং তাহাতেই উহাদের নিজ নিজ রূপের পরিচয়। তাহা নিম্নে বিস্তারিত রূপে প্রকটিত হইতেছে।

খেম্‌টা তাল।

এই ছন্দ তিন তিনটী হ্রস্ব মাত্রাবিশিষ্ট সমান চারি পদে বিভক্ত; ইহার মাত্রা সমষ্টি বার, তাহার তিন তিন মাত্রা অন্তরে প্রস্বন ও তালি পড়ে। ইহার তালাঙ্ক ৩/৮। খেম্‌টার ঠেকা যথা:—

| ধা : টে : ধে | না : তে : নে | তা : টে : ধে | না : ধে : নে ||

উক্ত প্রথম ধা-তেই ইহার সম, এবং ঐ ৩য় পদের তা-এর উপর ফাঁক। ইহার গতি কিঞ্চিৎ দ্রুত, এবং প্রত্যেক তৃতীয় মাত্রায় প্রস্বনাধিক্য হেতু ইহাতে ফাঁক দিতে ইচ্ছা হয় না; সকল প্রস্বনেই তালি মনে হয়। গানে খেম্‌টার কোন পদে একটি অক্ষর, কোন পদে দুইটী, ইহার অধিক অক্ষর থাকে না। যে পদে দুইটী অক্ষর থাকে তাহাদের প্রথমটী প্রায়শই লঘু ও তৎপরটী গুরু; যথা:—

\+ ৩ ০ ১

না : গ :— | — : রুষ :— | নে :— :— | রুম : ত :—

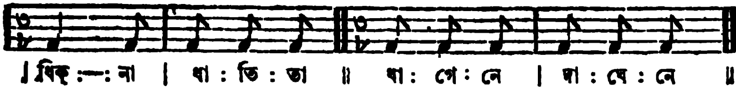
(হিন্দী) বে : দর্‌দা :— | — : হা :— | মা :— :— | — : র্‌ :—

খেম্‌টার প্রত্যেক তালিকে মাত্রারূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার দুইটী লইলে কাওআলীর এক পদ অর্থাৎ একটী তালি হয়। এই হেতু বাদকেরা কাওআলীর ঠেকা বাদন করিতে করিতে, বিচিত্রতার জন্য, এক আধ বার, খেম্‌টার ঠেকাও বাজাইয়া দেন, তাহাতে মাত্রার সূক্ষ্মাংশের লয় না হইলেও, তালিতে তালিতে ও দীর্ঘ মাত্রায় বেলয় হয় না বলিয়া উহা তত অসঙ্গত শুনায় না।

ভবুতজা, কাশ্মীরী-খেম-টা, ও দাদ্‌রা খেম্‌টারই প্রকার ভেদ মাত্র, অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দ। ইহারা একই তাল; দেশ ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে। ইহাদের প্রস্বন অতি প্রবল হেতু এক তালির পরেই সম্‌ হয়; এই জন্য ইহাদের দুইটী পদ, সুতরাং খেম্‌টার অর্দ্ধ। খেম্‌টা অপেক্ষা ভবুতজা বা কাশ্মীরী-খেম্‌টার গতি কিঞ্চিৎ

শ্লথতর; কিন্তু দাদ্‌রায় দ্রুততর, তজ্জন্য ইহার গানে অক্ষর কম। ইহারা গ্রাম্য গীতেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত; ইদানী বঙ্গে ভদ্র সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। ঠেকা ও গান যথা :—

ভর্‌তঙ্গা। দাদ্‌রা।



ভর্‌তঙ্গা বা কাশ্মীরী খেম্‌টা

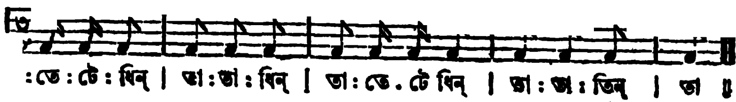


দাদ্‌রা।



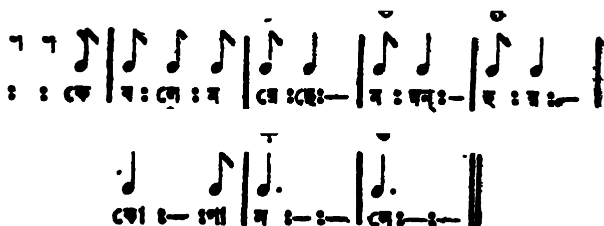
আড়-খেম্‌টা তাল।

এই তালটী স্থূল কথায় খেম্‌টার আড়; অতএব ইহারও মাত্রা সমষ্টি বার, এবং তালি ও পদ বিভাগ, সকলই খেম্‌টার ন্যায়; কিন্তু খেম-টা অপেক্ষা ইহার গতি ধীরতর বোধ হয়, ইহা ভর্‌তঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বদাই প্রায় ফাঁক পদের ২য় কিম্বা ৩য় মাত্রা হইতে উত্থাপিত হইয়া থাকে। ঠেকা যথা :—



আড়-খেম্‌টার ঠেকায় প্রত্যেক পদের তৃতীয় মাত্রায় প্রস্বন অধিক; প্রথম মাত্রায় তালির উপর প্রস্বন অতি ক্ষীণ; তজ্জন্য ঠেকার ঐ স্থানে ত-বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং সেই হেতু ইহার ছন্দ আড়। ইহার পদ বিভাগের মধ্যে প্রায়শই গানের দুইটী অক্ষর থাকে, তাহার ১মটী লঘু, তৎপরটী গুরু; লঘু ও গুরু, লঘু ও গুরু, এই রূপই ইহার ছন্দ। ঐ ছন্দকে কিঞ্চিৎ বিচিত্র করার কারণ, এবং লয়ের উপর এক এক বার অধিক প্রস্বন ও বিশ্রাম দেখাইবার জন্য, গানের

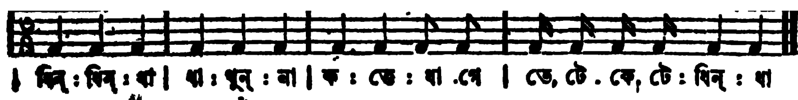
কলির প্রথম কয়েকটী অক্ষর, সমের পূর্ব্বে লঘু গুরু না হইয়া, সমভাবে উচ্চারিত হয়; তখন ফাঁক পদের শেষ মাত্রা হইতে গানারম্ভ হইয়া, ১ম পদের তিন মাত্রায় তিনটী অক্ষর পড়ে। যথা:—



ঐ গানটীর পদ্যের যে ছন্দ, তদনুসারে উহাতে প্রথম বর্ণে, ও তৎপরে প্রত্যেক দ্বিতীয় বর্ণে, প্রস্বন আছে (হসন্ত বর্ণ সংখ্যার মধ্যে গণ্য নহে); যথা কে ব লে´ ম রে´ ছে র্ম দন্ হ´ র, ইত্যাদি। এই রূপ প্রস্বনে ইহাতে খেম্‌টা তাল হয়; প্রস্বন অতিক্রম করিয়া উক্ত প্রথম "কে" উচ্চারিত হইলে, এবং লে-র উপরিস্থ প্রস্বনটী ব-তে দিলেই ছন্দ আড় হইয়া আড়-খেম্‌টা হয়। খেম্‌টা অপেক্ষা ইহার গতি ধীরতর জন্য অনেক সময়ে একতালার সহিত উহার ছন্দের বিভ্রম হয়; কিন্তু একতালাতে অক্ষর সংখ্যা অধিক। আড়-খেম্‌টা তাল হিন্দুস্থানে প্রচলিত নাই; বঙ্গদেশেই ইহার জন্ম। ফলত ইহা অতীব সুন্দর ত্রিমাত্রিক ছন্দ *।

একতালা।

ইহারও মাত্রাসমষ্টি বার; এবং ইহা তিন মাত্রাবিশিষ্ট সমান চারি পদে বিভক্ত হইয়া, তিন তালি ও এক ফাঁক প্রাপ্ত হয়। ইহার তালাঙ্ক ১২/৪। একতালার ঠেকা যথা:—



দ্রুত লয়ে একতালা খেম্‌টার ন্যায় বোধ হয়, কারণ উভয়েই ত্রিমাত্রিক। কিন্তু খেম্‌টা

* বাঙ্গলা সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-রত্নাকর মৃদঙ্গমঞ্জরী, প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে আড়খেম্‌টার অতি অশুদ্ধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়; ইহাকে (১৩॥) সাড়ে তের মাত্রার তাল বলিয়া লিখা হইয়াছে, যাহা নিতান্ত অসঙ্গত। সঙ্গীতসার কর্ত্তা উহাকে ৪॥ মাত্রানুসারে তিন তালিতে বিভাগে করিয়াছেন। সঙ্গীত-রত্নাকর প্রণেতা উহাকে চারি তালিতে বিভাগ করিয়া, কোন তালিতে সওয়া তিন মাত্রা, কোন তালিতে ৪॥ মাত্রা, এই প্রকার গোলমাল করিয়াছেন। তবলামালাতে আড়খেম্‌টার মাত্রা নিরূপণ শুদ্ধ হইয়াছে।

অপেক্ষা একতালার গানে অধিক বর্ণ থাকে; অধিকাংশ পদেই তিন তিনটী বর্ণ। সচরাচর সম্ হইতেই ইহার উত্থাপন হয়; যথা :—

\+ ০ ১

ক : ব : কি | — : তা : র | রূ : পে : র | ছু : ল : না

(হিন্দী) গুল্ : গু : ল | খা : — : ক্বা | বু : ল : বু | ল : — : শা

ইহার পদের প্রথম ও তৃতীয় মাত্রায় প্রস্বন ক্রমান্বয় প্রবল ও দুর্বল; এই হেতু যে, যে পদে দুইটী বর্ণ থাকে, তাহার প্রথমটী গুরু, তৎপরটী লঘু। ওস্তাদেরা ইহাতে চারি চারি মাত্রা অন্তরে তালি দিয়া ইহাকে সমান তিন পদে বিভক্ত করত, ইহার লয়কে কিঞ্চিৎ কঠিন করিয়া, ইহাতে একটু হেকমৎ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই নিয়মে ইহার ফাঁক নাই, তিনটীই তালি; বোধ হয়, তজ্জন্যই ইহার নাম একতালা*। যথা :—

গান ক : ব : কি : — তা : র : রূ : পে : ছু : ল : না

ঠেকা ধিন্ : ধিন্ : ধা : ধা থুন্ : না : ক : ত্তে ধা . গে : ত্তে . টে . কে . টে : ধিন্ : ধা

ঐ রূপ বিভাগে ইহার তালাঙ্ক $\frac{8}{8}$। কোন কোন স্থলে ইহাতে ফাঁকের ও সমের পূর্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের প্রথম মাত্রা বর্ণ শূন্য; দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রাই দুইটী লঘু বর্ণ; এবং ঐ ফাঁক ও সমের পদে এক একটী ত্রিমাত্রিক বর্ণ। যথা :—

০ ১ + ০

শ্চু : মি | কায় : — : — | — : কে : ভো | মায় : — : — | —

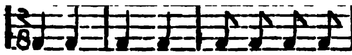
গানের বর্ণ সংখ্যা অল্প হইলে একতালার প্রায় ঐ রূপ ছন্দই হয়। ঐ ছন্দে ইহা আড়খেম্‌টার সহিত ঐক্য হইয়া থাকে। সামান্যত আড়খেম্‌টা হইতে একতালার প্রভেদ এই যে, গানে একতালার প্রত্যেক পদে আড়খেম্‌টা অপেক্ষা

* সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসকলে ইহা "একতালী" নামে খ্যাত। ১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

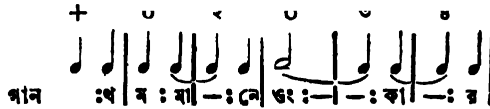
অক্ষর সংখ্যা অধিক ; অর্থাৎ একতালায় প্রত্যেক পদে তিন মাত্রায় তিনটী অক্ষর থাকে, আড়খেম্‌টায় দুইটা। কোথাও একতালায় কোন পদে যদি দুইটী মাত্র অক্ষর হয়, তাহা হইলে প্রথমটী গুরু, তৎপরটী লঘু, কিন্তু আড়খেম্‌টায় প্রথমটী লঘু, তৎপরটী গুরু।

চৌতাল।
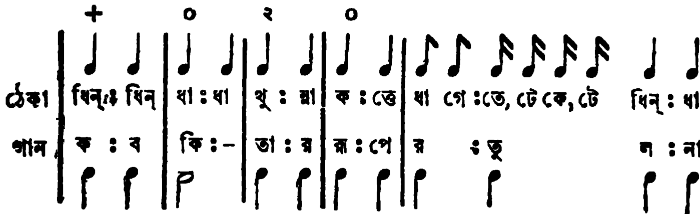
ইহা ধ্রুপদের তাল ; ইহারও মাত্রাসমষ্টি বার, এবং ইহা দুই দুই মাত্রাবিশিষ্ট ছয়টী পদে বিভক্ত হয় ; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক, এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই চারিটী পদে চারিটী তালি ; এই জন্যই ইহার নাম চৌতাল। ইহার তালাঙ্ক ঠেকা ও গান যথা :—



। ধা ধা । দিন্ : তা । তে. টে : ক. তা । ক দে . তা । তে . টে . কে . টে । গ : দি ঘে নে ।



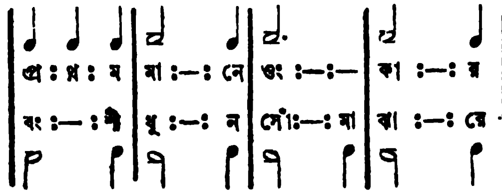
চৌতাল একতালারই প্রকারভেদ মাত্র। উপরে একতালার বার মাত্রাকে যে চারি মাত্রানুসারে তিন পদে বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই চৌতালের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। একতালার ঐ তিন ভাগের প্রত্যেককে আরও দুই ভাগ করিলে, সাকল্যে যে ছয় ভাগ পাওয়া যায়, তাহারই ২য় ও ৪র্থ ভাগে ফাঁক ও বাকি চারিটী ভাগে চারিটী তালি দিলেই চৌতাল হয়। যথা :—



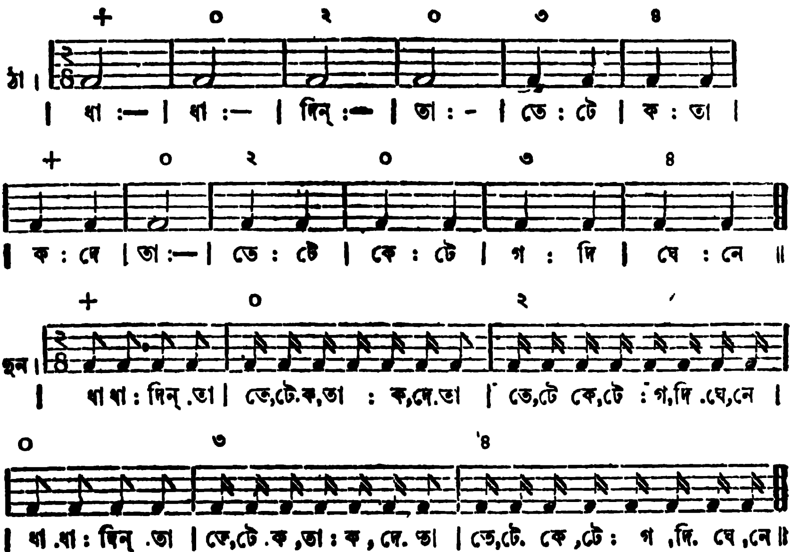
গানে একতালা হইতে চৌতালের ছন্দের বিভিন্নতা নাই ; কেননা একতালার ন্যায়

* সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা 'চতুস্তাল' নামে প্রসিদ্ধ। ১৪৮-৪৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চৌতালে গানের পদও ত্রিমাত্রিক, অর্থাৎ তিন তিন মাত্রা অন্তরে বর্ণের উপর প্রবন্ধ থাকে। যথা :—



এই হেতু চৌতাল ত্রিমাত্রিক জাতির অন্তর্গত হইয়াছে। একতালার গান ধ্রুপদের কায়দায় গাইলেই চৌতাল হয়, এই ইহার রহস্য। ধ্রুপদ গানে ঠা-দুন করার জন্য প্রথমে বিলম্বিত লয়ে গান আরম্ভ করিতে হয়; সুতরাং তখন একতালার ঐ তিন তালির প্রত্যেকে অতিশয় দীর্ঘ হইয়া লয় কঠিন হইয়া পড়ে; অতএব সেই লয়কে সহজ করার কারণ, ঐ দীর্ঘ তালির কালকে দুই ভাগ করত, এক ভাগে তালি, অপর ভাগে ফাঁক দেওয়ার রীতি হইতেই চৌতালের উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রকার বিভাগে চৌতালে দুই দুই মাত্রান্তরে তালি ও ফাঁক পড়াতে, প্রত্যেক তালি ২-এর শক্তির বিভাজ্য হইয়া, ঠা-দুন ক্রিয়ার উত্তম সুবিধা হইয়াছে। উপরে চৌতালের ঠেকাটী 'মধ্য' অর্থাৎ সহজ লয়ে লিখিত হইয়াছে। ইহার ঠা ও দুন এই প্রকার, যথা :—



প্রকৃত ত্রিমাত্রিক ছন্দ ধ্রুপদে ব্যবহার নাই; -কিন্তু পাখোয়াজের* বোলে বিচিত্রতার জন্য, চৌতালের প্রত্যেক মাত্রা কখন কখন সমান তিন ভাগও হইয়া থাকে; যথা: —

+ (পরন্) ০ ২

| ধে : ধে : ত্তে। টে : ত্তে : টে | ক : ত্তে : টে। থুঁ : তে : টে। কে :তে: ধে। ধে : ধে : টে।

০ ৩ ৪ ০

| গ্রে : থেন্ :- । তা :-- না | ধাক্ :-- তে.রে। কে .টে : তাক্ :- | গ্রে : থেন্ :- । তা :-- না —

+ ০ ২ (তেহাই)

| ধা :- : ধে। ধে : ত্তে : টে | কে :ত্তে :ধে। ধে : ত্তে ;টে | গ্রে : থেন্ :- । তা :-- না |

০ ৩ ৪ +

| ধা :- :- | গ্রে : থেন্ :- | ত :— : না। ধা :—:— | গ্রে : থেন্ :- । তা :-- না || ধা

বিষমপদী জাতি।

যে সকল তালে অসমান সংখ্যক মাত্রা ব্যবধানে প্রস্বন ও তালি পড়ে, তাহাদিগকে বিষমপদী তাল কহে। সেই সকল প্রস্বন ও তালি কখন ত্রিমাত্রিক, কখন চতুর্মাত্রিক, কখন দ্বিমাত্রিক হয়; এই হেতু ঐ সকল তালকে মিশ্র তালও বলা যায়। বিষমপদী তালও চারি পদে বিভক্ত হইয়া, তিন তালি ও এক ফাঁক প্রাপ্ত হয়; ঐ চারি পদের প্রথম দুই পদে যেরূপ মাত্রা ও তালির ভাগ, শেষ দুই পদেও তদ্রূপ। ঝাঁপতাল, সুরফাক তাল, যৎ, পোস্তা, ধামার, তেওট, রূপক, আড়াচৌতাল, তেওরা, পঞ্চমসওআরী, ইহারা বিষমপদী তাল।

* পাখোয়াজ (হিন্দী—পাখাওযাজ) শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে কোন গ্রন্থকারই কিছু বলেন নাই। বোধ হয়, ইহা হিন্দী 'পাক্কা আওয়াজ' শব্দের বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ। পাক্কা আওআজের তাৎপর্য্য মহৎ ধ্বনি। তবলা, বাঁয়া, ঢোলক, প্রভৃতি যন্ত্র সভ্য সমাজে প্রচলিত হইলে পর, প্রাচীনতম যন্ত্র মৃদঙ্গের শ্রেষ্ঠতা ও সম্মান রক্ষার্থ, উহার পাক্কা আওআজ নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে; ইহার তুলনায় তবলা বাঁয়াদি যন্ত্রের আওআজ কাঁচা—নিকৃষ্ট।

ঝাঁপতাল*।

এই তালের মাত্রাসমষ্টি দশ; ইহা চারি পদে বিভক্ত, তাহার ১ম ও ৩য় পদে দুই দুই মাত্রা, এবং ২য় ও ৪র্থ পদে তিন তিন মাত্রা; অর্থাৎ ঝাঁপতালে একবার দুই মাত্রা অন্তরে, তৎপরক্ষণে তিন মাত্রা অন্তরে, প্রস্বন ও তালি পড়ে। যথা,

+ ● ০ ১
| ১—২ | ১—২—৩ | ১—২ | ১—২ ০ ||

সম্ হইতেই ইহার উত্থাপন হয়। ইহার তালাঙ্ক ১ ও ৪। ঝাঁপতালের ঠেকা যথা :—

+ ৩ ০ ১

| ধা : গে | ধা : গে : তিন্ | না : কে | ধা : গে : ধিন্ ||

ইহার চারি পদে গানের বর্ণ সংখ্যার স্থিরতা নাই; কখন একটী বর্ণ, কখন দুইটী বর্ণও থাকে; কিন্তু কোন পদে দুই বর্ণের অধিক প্রায় থাকে না; যথা :—

+ ● ০ ১

| মা : ধ | তি : — : প | তি : ত | জ : নে : — |

(হিন্দী) | নি : প | ট : — : নি | ক : ট | বা : — : স |

আদিতে ঝাঁপতাল ধ্রুপদেরই তাল; কিন্তু পরে ইহা খেয়ালেও ব্যবহার হইয়াছে।

সুরফাক্ তাল†।

ইহার মাত্রাসমষ্টি দশ, ও পদবিভাগ তিন। সেই তিন পদেই তিন তালি; প্রথম ও তৃতীয় পদে চারি চারি মাত্রা, এবং দ্বিতীয় পদে দুই মাত্রা। যথা :—

---

* সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা 'ঝম্পা তাল' নামে খ্যাত (১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সঙ্গীতসার, কণ্ঠকৌমুদী, মৃদঙ্গমঞ্জরী তবলামালা, প্রভৃতি গ্রন্থে ঝাঁপতালকে সাত মাত্রার তাল বলিয়া, তাহার ঠেকার বোলে তদ্রূপ মাত্রা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অতিশয় অশুদ্ধ। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত সঙ্গীতসারে ঐ ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে।

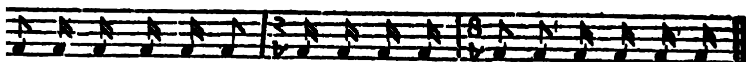
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকাতে ঝাঁপতালের ঠেকাতে মাত্রা নির্দ্দেশ শুদ্ধ হইয়াছে; প্রথমবারে অশুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারে ইহাকে "দুইটী দীর্ঘ ও দুইটী প্লুত মাত্রার তাল" বলিয়া যে লিখিত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দুইটী দীর্ঘ ও দুইটী প্লুত "আঘাতের" তাল বলাই উচিত ছিল; কারণ মাত্রা হইতে আঘাত অনেক ভিন্ন। তালি বা আঘাতই তালের জীবন ও রূপ পরিচায়ক; মাত্রা সেই আঘাতের পরিমাপক। ঐ গ্রন্থে সকল তালই ঐ প্রকার অপরিষ্কার নিয়মে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

† সুরফাক তালই সংস্কৃত গ্রন্থের 'শরভলীলক' তাল; এই শরভলীলকের অপভ্রংশে 'সুরফাক্' সংজ্ঞার উৎপত্তি। প্রথমত এই কথায় অনেকে বিস্মিত হইবেন কিন্তু নিম্নলিখিত যুক্তি প্রমাণ পাঠে উহা বিশ্বাস

| ১—২—৩—৪ | ১—২ | ১—২—৩—৪ ‖

উক্ত প্রথম পদের ১ম মাত্রাতেই সম্। ইহার চতুর্মাত্রিক পদ দুইটীর তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে লয় আরও সহজ হয়। ইহার তালাঙ্ক ৪/৮ ও ২/৮।

সুরফাকের ঠেকা যথা :—



‖ ধা : দে. ত্তে | না .গ : দিগ্ | দে .নে : না .গ | গ : দী | দে. নে : না .গ ‖

সম্ হইতেই ইহার উত্থাপন। ইহা ধ্রুপদ ভিন্ন ব্যবহার হয় না। ইহার পদগুলির মধ্যে গানের বর্ণ সংখ্যার নিশ্চয়তা নাই। নিম্নে গানের উদাহরণে তালের দুই রকম প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা :—



হইবে, সন্দেহ নাই। শরভলীলকের সংক্ষেপোচ্চারণ জন্য 'লীল' পরিত্যাগে প্রথমত 'শরভক্' তাল বলিয়া ব্যবহার হয়। তৎপরে তাহারই উচ্চারণ ভেদে 'সরভক্'-হইয়া, ক্রমে 'সুরফাক' হইয়া গিয়াছে। ইহাও অকারণ নহে ; হিন্দুস্থানী লোকের তালব্য-শ কে দন্ত্য-স-বৎ উচ্চারণ করা অভ্যাস হেতু, 'শর'-কে 'সর' বলা হয় ; তৎপরে অজ্ঞ সঙ্গীত ব্যবসায়ীগণ ঐ সর-কে সুর ও 'ভক্'-কে ফাঁক মনে করিয়া, তদ্রূপ উচ্চারণ ব্যবহার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'সুরফাক' শব্দের অন্য কোনই তাৎপর্য্য নাই। এই রূপে শরভলীলক যে আধুনিককালে সুরফাক নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আরও শরভলীলক তালের নিয়ম সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্নাবলীর মতে 'লঘুদ্রুতলঘুভৈব তালে শরভলীলকে",—অর্থাৎ ইহাতে তিনটী তালি পড়ে, তাহার প্রথম ও শেষ তালি অপেক্ষা, মধ্য তালিটী দ্রুত অর্থাৎ হ্রস্বতর। প্রচলিত সুরফাকেরও অবিকল ঐ রূপ তালি।

কণ্ঠকৌমুদীর শেষ ভাগে 'ঘনশ্যাম' ও 'বরণ্যা' এই দুইটি ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের পদ্যে যে রূপ শরভলীলক তাল যোজনা করা হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট অসঙ্গতি ও ভ্রম দৃষ্ট হয় ; কারণ বরণ্যার ব-তে এক মাত্রা, র-তে অর্দ্ধ মাত্রা, ণ্যা-তে এক মাত্রা, এই প্রকার মাত্রা দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু কে না বলিবে যে ঐ ব লঘু ও র গুরু ? অতএব ঐ ব-এ হ্রস্বকাল—অর্দ্ধমাত্রা, এবং র-এ দীর্ঘকাল—এক মাত্রা হওয়াই উচিত। কিন্তু গ্রন্থকার হয়ত বলিবেন যে সঙ্গীতের তাল কাব্যের লঘু গুরু নিয়মের অধীন নহে, নতুবা ঐ শ্লোক শরভলীলক তালে কি প্রকারে গাওয়া যায় ? এ কথা অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য হইবে ; কেননা বাঙ্গালা গানে সে রূপ হইলেও হইতে পারে,—তাহাতে লঘু গুরুর বিচার নাই ; কিন্তু সংস্কৃত পদ্যের গানে তাহা হইতেই পারে না। বিজ্ঞানাকারে শাস্ত্রানুযায়িক সঙ্গীত চর্চ্চার ভাণ করিয়া, তালের সহিত পদ্যছন্দের সামঞ্জস্য রাখিতে না পারা, বিড়ম্বনার পরাকাষ্ঠা বলিতে হয়। শরভলীলক তালের উক্ত দুইটী গানেই কি না ভুজঙ্গপ্রয়াত ব্যবহার হইয়াছে। ঐ তালে এরূপ ছন্দ যোজনা করা উচিত ছিল, যাহাতে তালছন্দে ও কাব্যছন্দে সুমিল হয়। ভুজঙ্গপ্রয়াত শরভলীলকের অনুরূপ নহে ; উহা ঝাঁপতালের অন্তর্গত। যথা :—

যত্ তাল*।

এই তালের মাত্রাসমষ্টি চৌদ্দ; তাহা চারি পদে বিভক্ত হইয়া, তিন তালি, এক ফাঁক প্রাপ্ত হয়। ১ম ও ৩য় পদে তিন তিন মাত্রা, এবং ২য় ও ৪র্থ পদে চারি চারি মাত্রা; অর্থাৎ ইহাতে একবার তিন মাত্রা অন্তরে, তৎপরে চারি মাত্রা অন্তরে, প্রথম ও তালি পড়ে। যথা,—

| ১—২—৩ | ১—২—৩—৪ | ১—২—৩ | ১—২—৩—৪ ॥

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

ঃ ব। য় ঃ—।প্যা ঃ—ঃ স্ম। র ঃ—। প্যা ঃ—ঃ ধ। রা ঃ—। ধী ঃ—ঃ শ। মা ঃ—। ন্ত্যা ঃ— ॥

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার" ২১৩ পৃষ্ঠায় যে 'তেহুমধ্যাচ্ছন্দ' লিখিত হইয়াছে, তাহাই অবিকল শরভলীলকের, অর্থাৎ সুরফাকের অনুরূপ; যথা ঃ—

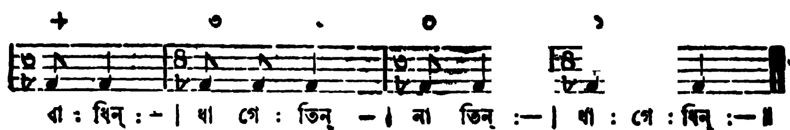
+ ২ ৩ + ২ ৩

।নি ঃ—• ন্দা ঃ—।ক ঃ রি।ভা ঃ—ঃ গ্যে ঃ—। ভা ঃ—ঃ সে ঃ—। ছ ঃ ল।যো ঃ—ঃ গী ঃ—
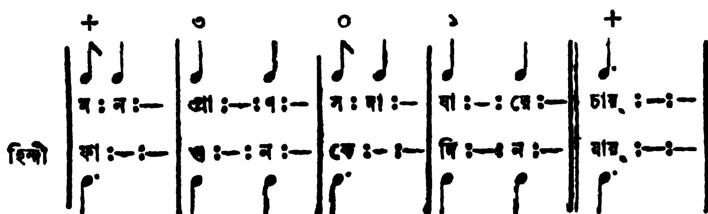
যদি বল যে, সুরফাক হইতে শরভলীলক বহু প্রভেদ; কিন্তু বাস্তবিক সে কথা নহে, উভয়ে একই তাল; কারণ যাঁহার লয় ও অনুপাত বোধ আছে, তিনি অনায়াসেই বুঝিবেন যে, ১ মাত্রা ½ ও ১ মাত্রা, এই ক্রমে যে তাৎপর্য্য, আর ২ মাত্রা ১ মাত্রা ও ২ মাত্রা, কিম্বা ৪ মাত্রা ২ মাত্রা ও ৪ মাত্রা এইরূপ ক্রমেরও অবিকল সেই তাৎপর্য্য, কোন প্রভেদ নাই; কেমন। ১ ½ ঃ ১=২ ঃ ১ ঃ২, কিম্বা=৪ ঃ ২ ঃ ৪; এই সকল কালের তুল্য অনুপাত ও তুল্য লয়। অতএব ১ ঃ ½ ঃ ১ যদি শরভলীলক হয়, তবে ২ ঃ ১ ঃ ২ কিম্বা ৪ ঃ ২ ঃ ৪ ॥ যাহাকে সুরফাক্ বলি, তাহাও শরভলীলক।

* সংস্কৃতে ইহাকে 'যতিতাল' বলে; তাহার লক্ষণ যথা,—"লঘুদ্বন্দ্বং দ্রুত দ্বন্দ্বং যতি স্যাৎ ত্রিপুটান্তরা", অর্থ এই যে, দুইটী লঘুর পর দুইটী দ্রুত আঘাতে যতিতাল হয়, যাহার মধ্যে ত্রিপুট বর্ত্তমান; মতান্তরে "যতি তালে লদৌ দলৌ", অর্থাৎ যতিতালে একটী লঘুর পর দ্রুত, তৎপরে আর একটী দ্রুতের পর লঘু আঘাত। একটু তলাইয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, ঐ উভয় লক্ষণের তুল্য তাৎপর্য্য; কারণ চক্রের ন্যায় ঐ তালের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন হইলে, দুইটী লঘুর পরে দুইটী দ্রুত, কিম্বা দুইটী দ্রুতের পর দুইটী লঘু, এই প্রকারই কার্য হয়। এক্ষণে আধুনিক যত্ই যে ঐ যতিতাল, তাহা দেখাইতেছি ঃ হিন্দুস্থানী লোকের সংক্ষেপে উচ্চারণ হইতেই যতির অপভ্রংশ যত্ হইয়াছে; যত্তালে আমরা যে রূপ তিন তালি ও এক ফাঁক দিয়া থাকি, যাহা উপরে প্রদর্শিত হইতেছে, হিন্দুস্থানীয় লোকে ইহাতে ঐ প্রকার করিয়া তালি দেয় না। হিন্দুস্থানে ইহা অতি প্রসিদ্ধ তাল, ইতর ভদ্র সকলেই ইহা ব্যবহার করে। তথায় উহাতে সাধারণ প্রথানুসারে তালি দেওয়ার যে নিয়ম, তদনুসারেই উক্ত সংস্কৃত সূত্র গঠিত হইয়াছে, কারণ পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ প্রায়শই হিন্দুস্থানের লোক। সেই প্রথা এই,— | ধাঁ ঃ ধিঁন্ ঃ—ঃ ধাঁ ঃ গে ঃ তিঁনঃ— | কিম্বা | তি ন ঃ—ঃ ধাঁ ঃ ধিন্ ঃ —ঃ ধাঁ ঃ গে | ইহা যতের প্রথমার্দ্ধ ঃ বাকি অর্দ্ধও অবিকল ঐ প্রকার। উক্ত চারিটী রেফে চারিটী তালি। উল্লিখিত প্রথম উদাহরণে প্রথম দুইটী তালি দ্রুত পড়ে, শেষ দুইটী একটু বিলম্বে পড়ে; উহা উল্টাইয়া লইয়া "লঘুদ্বন্দ্বাৎ দ্রুত দ্বন্দ্বং" হইয়াছে, যেমন—ধাঁ ঃ গে ঃ তিঁন্ ঃ—ঃ ধাঁ ঃ ধিন্ ঃ— | উক্ত দ্বিতীয় উদাহরণ হইতেই "লদৌ দলৌ"বলিয়া লক্ষণ হইয়াছে, কারণ উহার মাঝের দুই তালি দ্রুত। ঐ চারি তালির দ্বিতীয়টী বাদ দিয়া, কেবল তিনটী তালি দিলে তেওরা তাল হয়। এই জন্যই যত্কে তেওরার প্রকারান্তর বলা যায়; তেওরা ত্রিপুট শব্দের বিকৃতি

যতের মাত্রা অতিশয় হ্রস্ব, কারণ ইহার গতি দ্রুত। সম্ হইতে প্রায়শই ইহার উত্থান হয়; ইহার তালাঙ্ক $\frac{৩}{৮}$ ও $\frac{৪}{৮}$। যতের ঠেকা যথা:—



বাঙ্গালা গানে ইহার প্রত্যেক পদে প্রায়ই দুইটী বর্ণ; হিন্দী গানে ইহার ত্রিমাত্রিক পদে প্রায়ই এক একটা বর্ণ থাকে। কোথাও ত্রিমাত্রিক পদে দুইটী বর্ণ থাকিলে, তাহার প্রথমটী একমাত্রিক—লঘু ও দ্বিতীয়টী দ্বিমাত্রিক—গুরু; চতুর্মাত্রিক পদের দুইটী বর্ণই দ্বিমাত্রিক। যথা:—



যৎ কিম্বা পোস্তা, ও ঝাঁপতাল একই রূপ ছন্দ বলিয়া অনেকের ভ্রম হয়; কারণ উভয়ের তালি ও প্রস্বন সংখ্যা সমান, এবং একটা তালি হ্রস্ব, একটা দীর্ঘ; যতের হ্রস্ব তালিটী অপেক্ষা দীর্ঘ তালি যেমন এক মাত্রা বড়, ঝাঁপতালেও তদ্রূপ, এবং যতের তালিগুলি হইতে ঝাঁপতালের তালিসমূহের কেবল যে একটা মাত্রার কমি বেশী, তাহা বিশেষ পরীক্ষা ব্যতিরেকে অনুধাবন হওয়া দুষ্কর। প্রত্যুত উহারা পরস্পর হইতে অনেক ভিন্ন; কারণ ঝাঁপের দুই তালির অনুপাত ২ : ৩ = $\frac{২}{৩}$, এবং যতের দুই তালির অনুপাত ৩ : ৪ = $\frac{৩}{৪}$। অতএব $\frac{২}{৩}$ হইতে $\frac{৩}{৪}$ যত ভিন্ন, ঝাঁপতাল হইতে যত-তত ভিন্ন; ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইবে*।

আমার তাল।

এই তালটী যতেরই প্রকার ভেদ মাত্র; কি ছন্দে, কি প্রস্বনে, কি মাত্রায়, সকল বিষয়েই, ইহা যতের অবিকল অনুরূপ। স্থূল কথায় ইহা যত্ই, যতে ফাঁক উঠাইয়া
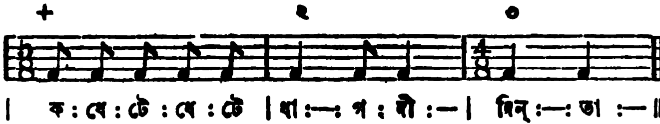
---

* প্রথম বার মুদ্রিত সঙ্গীতসার গ্রন্থে যতকে সাড়ে ছয় মাত্রার তাল বলিয়া, তাহার সমের ও ফাঁকের পদে সওয়া মাত্রা করিয়া ধরা হইয়াছিল, সে ভ্রান্তি পুনর্মুদ্রাঙ্কনে সংশোধিত হইয়াও নির্দোষ হয় নাই, কারণ ইহাতে সম্ ও ফাঁক পদহ বোলে মাত্রা দেওয়া উল্টা হইয়াছে।
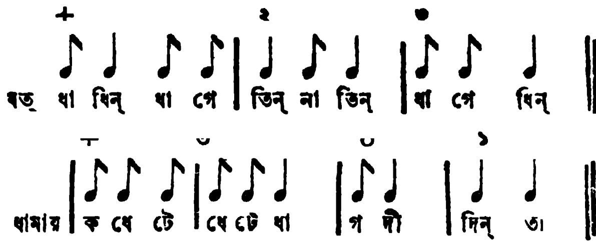
দিয়া, তাহার ১৪ মাত্রাকে তিন পদে বিভাগ করাতেই, ধামারের সৃষ্টি হইয়াছে*। যথা :—

| ১—২—৩—১—২ | ৩—৪—১—২—৩ | ১—২—৩—৪ ||

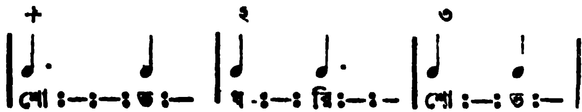
যতের চৌদ্দ মাত্রা কখন সমান তিন ভাগ হইতে পারে না; এই জন্য ধামারের প্রথম দুই তালিতে পাঁচ পাঁচ মাত্রা, ও শেষ তালিতে চারি মাত্রা পড়িয়াছে। অতএব ধামারে তালাঙ্ক † ৫/৮ ও ৪/৮; ইহার ঠেকা যথা :—



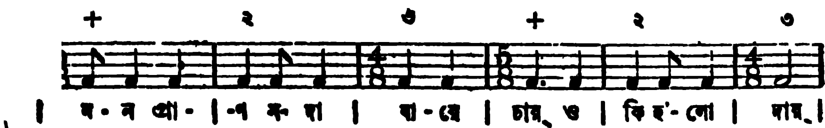
যতের বোলে ধামারের তালি, এবং ধামারের বোলে যতের তালি অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়, যথা :—



পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধামার ও যতের গানে ছন্দ একই প্রকার। ধামারের গান যথা :—
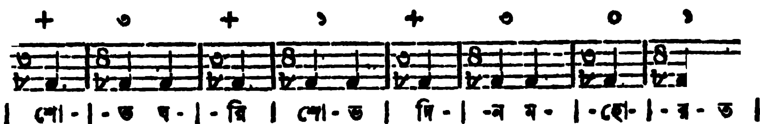


যতের গানে ধামারের তালি, ও ধামারের গানে যতের তালি দিলে এইরূপ হয় :—
(প্রথমে যতের, তৎপরে ধামারের গান।)

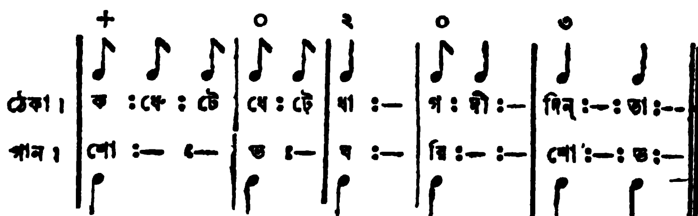


* প্রাচীনকালে ধামার তাল বোধ হয় প্রচলিত ছিল না, কারণ সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মৃদঙ্গমঞ্জরীতে সংস্কৃত গ্রন্থের 'বৃহত্তালের' সহিত ধামারের যে মিল দেখান হইয়াছে, তাহা বিষম ভ্রান্তি; কারণ বৃহত্তালের আটটী তালি, ইহা তাহার লক্ষণেই প্রকাশ আছে।

† স্বরলিপিতে তালাঙ্কের ব্যবহার্য্য বাঙ্গালা ৫ অঙ্কের টাইপ না পাওয়াতে ইংরাজীতে অঙ্ক প্রয়োগে বাধ্য হইলাম।

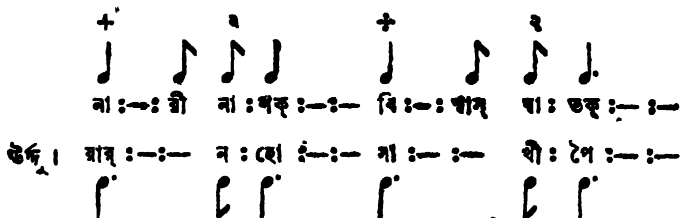


উহাতে দৃষ্ট হইবে যে, তাল পরিবর্ত্তন করিতে, গানের বর্ণসমূহের মাত্রার ও প্রস্বনের পরিবর্ত্তন, কিম্বা অন্ত কোন ব্যতিক্রম, কিছুই হয় না। ধ্রুপদগায়ক মধ্যকালের কলাবিৎগণ যত্ ছন্দকে ইতর সাধারণের ব্যবহার হইতে পৃথক করণার্থ, তাহার সাধারণ ব্যবহৃত চারি তালির কিম্বা তিন তালি এক ফাঁকের রীতি ত্যাগ করিয়া তাহাতে পরস্পর হইতে দূর দূর অন্তরে তিনটী তালি প্রয়োগ করত, একটু কঠিন করিয়া লইয়াছেন; এবং উহাকে 'ধামার' নামে খ্যাত করিয়াছেন। আরও, ইহাকে ধ্রুপদের গম্ভীর কায়দায় পরিণত করার জন্য, ইহার লয় যথেষ্ট বিলম্বিত করিয়া, যতের ৩য় তালাঘাতের ও ফাঁকের স্থানে অর্থাৎ চতুর্থ ও অষ্টম মাত্রায়, দুইটী ফাঁক প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই হেতু, অর্থাৎ ছন্দ লম্বা করার জন্য, ধামারের ঠেকায় যতের ঠেকা অপেক্ষা, অধিক বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং তালাঘাতে ও ফাঁকে, সাকল্যে পাঁচ পদে বিভক্ত হইয়াছে; যথা:—
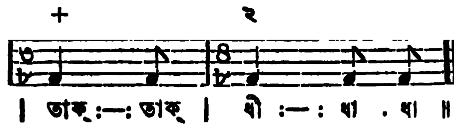


পোস্তা তাল*।

এই তালের মাত্রাসমষ্টি, প্রস্বন, তালি, পদ-বিভাগ, এবং প্রতি পদে মাত্রা ও বর্ণ সংখ্যা সকলই যতের ন্যায়। যত্ হইতে ইহার ছন্দের প্রভেদ এই যে, পোস্তার ত্রিমাত্রিক পদটীতে দুইটী বর্ণ থাকিলে, তাহার প্রথমটী গুরু এবং দ্বিতীয়টী লঘু; এবং ইহার চতুর্মাত্রিক পদান্তর্গত বর্ণ প্রথমটি লঘু, দ্বিতীয়টী ত্রিমাত্রিক। যথা:—



* পোস্তা পারস্ত শব্দ; ইহা গজল গানের তাল। পোস্তা শব্দ পারস্ত হইতে আমদানী হইয়া থাকিবে।

পোস্তার পদান্তর্গত বর্ণসমূহ ঐ প্রকারে লঘু গুরু হওয়াতে, প্রত্যেক পদেই প্রবল প্রবল হইয়াছে। এই হেতু সকল স্থানেই তালি দেওয়া ভিন্ন কোথাও ফাঁক দিতে ইচ্ছা হয় না; সেই তালি ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক হিসাবে, একটী হ্রস্ব ও তৎপরটী দীর্ঘ, এই প্রকার দুই তালিতেই পোস্তার ছন্দ পর্য্যবসিত হয়। ঐ হ্রস্ব তালটীতেই ইহার সম্। অতএব ঐ প্রকার দুই তালিতে পোস্তা নিষ্পন্ন হওয়াতে, কাওয়ালী সম্বন্ধে ঠুংরীর ন্যায়, পোস্তাও যতের অর্দ্ধ হইয়াছে, এবং ইহার ঠেকাও এরূপে গঠিত হইয়াছে যে, দুই তালিতেই আক্ষেপ মিটিয়া যায়। যতের ন্যায় ইহারও তালাঙ্ক দুই—৩/৮ ও ৪/৮। পোস্তার ঠেকা যথা—



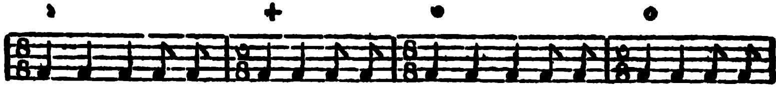
এইরূপে পোস্তার মাত্রাসমষ্টি সাত, তাহা দুই পদে বিভক্ত হওয়াতে, অর্থাৎ পোস্তার কেবল দুইটীমাত্র তালি থাকাতে, অনেক গানের আস্থায়ী কিম্বা অন্তরাতে তালির সংখ্যা ৪-এর বিভাজ্য হয় না। অর্থাৎ পোস্তার ৩, ৫, ৬, ৭ ফের পর্য্যন্ত গানে ব্যবহার হয়। ইহা টপ্পা ভিন্ন খেয়াল ও ধ্রুপদে ব্যবহার হয় না *।

তেওট তাল†।

এই তালেরও মাত্রাসমষ্টি চৌদ্দ; তাহা চারিটী অসমান পদে বিভক্ত হইয়া, তিন তালি ও এক ফাঁক প্রাপ্ত হয়। যতের ন্যায় ইহারও একটী তালি হ্রস্ব—ত্রিমাত্রিক, একটি তালি দীর্ঘ—চতুর্মাত্রিক, এই প্রকার চারিটি তালি; তাহারই একটি হ্রস্ব তালিতে ইহার সম্, ও আর একটী হ্রস্ব তালিতে ফাঁক। যতের ন্যায়, সম্ হইতে তেওটের উত্থাপন হয় না, ইহার দীর্ঘতর তালি দুইটীর কোনটী হইতে ইহা উত্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপে যত হইতে ইহার ছন্দের পার্থক্য হয়। তেওটের তালাঙ্ক ৩/৪ ও ৪/৪, ইহার ঠেকা যথা:—

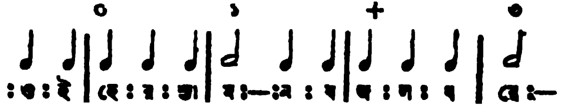
*বাঙ্গালা সঙ্গীতসার, সঙ্গীত রত্নাকর, মৃদঙ্গমঞ্জরী, প্রভৃতি গ্রন্থসকলে পোস্তা অতি অশুদ্ধ রূপে ব্যাখ্যিত হইয়াছে; মাত্রা ও সম্ উভয় বিষয়েই যথেষ্ট ভ্রম দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকর্ত্তাগণ পোস্তার সমষ্টি পৌনে চারি মাত্রা ধরিয়া, তাহার উক্ত ২য় অর্থাৎ দীর্ঘতর তালিটীতে সম্ স্থির করিয়াছেন। তবলামালাতে ও পুনর্মুদ্রিত সঙ্গীতসারেও পোস্তার ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হইয়াছে; কেননা তাহাতে ইহাকে পাঁচ মাত্রার তাল বলা হইয়াছে। ঝাঁপতালই পাঁচ মাত্রার তাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পোস্তায় ঝাঁপতাল একই রূপ ছন্দ বলিয়া অনেকের ভ্রম আছে, উক্ত গ্রন্থদ্বয় তাহার দৃষ্টান্ত।

† সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা 'ত্রিপুট' নামে খ্যাত। ২০২ পৃষ্ঠার নিম্নে টীকা দ্রষ্টব্য।



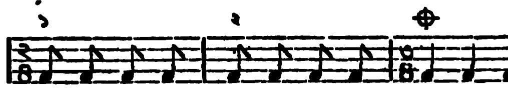
। ধিন্ : ধিন্ : ধা : তে. টে । ধিন্ : ধা : তে .টে । ধিন্ : ধিন্ : ধা : তে. টে । তিন্ : তা : তে. টে ।

ইহার গতি শ্লথ, সেই জন্য ইহার গানে ও ঠেকায় যত্ অপেক্ষা বর্ণসংখ্যা অধিক। উপরে ঠেকার বোল দেওয়া হইয়াছে। গানের দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—
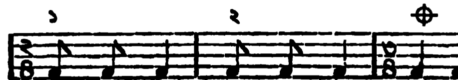


রূপক তাল*।

এই তালটী তেওটের অর্দ্ধ, অর্থাৎ তেওটের চতুর্মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক, এই দুই পদের সাত মাত্রায় রূপকের এক ফের হয়। তেওটের চতুর্মাত্রিক পদে দুইটী প্রস্বন থাকে, একটী ১ম মাত্রায়, আর একটী ৩য় মাত্রায় ; তেওটের লয় আরও ঢিমা করিয়া ঐ ঐ স্থানে তালি দিলেই রূপক হয় ; যথা:—১´—২—৩ । ১´—২ । ৩´—৪ । অতএব রূপকের তিনটী পদ, একটী ত্রিমাত্রিক, দুইটী দ্বিমাত্রিক ; এবং ঐ ত্রিমাত্রিক পদের প্রথম মাত্রায় ইহার সন। ইহার তালাঙ্ক $\frac{৭}{৪}$ ও $\frac{৭}{৮}$। রূপক আদিতে ধ্রুপদেরই তাল, পরন্তু অতিশয় মনোহর জন্য, বাঁয়া ও ঢোলক প্রভৃতির সঙ্গতে, ও সকল প্রকার গানে, ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার ঠেকা যথা :—
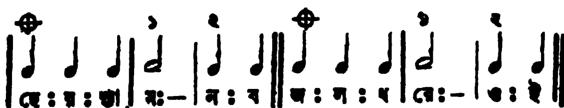


মৃদঙ্গে। । ধু . মা : কে .টে । .গ . দি : ঘে .নে । তা : থুন্ : না ॥



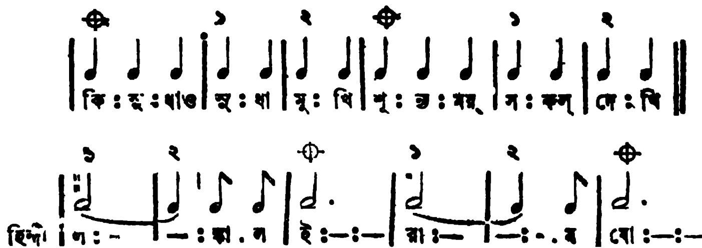
বাঁয়ায়। । ধিন্ . ধিন্ : ধাগ্ । `ধিন্ . ধিন্ : ধাগ্ । `তিন্ : তিন্ : তাক্ ॥

তেওট হইতে রূপকের ছন্দের বিশেষ পার্থক্য নাই ; তেওটের গানে রূপকের তাল দেওয়া যায়, এবং রূপকের গানে তেওটের তাল দেওয়া যায়। তেওটের গানে রূপকের তাল যথা—



* সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা 'রূপক' নামেই খ্যাত ; ১৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

কালাবঁৎগণ রূপকের সমের উপর তালি না দিয়া, তথায় একটী ফাঁক দিয়া তাহাতেই সম নির্ব্বাহ করেন*, তজ্জন্যই ঐ স্থানে ঠেকার বোলে ত-বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রূপকের গান প্রায়শই ঐ সম্-রূপী ফাঁক হইতে উত্থাপিত হয়। তেওট অপেক্ষা রূপকের গতি আরও ধীর, এই জন্য ইহার গানে ও ঠেকায় বর্ণ সংখ্যা অধিক। কিন্তু বাঙ্গালা গানাপেক্ষা হিন্দী ধ্রুপদে বর্ণ সংখ্যা কম, এই হেতু বাঙ্গালা গানে ইহার ছন্দ পরিষ্কার প্রকাশিত হয়। রূপকের গান যথা—



চৌতাল।

এই তালও রূপকের ন্যায় এবং ইহারও মাত্রাসমষ্টি সাত, পদবিভাগও তদ্রূপ। কিন্তু ইহার গতি আরও শ্লথ; অতএব রূপককে আরও ঢিমা করিয়া, তাহার ত্রিমাত্রিক পদটীর মধ্যে একটি প্রথম মাত্রায়, আর একটী দ্বিতীয় মাত্রায়, এই রূপ দুইটী তালি দিয়া, তৎপরে রূপকের বাকী দুইটী তালি দিলেই আড়া-চৌতাল হয়; যথা—
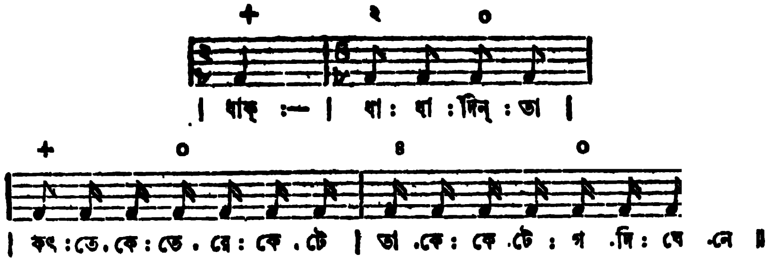
| ১´ | ২´—৩ | ১´—২ | ৩´—৪ ||

স্থূল কথায়, রূপক ঐ প্রকার চারি পদে ও চারি তালিতে বিভক্ত হওয়াতে, তাহার আড়া বা ছোট চৌতাল নাম হইয়াছে। ইহার গতি শ্লথতর জন্য ইহার তদনুযায়ী ঠেকাও প্রস্তুত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার ঠেকায় অধিক সংখ্যক অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য। শ্লথ গতির জন্য উক্ত সাত মাত্রার প্রত্যেককে আরও বিভাগ করিয়া, ইহার মাত্রাসমষ্টি ১৪ ধরিতে হয়; তাহা হইলে ইহার লয় সহজ হয়; যথা—

+ ২ ৩ ৪
| ১—২ | ১—২—৩—৪ | ১—২—৩—৪ | ১—২—৩—৪ ||

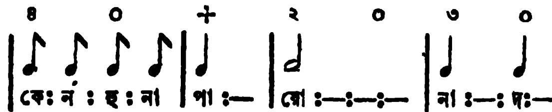
উক্ত প্রথম পদের ১ম মাত্রায় ইহার সম্। ইহার তালাঙ্ক $\frac{২}{৮}$ ও $\frac{৪}{৮}$। ইহার ঠেকা যথা :—

* এই হেতু ঐ সম স্থানে এই ⊕ চিহ্ন ব্যবহৃত হইল; তদ্বারা ফাঁক ও সম, দুই বুঝায়।



ইহার লয় সহজ করণার্থ উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ পদের তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক দেওয়া যাইতে পারে, যেমন উপরে দেখান হইয়াছে। ইহার গানের কথার ছন্দ অবিকল রূপকের ন্যায়; পরন্তু রূপকের সমের পদের দ্বিতীয় মাত্রায় বর্ণ না থাকিলেও চলে; কিন্তু আড়া-চৌতালের ঐ স্থানে, অর্থাৎ ইহার দ্বিতীয় পদের প্রথম মাত্রায়, বর্ণ থাকা উচিত; কেননা তাহার উপর প্রস্বন ও তালি রহিয়াছে। ফলতঃ হিন্দী গান কোন নিয়মেরই অধীন হয় না; ওস্তাদেরা রূপকের গান আড়া-চৌতালে, এবং আড়া-চৌতালের গান রূপকে, গাইয়া থাকেন। আড়া-চৌতাল কেবল ধ্রুপদেই ব্যবহার হয়; ইহার গান যথা :—

তেওরা তাল

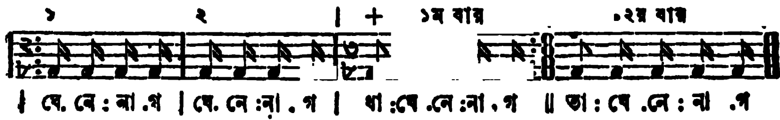


তেওরা তাল* ।

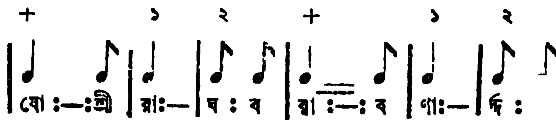
এই তালটীও অবিকল রূপকের ন্যায়; অর্থাৎ ইহারও মাত্রাসমষ্টি সাত; পদবিভাগ ও তালি তিন :—তাহার একটী ত্রিমাত্রিক,—যাহাতে সম্; আর দুইটী দ্বিমাত্রিক। ঐ তিন পদ দুইবার লইয়া, একটী ত্রিমাত্রিক পদে সমের তালি, অপর ত্রিমাত্রিক পদে

* সংস্কৃত 'ত্রিপুট' শব্দের অপভ্রংশে তেওরা ও তেওট, দুই-এরই উৎপত্তি হইয়াছে। তেওরাই ত্রিপুট কারণ সংস্কৃত গ্রন্থে ত্রিপুট তালের লক্ষণ এই :—"দ্রুতদ্বয়ং লঘুঃ", অর্থাৎ দুইটী দ্রুত আঘাতের পর একটী, লঘু আঘাত। তেওরাতেও দুইটী তালি দ্রুত পড়িয়া শেষে আর একটী তালি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়; অতএব ত্রিপুট ও তেওরা যে একই তাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তেওরা হইতেই তেওট তাল উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবে তেওট তাল তত প্রচলিত নাই। বোধ হয় পূর্ব্বপ্রদেশে কিম্বা বঙ্গে তেওরা তাল খেয়ালে ব্যবহার হইয়া, তাহার দুই অর্দ্ধাংশের অন্তর্গত দ্বিমাত্রিক তালিদ্বয়কে একটী লম্বা চতুর্মাত্রিক তালি করিয়া লওয়া হয়, এবং সমস্ত তালে তিন তালি এক ফাঁক প্রয়োগ হেতু, তদুপযুক্ত ঠেকারও উদ্ভব হওয়াতে, নামে ও কাজে উভয়েতেই পৃথক হইয়া 'তেওট' বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। যন্ত্রের নিম্নে টীকা দেখ।

ফাঁক দিলে, তেওরা তাল সম্পূর্ণ হয়। ইহার তালাঙ্ক ৩/৮ ও ২/৮। ইহার ঠেকা যথা :—



প্রায় সম্ হইতেই তেওরার গানের উত্থাপন হয়। ইহার গানের কথার ছন্দ অবিকল তেওটের ন্যায়; কিন্তু ইহার গতি অতি দ্রুত জন্য গানের অক্ষর সংখ্যায় প্রায় কমই থাকে; ইহাতেই রূপক হইতে উহার ছন্দের পার্থক্য হয়। রূপকের সমের উপর যেমন ফাঁক, তেওয়াতে সেরূপ ফাঁক নাই; সমের উপর তালি। গান যথা :—



পঞ্চমসওয়ারী তাল

এই তালের মাত্রাসমষ্টি ত্রিশ; ইহা আট পদে বিভক্ত। প্রথম দুইটী পদ ত্রিমাত্রিক; পরের দুইটী পদ চতুর্মাত্রিক,—তাহারই প্রথম পদে সম্। ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পদে ফাঁক। ইহার পাঁচ পদে পাঁচ তালি,—এই কারণে ইহার নাম পঞ্চমসওয়ারী। ইহার তালাঙ্ক ৩/৮ ও ২/৮। ইহা ধ্রুপদের তাল। ইহার ঠেকা ও গান যথা :—

১ ২ + ০ ৪

| ধিন্ :ধাগ্ :- | ধিন্ :ধাগ্ :- | তা :-: ধিন্ : দা | ধিন্ :না : ধিন্ :দা | তা :কে . টে

তিন:তা | তে রে : কে .টে :তিন্ :তা | তি:তিন্ : না : ধিন্ | নে : ধা : তে .রে : কে .টে ||

১ ২ + ০

| মা :— :— | হে : রি :— | ধ :—: ন :— | শ :- : ন -

৪ ০ ৫ ০

| বি :—: ক্রা :— | ব :—: ন :— | ধ :— : ন :— | ২ :— : শ :— ||

উপরে যে কয়েকটী তালের ব্যাখ্যা করা হইল, ব্যবহারে তাহারাই সচরাচর প্রচলিত। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লছমী তাল, ফোর্‌দস্ত,খাম্‌সা, প্রভৃতি কতকগুলি বহু তালি ও বহু ফাঁকবিশিষ্ট সংস্কৃত ও উর্দ্দু তাল কোন কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহারা তত সুখকর নহে বলিয়া প্রচলিত নাই ; অতএব তাহাদের বিবরণ লিখিয়া বৃথা গ্রন্থ বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদের উদাহরণ স্বরূপ, ব্রহ্মতালটীর বিবরণ না লিখিয়া ক্ষান্ত দেওয়া যায় না, কারণ তাহার দীর্ঘকলেবর বিরক্তিকর হইলেও, তাহা একটী সুন্দর নিয়মে গঠিত* :—প্রথমে এক তালির পর ফাঁক, তৎপরে দুই তালির পর ফাঁক, তৎপরে তিন তালির পর, তৎপরে চারি তালির পর ফাঁক, আর নাই। ইহার মাত্রা সমষ্টি আটাইশ ; তাহা দুই মাত্রানুসারে সমান ১৪টী পদে বিভক্ত। ঠেকা যথা ;—

+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫

| ধা : দিন্ | তা : দিৎ | ধা : ধা | ধা : দিন্ | তা : দিৎ | ধা : ধা | কে : টে |

৬ ০ ৭ ৮ ৯ ১০ ০

| ধা : দিন্ | তা : দিৎ | ধা : ধা | কে. টে : তা. ক্ | গ. দি : ঘে .নে | ধা :— | থুন্ :—||

পূর্ব্ব প্রকটিত তালগুলির মধ্যে, যেমন কোন না কোন এক প্রকার ছন্দ পাওয়া যায়, ব্রহ্মতালের উক্ত বোল দৃষ্টে প্রতীত হইবে যে, কোন একটা ছন্দ কল্পনা করিয়া, ইহা গঠিত হয় নাই ; কেবল ২৮টা মাত্রা যে-কোন প্রকারে সমান ১৪ ভাগ হইয়া, তাহার ১০ ভাগে তালি, এবং বাকি ৪ ভাগে ফাঁক দিয়া, তাল-পিণ্ড রচিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাতে কোন সৌন্দর্য্য নাই ; এবং তদভাবেই ইহা লোকরঞ্জক না হইয়া, ক্রমে লোপ পাইতেছে। শেষোক্ত অন্যান্য তালগুলির কেহ ঐ প্রকার, কেহ বা তদপেক্ষা দীর্ঘ। এই হেতু তাহারাও মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী নহে ; সুতরাং লোপ পাইবারই যোগ্য। উহারা কেবল ওস্তাদীপনা জাহির করণার্থই ব্যবহার হয়। ফলতঃ উহারা যে এমন কঠিন তাল, তাহা কিছুই নহে ; উহাদের দীর্ঘ কলেবর, আকাশের তারা কিম্বা মস্তকের কেশ গণনা করার ন্যায় বিরক্তিকর মাত্র।

প্রচলিত তালসমূহের যে প্রকার ছন্দ উপরে নিরূপিত হইল, কোন কোন গানে তাহার ব্যভিচার কখন কখন লক্ষিত হইবে। ইহাতে এমনও হয়ত কখন মনে হইবে যে,

* "লঘুদ্রুতং লঘুশ্চৈকোদ্রুতং লশ্চ খত্রয়ং।
লঘুশ্চ ব্রহ্মতালোয়ং তালবিজ্ঞৈঃ প্রকাশিতঃ।" সঙ্গীত-রত্নাবলী।

তালের উক্ত ছন্দ নিরূপণে ভুল আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কোন এক তালের যাবতীয় গানের বর্ণসংখ্যা এক রূপ হওয়া, এবং তাহারা সর্ব্বদা একই নিয়মে লঘু গুরু হওয়া, আশা করা যায় না; কেননা প্রত্যেক তালের জন্য, পদ্যের কোন বিশেষ ছন্দ নিরূপিত নাই। নানা ছন্দের পদ্য যে কোন তালে গাওয়া হইয়া থাকে,, কারণ সঙ্গীতের তালের ছন্দ সকলই মাত্রা-বৃত্ত, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে; গাইবার সময় সেই সকল ছন্দের মাত্রা সমষ্টির ব্যতিক্রম না হইলেই লয় রক্ষা হয়। কিন্তু এক এক তালের যে এক এক প্রকার ছন্দ আছে, যদ্দ্বারা উহাদের পার্থক্য বিধান হয়, তাহাই উপরে বর্ণিত হইল। একই তালের হিন্দী গানাপেক্ষা বাঙ্গালা গানে বর্ণ-সংখ্যা অধিক; এই হেতু বাঙ্গালা গানে কতক ছন্দ রক্ষা হয়। কিন্তু হিন্দী গানে বর্ণাল্পতা জন্য, আশ্, কম্পন, গিট্‌কারীর যথেষ্ট স্থান পাওয়া যায়; বাঙ্গালা গানে তদ্রূপ হয় না।

কালাবঁৎ ওস্তাদগণ গাইতে ও বাজাইতে সুদক্ষ হইলেও, যেমন তাঁহাদের সারেগম বোধ প্রায় নাই, তেমনি তাঁহাদের তালেরও মাত্রা বোধ একেবারে নাই। তাঁহারা কোন তালেরই ছন্দ অবিকৃত রাখিয়া প্রায় গান না; ছন্দ অব্যক্ত রাখাই, তাঁহাদের নিকট প্রশংসার কার্য্য বলিয়া গণ্য; কারণ ঠেকাদার বাদক যাহাতে শীঘ্র ঠেকা ধরিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হয়, ইহাই তাঁহাদের ওস্তাদীপনার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে, প্রচলিত হিন্দু সঙ্গীতে ছন্দ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; এবং সঙ্গীতোপজীবিদিগের মধ্যে কাহারও ছন্দের নিয়মানুধাবন না থাকাতে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এক শ্রেণীর গানই পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে যাহারা ছন্দের নিয়মে বদ্ধ নহে। ছন্দ, ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে প্রায়ই প্রচলিত নাই। প্রচলিত গান প্রণালীর মধ্যে ধ্রুপদ গানে কতক ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু খেয়াল ও টপ্পা ছন্দের দিক্ দিয়া যায় না।

ধ্রুপদ গানে মৃদঙ্গের যে সঙ্গত হয়, সেই সঙ্গতে পরণ ধরিলে, লয় ঠিক থাকিলেও, প্রস্বন অর্থাৎ তালি ও ফাঁকের স্থান অব্যক্ত ও অস্পষ্ট হইয়া পড়াতে, গায়ককে সর্ব্বদা নিজে তাল দিয়া গাইতে হয়। খেয়ালে সে রীতি নাই, খেয়ালে যে তান দেওয়া হয়, তাহা তালে বাঁধা থাকে না; এই জন্য খেয়াল গায়কগণ সঙ্গতকারকে ঠেকায় পরণ ধরিতে দেন না; তাঁহাকে কেবল ঠেকাটী মাত্র বাজাইতে হয়, গায়ক সেই ঠেকা অবলম্বনে যত ইচ্ছা তান কর্তব করেন। ইহাতে ধ্রুপদ ও খেয়ালে পরস্পর বিপরীত রীতির উদ্ভব হইয়াছে; ধ্রুপদে সঙ্গতকারের যথেষ্ট স্বাধীনতা; গায়ক নিজে তাল রাখিয়া, যেন পাখোয়াজ বাদকের অধীনে ঠেকার কার্য্য করেন। খেয়ালে গায়কের যথেষ্ট স্বাধীনতা; সঙ্গতকার কেবল ঠেকা ধরিয়া থাকেন। এই হেতু ধ্রুপদে প্রথমে

আলাপ করার রীতি হইয়াছে,যাহাতে গায়ক যথেষ্ট স্বাধীনতা সহকারে কতক্ষণ তান-কর্তব করিয়া লন। যেখানে ধ্রুপদ গায়ক গীতের মধ্যে তান বাঁট করেন, সেই খানেই প্রায় সঙ্গতকারের সহিত তাঁহার বিবাদোপস্থিত হয়; কারণ তখন উভয়েই নাকি স্বাধীন পথাবলম্বী। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রচলিত নিয়মে পাখোয়াজের সঙ্গত, গানের তালের সাহায্যকারী নহে। সঙ্গতকার মার্দ্দঙ্গিকও যেন দ্বিতীয় গায়ক। অতএব এ তদুভয়ের শাসনার্থ তৃতীয় ব্যক্তির নিতান্ত প্রয়োজন হয়; তাহা না হইলে বিতণ্ডা নিবারিত হয় না।

তালের চারি গ্রহ।

পূর্ব্বে ১২শ পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে যে, কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে তালের চারি প্রকার গ্রহ, অর্থাৎ ধরণ; যথা,—সম, বিষম, অতীত ও অনাগত। আবার কোন কোন গ্রন্থকারের মতে কেবল তিন প্রকার গ্রহ—সম, অতীত ও অনাগত; তাহাতে বিষম গ্রহের উল্লেখ নাই। প্রথমত, তালগ্রহের যে কি অর্থ, তাহা মীমাংসিত হওয়া উচিত; কেননা অনেকে উহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, গোলমাল করিয়া ফেলেন। গ্রহ শব্দের অর্থ ধরণ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কেহ কেহ তালির অর্থ তাল শব্দ গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ ছন্দের প্রস্বন স্থানে যে করতালি অথবা অন্য কোন আঘাত দেওয়া যায়, সেই আঘাতার্থে তাল শব্দ গ্রহণ করিয়া, ভ্রমে পতিত হন। তালের আদি অর্থ ঐ প্রকার ছিল বটে; কিন্তু পরে ব্যবহার বশতঃ ঐ অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে:—যেমন চৌতাল এক প্রকার ছন্দ; রূপক তাল অন্য এক প্রকার ছন্দ, ইত্যাদি; অতএব তাল গ্রহণের অর্থ ঠেকার ধরণ; এবং সম, অতীত ও অনাগত, ইহারা ঐ ধরণের বৈলক্ষণ্য মাত্র। সম গ্রহের অর্থে সংস্কৃত গ্রন্থসকলেতে মত-দ্বৈধ নাই। যে সময়ে গান আরম্ভ হয়, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে ঠেকা ধরাকে সম গ্রহ কহে *। সংস্কৃত গ্রন্থাদির শ্লোক লক্ষণে অতীত ও অনাগত গ্রহের তাৎপর্য্য তত বিশদ নহে; এবং বিভিন্ন গ্রন্থে উহাদের লক্ষণও পরস্পর বিসম্বাদী। গ্রহকর্ত্তাগণ গানের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজ নিজ লক্ষণের অর্থ পরিষ্কার না করাতে, আধুনিক কালে বিভিন্ন লোকে উহাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করে। "সংগীত-দর্পণের" মতে অগ্রে গান আরম্ভ করিয়া পরে তাহার ঠেকা ধরাকে অতীত গ্রহ বলে, এবং অগ্রে ঠেকা ধরিয়া পরে গান

---

* "গীতাদি সমকালন্তু সমপাণিঃ সমগ্রহঃ।" সঙ্গীত-দর্পণ।

* "গীতোচ্চারণ কালে তু যদা তালস্তু সঙ্গতি।
তদাসম ইতি প্রোক্তঃ সমকাল সমুদ্ভবাৎ॥" সঙ্গীত-সময়সার।

আরম্ভ করাকে অনাগত গ্রহ বলে *। সংস্কৃত "সংগীত-সময়সার" নামক গ্রন্থের মতে অতীতানাগতের অর্থ উহার বিপরীত :—অর্থাৎ সংগীত-দর্পণে যাহাকে অতীত ও অনাগত বলে, শেষোক্ত গ্রন্থে তাহাকে অনাগত ও অতীত বলে †। পরন্তু উক্ত সংগীত-সময়সারের লক্ষণই যুক্তিসংগত বোধ হয়; কেন না ঐ মতের সহিত শব্দের অর্থগুলির উত্তম সামঞ্জস্য হয় :—অনাগতে, কি না ভবিষ্যতে, যে গ্রহ, অর্থাৎ গানের পর ঠেকা ধরা হইলে, তাহা অনাগত গ্রহ হয়; এবং অতীতে, কি না ভূতে, যে গ্রহ, অর্থাৎ অগ্রে ঠেকা আরম্ভ করিয়া পরে গান ধরিলে, অতীত গ্রহ হয়।

যাঁহারা ছন্দের প্রস্বনোপরিস্থ আঘাতকে তালের অর্থ মনে করেন, তাঁহাদের মতে, কোন তালাঘাতের উপর গান ধরিলে সম-গ্রহ হয়, এবং তাহার পূর্ব্বে গান ধরিলে অনাগত, এবং পরে ধরিলে অতীত গ্রহ হয়। এই প্রকার ব্যাখ্যা যে ভ্রমাত্মক, তাহা দেখাইতেছি। "নিমক হাবাম্‌নে মুলক ডুবায়া, হজরত যাতা লণ্ডনকো", এই প্রসিদ্ধ লখণৌ ঠুংরীর গানটী অনেকেই জানেন; ইহাতে প্রস্বনের, অর্থাৎ তালাঘাতের ভাগ, ও মাত্রা এই রূপ :—

| নি .ম : ক .হা | রাম্‌ : নে | মু .ল : ক .ডু | বা : য়া | ইত্যাদি

ঐ গানটী তালাঘাতের উপরেই আরম্ভ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মতে, উহাতে কেবল সম গ্রহই আছে বলিতে হয়, উহাতে অতীতানাগত হয় না, কারণ তাহা করিতে গেলে, হয় উহার আদিতে দুই একটী শব্দ নূতন যোগ করিতে হয়, না হয় উহার প্রথম দুই একটী অক্ষর ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা তালাঘাতের পূর্ব্বে, কিম্বা পরে, আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু তাহা করাও সঙ্গত হয় না, কেন না তাহাতে গানের পদ্য বিকৃত হইয়া যায়। উক্ত মতে "শাহজাদে আলম, তেরে লিয়ে, জঙ্গল সহর বিয়াবান ফিরি", এই গানটী অনাগত গ্রহের বলিতে হয়, কারণ ঐ গানটীতে তালাঘাতের ভাগ এইরূপ :—

: শা. হ | জা :—.দে | আ : লম্‌ | তে : রে .লি | য়ে ইত্যাদি।

অর্থাৎ ঐ গানে 'শাহ' এই দুই অক্ষরের পরে তালাঘাত পড়িতেছে, তজ্জন্যই অনাগত

* "গীতাদৌ বিহিতে পশ্চাত্তাল বৃত্তির্বিধীয়তে।
অতীতাখ্যো গ্রহোজ্ঞেয়ঃ সোবপাণির্বিতিস্মৃতঃ।
পূর্ব্বং তাল প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পশ্চাদ্‌গীতাদিকচ্যতে।
অনাগতঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স এব পবিপাণিকঃ।" সঙ্গীত-দর্পণ।

† "গীতারম্ভে যদা পূর্ব্বং সমুচ্চার্য্যাক্ষরদ্বয়ং।
তালস্য ন্যাসনাদ্ ব্যক্ত স্তদৈবানাগত গ্রহ।
তালস্তদাতীত ইতি গ্রহঃ প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ।" "সঙ্গীত-সময়সার।

গ্রহ। উক্ত মতানুসারে ঐ গানে যদি অতীত গ্রহ করিতে হয়, তবে অগ্রে তালাঘাত দিয়া 'শাহ' বলিতে হয়: যথা,—

| শা .হ | জা :—.দে | আ : লম্ | তে : রে .লি য়ে

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত মতে ঐ গানটীতে সম গ্রহ হওয়ার সুবিধা নাই, কারণ সম গ্রহ করিতে হইলে 'শাহের' উপর তালি দিতে হয়, তাহাতে গানটী বেতালা হইয়া যায়; অথবা 'শাহ' পরিত্যাগ করিয়া 'জাদে' হইতে আরম্ভ করিতে হয়, তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত। তবে কি এরূপ মনে করিতে হইবে যে, সকল গানে সম, অতীতাদি, তিন প্রকার গ্রহ হয় না? প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বোধ হয় সে অভিপ্রায় নহে। অতএব উক্ত প্রকার সমাতীতের ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গানের পদ্যের বন্ধন বিভিন্ন প্রকার; সেই বন্ধনের ইতর বিশেষে, কোন গান প্রস্বনের উপর আরম্ভ হয়, কোন গান প্রস্বনের পর বা পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। কিন্তু নিয়মিত প্রস্বন যুক্ত সকল গানেই তাল আছে। তালের নিয়মগুলি যদি যুক্তিসংগত হয়, তাহা সকল গানেরই উপযোগী হইবে। অতএব সম, অতীত ও অনাগত নামক তালের গ্রহত্রয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রথম ব্যাখ্যাটীই ন্যায্য বোধ হয়। তালের যে কোন স্থান হইতেই গান আরম্ভ হউক, সমের উপর বা ফাঁকের উপর, অথবা ২য় বা ৩য় তালির উপরেই হউক, কিম্বা তাল পদের যে কোন মাত্রার উপরই আরম্ভ হউক, গানের সহিত তালের ঠেকা ঠিক সেই স্থান হইতে ধরাকে সম গ্রহ বলে; সেই হেতু উহার আর এক নাম 'সমপাণি', অর্থাৎ একই সময়ে বাঁয়া মৃদঙ্গাদিতে হাত ফেলা ও গান ধরা। ঐ স্থানের পূর্ব্বে ঠেকা ধরিলে অতীত, ও পরে ধরিলে অনাগত, গ্রহ হয়। এই নিয়ম সকল গানের পক্ষেই খাটে। গানকে প্রধান করিয়া বাদক যেমন তাহার সহিত ঐ তিন প্রকার গ্রহে ঠেকা বাজাইতে পারেন, বাদ্যকেও তদ্রূপ প্রধান করত, গায়ক ঐ তিন গ্রহ করিয়া গানারম্ভ করিতে পারেন।

ফলত ঐ গ্রহত্রয়ের যে ব্যাখ্যাই ন্যায্য হউক না কেন, উহা অবলম্বন করিয়া কেহ কখন তাল শিক্ষা করে না; এবং উহা অনবলম্বনে শিক্ষার বা সাধনার কিছুই ব্যাঘাত হয় না; বরং তদবলম্বনে গোলমালই বৃদ্ধি হয়। ইহাতেই বোধ হয় যে, তালের ঐ গ্রহত্রয় সংস্কৃত কোন গ্রন্থকারকের একটা মনগড়া নিয়ম মাত্র; উহার ব্যবহার কেবল 'ঢেকির কচকচি' সার। সংস্কারবিকৃত গোঁড়া লোকে বলিতে পারে যে, প্রাচীন কালীয় লোকের বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম ছিল, তাঁহারা যাহা যাহা করিতেন, তাহা আধুনিক কালের স্থুল বুদ্ধি লোকে বুঝিতে পারে না। ইহা যে কেবল কুতর্ক তাহার সন্দেহ নাই। ঐ গ্রহত্রয়ের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইতেছি। মনে কর, গায়কে এমন একটী নূতন

গান ধরিল যাহার উত্থান সমে, কি ফাঁকে, কি অন্য কোন তালে, তাহা কতক খানি না গাইলে, বুঝা যায় না ; এমন অবস্থায় বাদক সেই গানে উক্ত তিন গ্রহ কি প্রকারে দেখাইবে ? এ প্রকার গান সর্ব্বদাই হইতেছে। পুর্ব্বাহ্নে গানের অবস্থা বলিয়া না রাখিলে, তালের তিন গ্রহ করিয়া বাজান কখনই সম্ভবে না। কিন্তু তাহা কেহ কখন বলে না, এবং না বলাতে সঙ্গতের কোনই অসুবিধা হয় না, বাদক যে মুহূর্ত্তে তালটী বুঝিতেছে, তখনই ঠেকা ধরিতেছে। এই সকল কারণেই, সংস্কৃত গ্রন্থের ঐ গ্রহত্রয় সংগীত সমাজে প্রচলিত হয় নাই ; কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে। অনেক গায়ক ও বাদক অতীতানাগতের কোন অর্থ বুঝেন না ; অথচ গান বাদ্যের সময় অতীতানাগত করিতেছি বলিয়া যে ভাণ করেন, তাহা সকলই 'হাম্বাগ্' (মিথ্যা)।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, চৌতাল, ধামার প্রভৃতির প্রথম তালিকে ; কাওআলী, যৎ, প্রভৃতির দ্বিতীয় তালিকে ; রূপক ও তেওরার শেষ তালি বা ফাঁককে 'সম' বলা হয় কেন ? ইহার তাৎপর্য্য এই,—বাদক গানের সহিত যে ঠেকা ধরেন, তাহা গানের সহিত সমান ছন্দে চলিতেছে কি না, এবং তিনি বোল পরণ যেমন করিয়াই কেন বাজান না, তাহা গানের সঙ্গে সমান লয়ে যে চলিতেছে, তাহা তালের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, ঐ ঐ স্থানেই বিশেষ প্রকাশ করিয়া দেখান হয়, তজ্জন্যই উহার নাম 'সম' (তুল্য) রাখা হইয়াছে ; অর্থাৎ ঐ স্থানেই গানের সহিত ঠেকার সমান লয়ের (সম-গ্রহের) প্রমাণ।

কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকারের মতে 'বিষম' নামক গ্রহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেহ কেহ মনে করেন, গান বাদ্য 'আড়ে' ধরাকে বিষম-গ্রহ বলে। আড়ে গাওয়ার চলিত অর্থ এই যে, তাল ছন্দের প্রস্বনের উপর গানের যে অক্ষর স্বাভাবিক রূপে উচ্চারিত হয়, সেই অক্ষর প্রস্বন পড়িবার অর্দ্ধ মাত্রা পরে উচ্চারিত হইলে, তাহাকে আড বলে। কিন্তু এ অবস্থায় আড়ে গাওয়ারও সম, অতীত, অনাগত তিন প্রকার গ্রহই হইতে পারে। আবার সর্ব্বদা আড় করিয়া গাহিলে ঐ এক ছন্দই হইয়া যায়। যেমন কাওআলী আড করিয়া গাওয়াতে, আড়াঠেকার উৎপত্তি হইয়াছে ; ইহাতে তালের কোনই বৈষম্য নাই, যে তাহাকে বিষম-গ্রহ বলা যাইবে। তাহা হইলে কাওআলীর বিষম-গ্রহ আড়া, খেম্‌টার বিষম-গ্রহ আডখেম্‌টা, ঢিমা-তেতালার বিষম-গ্রহ মধ্যমান, এইরূপ বলিতে হয়। সংস্কৃত শ্লোক লক্ষণানুসারে বিষম গ্রহের অর্থ আদ্যন্তে গানের সহিত অনিয়মে ঠেকা ধরা*। তালের অনিয়মকে বেতালা অথবা

*"আদ্যন্তয়োরনিয়মো বিষম-গ্রহ শব্দ ভাক্॥" সঙ্গীত-দর্পণ।

ছন্দঃপতন কহে। ইহা কখন ঠেকা ধরার একটা নিয়ম হইতে পারে না। অতএব বিষম-গ্রহ নিতান্ত কৃত্রিম ও কল্পিত কথা। বোধ হয় সমের বিপরীত বিষম—সম-গ্রহ হইলেই তাহার একটা বিষম-গ্রহ চাই, এই বিবেচনায় কোন প্রাচীন গ্রন্থকার উহা কল্পনাভরে লিখিয়া দিয়াছেন; বাস্তবিক উহা তালের কোন নিয়ম নহে *।

লয়ের গতিভেদ ও তাহার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন সংগীত-শাস্ত্রকার লয়ের তিন প্রকার গতিভেদ করিয়াছেন; যথা—দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত †। ইহার যদি এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় যে, লয় ঐ তিন প্রকারের কমি বেশি হইতে পারে না, তাহা হইলে ঐ তিন লয়কে গানের গতি বলা যায় না; কারণ গান গাওয়ার গতি অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থাদির লক্ষণানুসারে উক্ত তিন প্রকার লয়ের অর্থ এই:—দ্রুতের দ্বিগুণ কালে মধ্য, এবং মধ্যের দ্বিগুণ কালে বিলম্বিত ‡; অর্থাৎ এক এক মাত্রায় এক একটী ক্রিয়া, কি না এক একটী স্বর, উচ্চারিত হইলে, তাহাকে যদি মধ্য লয় বলা যায়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াটী দুই মাত্রা ব্যাপক হইলে, বিলম্বিত লয় হইবে; এবং সেই এক মাত্রার কালে দুই দুইটী ক্রিয়া, বা বর্ণ, উচ্চারিত হইলে, তাহাকে দ্রুত লয় বলা যাইবে। ইহাকে ভাষা কথায় ঠা, দূন, ও চৌদূন বলে; যেমন মেচকের দূন কৌণিক, মেচকের চৌদূন দ্বিকৌণিক; আবার, মেচকের ঠা বিশদ. কৌণিকের ঠা মেচক, ইত্যাদি। অতএব, মনে কর, কাওআলীর সহজ এক ফেরের কাল মধ্যে যদি দুই ফের সম্পন্ন হয়, তাহাকে দ্রুত লয় বলা যায়; এবং ঐ সহজ এক ফেরের দ্বিগুণ কাল ব্যাপিয়া, যদি এক ফের মাত্র সম্পন্ন হয়, তাহাকে বিলম্বিত বলা যায়। যথা:—

---

* উক্ত সম অতীতাদি গ্রহ চতুষ্টয় সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাদিগের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝাতে, উহা তালের তিন তালি ও এক ফাঁক বলিয়া, অনেকের ভ্রান্তি আছে। পূর্ব্বে আমারও ঐ ভ্রম ছিল, কারণ তখন উহাদের সংস্কৃত লক্ষণ সকল আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, 'সঙ্গীতসার' ও 'মৃদঙ্গমঞ্জরীর' গ্রন্থকর্ত্তাগণ সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থাদি দেখিয়াও, ঐ ভ্রমে পতিত হইয়া, উক্ত চারি গ্রহের ঐ রূপ অশুদ্ধ ব্যাখ্যা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

† "তালঃ কাল ক্রিয়ামাণং লয়ঃ সাম্যমথাস্ত্রিয়াং।
বিলম্বিতং দ্রুতং মধ্যং তত্ত্ব মোঘং ঘনং ক্রমাৎ।" অমরকোষ।

‡ "দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমোমতঃ।
দ্বিগুণো দ্বিগুণো জ্ঞেয়ো তস্মান্মধ্য বিলম্বিতৌ॥" সঙ্গীত-দর্পণ।

মধ্য লয়। (সহজ)

+ ৩ ০ ১



| ধা : ধিন্ : ধিন্ : ধা | ধা : ধিন্ : ধিন্ : ধা | ধা : তিন্ : তিন্ : তা | না : ধিন্ : ধিন্ : ধা ||

দ্রুত লয়। (দূন)



+ ৩



| ধা .ধিন্ : ধিন্ .ধা : ধা .ধিন্ : ধিন্ .ধা | ধা .তিন্ : তিন্ .তা : না .ধিন্ : ধিন্ .ধা ||

| ধা .ধিন্ : ধিন্ .ধা : ধা .ধিন্ : ধিন্ .ধা | ধা .তিন্ : তিন্ .তা : না .ধিন্ : ধিন্ .ধা ||

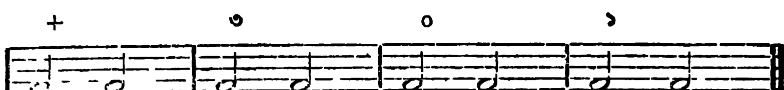
বিলম্বিত লয়। (ঢিমা)

+ ৩ ০ ১



| ধা :—: ধিন :— | ধিন :—: ধা :— | ধা :—: ধিন :— | ধিন :—: ধা :— |

+ ৩ ০ ১



| ধা :—: তিন :— | তিন :—: তা :— | না :—: ধিন :— | ধিন :—: ধা :— ||

উক্ত মধ্য লয়ে কাওআলীর তিন তালি ও এক ফাঁক লইয়া, চারি পদে চারি ছেদ লাগিয়াছে ; দ্রুত লয়ে ঐ চারি ছেদে দুই ফের সম্পন্ন হইয়াছে, কিম্বা দুই ছেদেই এক ফের নিষ্পন্ন হইয়াছে ; বিলম্বিত লয়ে ঐ প্রকার আট ছেদে তিন তালি ও এক ফাঁক লইয়া পূর্ণ এক ফের সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব মধ্যের অর্দ্ধকাল দ্রুতে এবং দ্বিগুণ কাল বিলম্বিতে। উহাতেই মালুম হইবে যে, ঐ দ্রুতের দ্বিগুণতর জলদ অর্থাৎ আট দূন করিয়া, এবং ঐ বিলম্বিতের দ্বিগুণতর ঠা করিয়া, গাওয়া বাজান অতীব দুঃসাধ্য। সেই জন্য উক্ত তিন প্রকার মাত্র লয়ের কথাই প্রচলিত আছে।

কাওআলী (তেতালা) ও চৌতাল ভিন্ন অন্য তালে ঐ প্রকার তিন লয়ে গাওয়া

বাজান সম্ভব হয় না ; কেননা চৌতাল ও তেতালার প্রত্যেক ছেদকে যে রূপ ২-এর শক্তি দ্বারা ভাগ করা যায়, অন্যান্য তালের ছেদকে সে রূপ করিয়া ভাঙ্গা যায় না। এই জন্য সেতারাদির গতে কাওআলী ও চৌতাল কিম্বা একতালা ভিন্ন অন্য তাল ব্যবহার হয় না ; কারণ ঠা-দুন ক্রিয়াই সেতারের গতের জীবন।

ঐ সকল তালের ঠেকার এক ফেরের কাল মধ্যে গানে তালের দুই ফের নিষ্পন্ন করাকে দূন কহে ; এবং ঠেকার দুই ফেরের কাল মধ্যে গীতাদিতে সেই তালের এক ফের সমাধা করাকে ঠা অর্থাৎ বিলম্বিত লয় কহা যায়। ধ্রুপদ গানেই ঐ রূপ ঠা-দূন করিয়া গাওয়া প্রসিদ্ধ ; তাহা যেরূপ করিয়া গাইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় ভাগে গানের স্বরলিপিতে পাওয়া যাইবে। পরন্তু উক্ত তিন প্রকার লয়ে গাওয়ার ও বাদনের রীতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঠা ও দূন, যাহাকে বিলম্বিত ও মধ্য বলা যায়, কিম্বা মধ্য ও দ্রুত বলা যায়, এই দুই প্রকার লয়ে গাওয়াই সচরাচর প্রচলিত ; কারণ তাহাই সহজ ও সুসাধ্য। চৌ-দূন গাওয়া বহুতর অভ্যাস সাপেক্ষ, সুতরাং সাতিশয় কঠিন কার্য্য। এই জন্য কখন কখন এরূপও মনে হয় যে, শাস্ত্রোক্ত দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতের অর্থ অন্য প্রকার, অর্থাৎ উহা গানের ব্যবহৃত তিন প্রকার সাধারণ গতির সংজ্ঞা মাত্র ; যেমন একটী গান ধীরে ধীরেও গাওয়া যায়, ও ত্রস্তও গাওয়া যায় ; এবং ঠাও নহে, দ্রুতও নহে, এমন যে গতি, তাহাই মধ্য লয়। বস্তুতঃ ঈদৃশ ব্যাখ্যার সহিত উক্ত শব্দগুলির প্রকৃত অর্থের মিল হয়।

এক্ষণে গানের গতি ভেদ হওয়ার কোন অর্থ আছে কি না, এবং কি কারণে ও কি প্রকার নিয়মে গতির বিভিন্নতা হওয়া উচিত, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা যাউক। গানের ব্যবহৃত মাত্রাকালের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই ; অর্থাৎ এক সেকেণ্ড, কিম্বা এক মিনিট, কিম্বা এক নাড়ী, অথবা এক নিমেষ, এ রূপ কিছুই নিরূপিত নাই, ইহা ১৬৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। মাত্রার পরিমাণ গায়কের স্বেচ্ছাধীন। এই হেতু একই গান ঠা—অর্থাৎ শ্লথ—গতিতে, এবং জলদ অর্থাৎ দ্রুত গতিতে, গাওয়া যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে এরূপ প্রথাই অধিক যে, গান ও গত্ প্রথমে ঠা-এ ধরিয়া, ক্রমে তাহার গতি বৃদ্ধি করত শেষে যখন আর দ্রুততর গাওয়া অসম্ভব বোধ হয়, তখন ক্ষান্ত দেওয়া হয়। সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের লিখিত দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত, এই তিন প্রকার লয়ের বর্ণনা হইতে ঐ কুপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। উহার এ রূপ তাৎপর্য্য নহে যে, প্রত্যেক গানই ঐ তিন প্রকার লয়ে গীত হইবে। সংগীত-ব্যবসায়ী ওস্তাদদিগের কুশিক্ষা ও অবিবেকতা নিবন্ধন হিন্দু সংগীতে ঐ প্রকার নানা ব্যভিচার প্রবিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক গানের রস ও ভাবার্থানুসারে তাহার লয়ের গতি নিরূপিত হওয়া উচিত,

যেমন, কোন গম্ভীর বা উন্নত ভাব, কিম্বা ভয়, হতাশ, শোক, চিন্তা, গর্ব্ব, প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ, শান্তি, প্রভৃতি ব্যঞ্জক গান সকল নরম আওয়াজে গীত হওয়া উচিত, তেমনি তাহাদের গতি শ্লথ, অর্থাৎ ঠা, হওয়া উচিত; যে সকল গানে প্রশংসা বা যশোবর্ণন হয়, কিম্বা কোন প্রবল বাসনা, সংকল্প, উদ্বেগ, ক্রোধ, তেজ, ব্যস্ততা, আনন্দ, আশা, ব্যঙ্গ, প্রভৃতির ভাব প্রকাশ পায়, তাহারা যেমন প্রবল ধ্বনিতে গীত হইবে, তেমনি তাহাদের গতিও দ্রুত হইবে। কিন্তু আমাদের সংগীতাচার্য্য ও ব্যবসায়ী ওস্তাদগণের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা বশতঃ আধুনিক হিন্দু সংগীতে ঐ সকল বিষয়ের কোন বিচার নাই। অভ্যুদিত বংশীয় শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে সংগীতালোচনার বৃদ্ধির সহিত ঐ সকল বিষয়ে লোকের সুরুচি উদিত হইবে, ইহা সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে।

গানের সুর কোথাও প্রবল, কোথাও দুর্ব্বল রবে গাওয়ার বিষয়, স্বরলিপিতে প্রকাশ রাখার জন্য, তদুপযোগী কতকগুলি সংকেত যেমন সুরের মাথায় প্রয়োগ হয়, যাহা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রকটিত হইয়াছে, সেই রূপ কোথাও দ্রুত, বিলম্বিত প্রভৃতি গতিতে গাওয়ার জন্য, তদর্থ জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ শব্দ সুরাবলির উপরিভাগে ব্যবহার হইবে; যেমন ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অল্প ধীরে; দ্রুত, অতি দ্রুত, অল্প দ্রুত, ঈষৎ দ্রুত, ইত্যাদি।

গানের কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের রসানুরোধে, গায়ক সেই স্থানের গতি স্বীয় ইচ্ছানুরূপ দ্রুত কিম্বা বিলম্বিত করিবেন, অথবা সম লয়ে উচ্চারণ, কিম্বা কোন অলংকার প্রয়োগ করিবেন, তজ্জন্য, তথায় "ইচ্ছামত" এই কথা লিখা থাকিবে। তলের স্বাভাবিক লয় ভঙ্গ করিয়া, যেখানে দ্রুত, বা বিলম্বিত গতিতে গাওয়া হয়, তাহার পরে আবার সমান লয়ে গাইতে হইলে, সেই স্থানে—"লয়ে"—এই কথাটি লিখা থাকিবে।

মাত্রামান যন্ত্র।

নব্য শিক্ষার্থীর পক্ষে বিনা সাহায্যে, গানের আদ্যোপান্তে লয়ের গতি সমান ও অপরিবর্ত্তিত রাখা, সহজ নহে। সংগতকার দ্বারা বাঁয়াদির ঠেকাও সম্যক সাহায্যপ্রদ হয় না; কেননা ঠেকার বাদ্যে সময়ের বিভাগ প্রায়ই সে রূপ স্পষ্ট ভাবে থাকে না। অতএব সমান লয়ের সাধন জন্য হস্তে, কিম্বা পায়ে, তালি দিবার যথেষ্ট অভ্যাস রাখিতে

হয়। ইউরোপে ঘটী যন্ত্রের দোলকের নিয়মে "মাত্রামান" (মেট্রনোম্) নামক* এক প্রকার যন্ত্র বহু কাল প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার দোলকের দোলনের সহিত একটী ধ্বনি হইতে থাকে, তদ্দ্বারা প্রথম শিক্ষার্থীর লয় অভ্যাস করার যথেষ্ট সাহায্য হয়। মাত্রা মানের দোলকের শিরোদেশে একটী ভার সংলগ্ন থাকে, তাহা উপর নীচে সরাইয়া দিলে দোলনের গতি ঠা দুন হয়; এবং সেই ভারেরসরহদ্দ যন্ত্রের গাত্রে, গতির অনুপাতানুসারে অঙ্কপাত করা থাকে; সেই অঙ্ক দ্বারা গতির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়। তাহারই কোন পরিমাণকে মাত্রা রূপে গ্রহণ করিয়া, গানের তাল সাধনা করার সুন্দর সুবিধা হয়। বিলম্বিত গতির অঙ্ক ৫০ হইতে ১০০; মধ্য গতির অঙ্ক ১০০ হইতে ১৬০, দ্রুত গতির অঙ্ক ১৬০ হইতে ২০৮।

আমাদের প্রচলিত তালসমূহ সচরাচর যে যে ওজনে বাদিত হয়, সেই সেই গতিতে মাত্রার কালপরিমাণ কত খানি, তাহার নিরিখ মাত্রামান যন্ত্রের কোন্ কোন্ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা নিম্নে তালিকাবদ্ধ হইল :—

কাওআলী,	...	চতুর্মাত্রিক পদের মাত্রা	—	♪	=	১৬০
ঐ	...	দ্বিমাত্রিক পদের মাত্রা	—	♩	=	৮০
ঢিমা-তেতালা,	...	... ... মাত্রা	—	♩	=	৮০
মধ্যমান,	...	... ... মাত্রা	—	♩	=	৮০
আড়াঠেকা,	...	চতুর্মাত্রিক পদেব মাত্রা	—	♪	=	১৬০
ঐ	...	দ্বিমাত্রিক পদের মাত্রা	—	♩	=	৮০
ঠুংরী,	...	চতুর্মাত্রিক পদের মাত্রা	—	♪	=	২০০

* এই যন্ত্র (*Metronome*) কলিকাতায় ইউরোপীয় বাদ্য যন্ত্রাদির দোকানে পাওয়া যায়।

ঠুংরী ...	দ্বিমাত্রিক পদের মাত্রা	—	১০০
আদ্ধা, .	দ্বিমাত্রিক পদের মাত্রা	—,	১০০
ছেপ্‌কা, ...	ঐ ঐ মাত্রা	— ♩	১১২
কহারবা, .	ঐ — ঐ মাত্রা	— ♩ =	১১২
একতালা, ...	... .. মাত্রা	— ♩ =	১৩৮
চৌতাল, .	... .. মাত্রা	— ♩ =	১০০
আড়খেম্‌টা, ...	... .. মাত্রা	— ♪ =	১৬০
খেম্‌টা, প্রত্যেক পদ বা তালি	—	— ♩ =	৮০
অথবা মাত্রা — ♪ = ১১২র অর্দ্ধ কাল	.. ...	=	২২৪
ভব্‌তঙ্গা, ...	... ... মাত্রা	— ♪ =	১৭৬
যত, ... মাত্রা — ♪ = ১৩৮এর	অর্দ্ধ কাল		২৭৬
অথবা প্রত্যেক দুই তালি ..		— 𝅗𝅥 =	৪০
পোস্তা, প্রত্যেক দুই তালি ...		— 𝅗𝅥 =	৪০
ধামার, ...	... ... মাত্রা	— ♪ =	১৯২
তেওট, ...	.. ... মাত্রা	— ♩ =	১১২
রূপক, ...	... ... মাত্রা	— ♩ =	১০০
আড়াচৌতাল,	... ... মাত্রা	— ♩ =	৯৬
তেওরা, ...	... মাত্রা	— ♪ =	২০৮
ঝাঁপতাল,	... ... মাত্রা	— ♪ =	১৯২
সুরফাক, ...	... ... মাত্রা	— ♪ =	১৭৬
পঞ্চমসওআরী,	... ... মাত্রা	— ♪ =	১৮৪

গান-বিশেষে ঐ সকল তাল কখন ঠা, কখন দ্রুত, রূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে সেই ঠা ও দ্রুতের অসংখ্য প্রকার গতি হইতে পারে; ও সেই সকল গতিরও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঐ মাত্রামানের অন্যান্য অঙ্ক দ্বারা সংকেতিত করা যায়। গানের স্বরলিপির উপরে, তালি কিম্বা মাত্রা= ম. ১০০, অথবা ♩= ম. ১১২, এই প্রকারে লিখিত

হইবে; সেই অঙ্কের উপরে দোলকের ভারটী সরাইয়া দিলে, তাহার দোলনের কালে আবশ্যকীয় লয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সংগীতে গীতাদির গতির এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন হয় না; যখন হইবে, তখনকার জন্য ঐ নিয়ম রহিল। উহার বিশেষ প্রয়োজন এই রূপ:—মনে কর, স্বর-রচয়িতা অনেক যত্ন ও বিবেচনার সহিত একটী গানে সুর ও তাল সংযোজনা করত স্বরলিপি করিলেন; সেই গানটী কি গতিতে গাইলে তাঁহার মনোমত রসের উদ্দীপনা হইবে, তাহা ঐ প্রকার মাত্রামানের অঙ্কপাত ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট হওয়ার উপায়ান্তর নাই। অতএব মাত্রামান অতীব প্রয়োজনীয় যন্ত্র। কিন্তু এখনও আমাদের প্রচলিত সংগীতে তাহার প্রয়োজন হয় নাই, ও তাহা কেহ ব্যবহার করিতেও শিখে নাই। স্বরলিপির ব্যবহারের সহিত উহারও প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। সুর-শলাকা (টিউনিং ফর্ক) দ্বারা যেমন সুরের ওজন নির্দ্দিষ্ট হয়, মাত্রামান দ্বারা তেমনি কালের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উপরে যে মাত্রামান যন্ত্রের কথা বলা হইল, তাহা কিছু মহার্ঘ। আমাদের সংগীতে মাত্রামানের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইলে, স্বল্প মূল্যের যন্ত্রাদি ক্রমে এই দেশে প্রস্তুত হইতে থাকিবে। সম্প্রতি নিজে নিজে এক প্রকার "সূত্রদোলক" দ্বারা মাত্রামান প্রস্তুত করার এক সহজ উপায় বলা যাইতেছে। পৈতা কিম্বা তত্তুল্য কোন সূতার একাগ্রে দেড় পয়সার ওজন পরিমাণ এক ক্ষুদ্র ভার বাঁধিয়া, সেই ভার হইতে ৪$\frac{5}{8}$ ইঞ্চি অন্তরে ঐ সূতায় একটী গ্রন্থি দিয়া, সেই গ্রন্থিতে সূতা ধরিয়া দোলাইলে, আন্দাজ এক মিনিটে ১৬০ বার করিয়া দুলিবে; তাহা পূর্ব্বোক্ত মাত্রামান যন্ত্রের ১৬০ অঙ্কের সমান। ঐ সূত্র দোলকের কোথায় কোথায় ধরিয়া দোলাইলে, বাকি অঙ্কগুলি পাওয়া যাইবে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে। যথা:—

ভার হইতে	...	৪$\frac{5}{8}$ ইঞ্চি	অন্তরে	=	ম. ১৬০
„ „	...	৬$\frac{1}{2}$ ইং	„	=	ম. ১৩৮
„ „	...	৯$\frac{1}{2}$ ইং	„	=	ম. ১১২
„ „	...	১৩$\frac{5}{8}$ ইং	„	=	ম. ৯৬
„ „		১ ফুট ৭$\frac{3}{4}$ ইং	„	=	ম. ৮০
„ „		২ ফুট ৬$\frac{3}{8}$ ইং	„	=	ম. ৬৬
„ „		৩ ফুট ১০$\frac{5}{8}$ ইং	„	=	ম. ৫০

১৬শ পরিচ্ছেদ ঃ—রাগাদির গ্রাম-নিরূপণ।

প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে স্বর সাধনের উপদেশ প্রদান কালীন প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহাদের স্বাভাবিক গ্রাম অভ্যাস হইয়া, সারগম জ্ঞান হওয়ার পরও, কড়ি-কোমল স্বর অভ্যাস করা অতিশয় কঠিন হয়। ইহাতেই নিশ্চয় হইয়াছে যে, কড়ি-কোমলযুক্ত ঠাট কখনই স্বাভাবিক নহে। কড়ি-কোমল স্বর বিশুদ্ধ উচ্চারণ করার যে উপায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, তাহা, ও অন্যান্য কোন উপায়, দ্বারা বিকৃত ঠাট প্রথমশিক্ষার্থীকে সহজে অভ্যাস করাইতে পারা যায় না। কিন্তু কড়ি-কোমল স্বরবিশিষ্ট গান শুনিয়া, অশিক্ষিত লোকেও অস্বাভাবিক মনে করে না, বরং সন্তুষ্টই হয়; এবং সার্‌গমের সম্পর্ক না রাখিয়া, মুখে মুখে কড়ি-কোমলযুক্ত রাগের গান শিক্ষা দিলে, ছাত্রেরা অনায়াসে শিক্ষা করে। ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, অনেক রাগ-রাগিণীর স্বাভাবিক প্রকৃত ঠাট এখনও বাহির হয় নাই; যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা রাগাদির স্বাভাবিক ঠাট নহে, কারণ স্বাভাবিক ঠাট হইলে, স্বরলিপি দ্বারা অনায়াসে প্রথম শিক্ষার্থীরা ঐ ঠাট অভ্যাস করতঃ, তাহাতে গান আদায় করিতে পারিত। ইহাতে কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, এ পর্য্যন্ত কত বিখ্যাত যন্ত্রী ও গায়ক হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা যে সকল ঠাটে রাগাদি গাইয়া বাজাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক নহে ত কি? ইহার উত্তর এই যে, সার্‌গম জ্ঞান মাত্রও নাই, এমন অনেক লোক অতি প্রসিদ্ধ গায়ক ও যন্ত্রী হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাঁহারা বাল্যকাল হইতে তোতাপাখীর ন্যায় মৌখিক অভ্যাস সহকারে গান গাইয়াছেন। পরন্তু সারগম্ জ্ঞানাভাবে গ্রামজ্ঞান হইতেই পারে না; অতএব তাঁহারা যে ঐ প্রচলিত ঠাটেই গাইতেন, এ কথা কে বলিল? তাহাই এই প্রস্তাবের বিবেচ্য।

যাঁহারা রাগ-রাগিণীর সার্‌গম ও ঠাট স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বরজ্ঞান থাকিতে পারে; কিন্তু গ্রামবোধ ছিল কি না সন্দেহ*। প্রচলিত রাগের মধ্যে এখনও অনেকের ঠাট নিশ্চয় হয় নাই; সেতারে খাম্বাজের গত্ ম-এর খরজে বাদিত হইয়া, তাহা সিন্ধু বলিয়া পরিচিত হয়; ভৈরবী প-এর খরজে বাদিত ও গীত হইয়া, সিন্ধু-ভৈরবী বলিয়া পরিচিত হয়; সিন্ধু রি-এর খরজে গীত হইলে, ভৈরবীর ন্যায় বোধ হয়;

---

* অধুনা যাঁহারা গীতাদির স্বরলিপি করেন, তাঁহাদের স্বরজ্ঞান থাকা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু তাঁহারা রাগাদির প্রচলিত ঠাট পূর্ব্বাবধি অবগত থাকেন বলিয়াই, তদনুসারে গানের সার্‌গম বাহির করেন। এই স্বরজ্ঞান যে যথেষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ তাঁহারাই পাইবেন, যখন তাঁহারা তাম্বুরা কি অন্য কোন যন্ত্রের সঙ্গত বিহীনে, অনবগত রাগের গীতের সার্‌গম বাহির করিবেন, কিম্বা ইউরোপীয় ব্যাণ্ড-বাদ্য শুনিয়া তাহার কোন গতের সার্‌গম লিপিবদ্ধ করতঃ, তাহা পুস্তকের সহিত মিলাইবেন।

পিলু ম-এর খরজে গীত হইলে, কালাংড়ার ন্যায় বোধ হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ লোকের ম-এর খরজই কালাংড়ার স্বাভাবিক ঠাট বলিয়া বিশ্বাস ছিল, এবং এখনও অনেকের আছে। বাগেশ্রীর রি ও ধ, আড়ানা ও বাহারের ধ, মালকোশের ধ ও নি, কেহ বলেন কোমল, কেহ বলেন স্বাভাবিক; ধনশ্রীর ঠাট এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই, কেহ বলেন তাহার গ মূলতানির ন্যায় কোমল, কেহ বলেন শ্রীর ন্যায় স্বাভাবিক। অনেককে সেতারে ভৈরবীর গত্ সা-এর স্বাভাবিক ঠাটে বাজাইতে দেখা গিয়াছে; যাত্রা ও কথকতা ব্যবসায়ীরা কোমল স্বরবিশিষ্ট রাগের গান প্রায়ই স্বাভাবিক ঠাটে গাইয়া থাকেন, অথচ কেহই তাহা অস্বাভাবিক বা কুশ্রাব্য মনে করে না।

প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থসকলে রাগাদির যে যে প্রকার ঠাট প্রকাশ আছে, আধুনিক ঠাটের সহিত তাহার কিছুই ঐক্য হয় না। "ভিন্ন ষড়্জসমুৎপন্নো ভৈরবোপি রি-বর্জ্জিতঃ"*,—ভৈরব, ভিন্ন খরজ হইতে, উৎপন্ন হয়; ইহার তাৎপর্য্য কি? প্রাচীন সংগীতের সা আধুনিক সংগীতের সা হইতে ভিন্ন, কেন না তাহা বিকৃত হইত; প্রাচীন সংগীতের গ্রাম, এবং শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর, আধুনিক সংগীত হইতে অনেক ভিন্ন। কিন্তু প্রাচীনকালে যে সকল রাগ-রাগিণী প্রচলিত ছিল, এখনও তাহারা ব্যবহৃত হইতেছে। অধুনা কড়িকোমল স্বরবিশিষ্ট রাগসকল যে যে প্রকার ঠাটে সম্পাদিত হয়, সেই প্রকার ঠাটে নিষ্পন্ন কোন রাগই কি সে কালে ছিল না? এমন কখনই হইতে পারে না। সে কালে যখন এত প্রকার রাগ প্রচলিত ছিল, তাহাদের কেহ না কেহ আধুনিক মতের ভৈরব, ভৈরবী কিম্বা কানড়ার ন্যায় কোমল ঠাটে অবশ্যই গীত ও বাদিত হইত। কিন্তু ঐ প্রকার কোমল ঠাট প্রাচীন মতের গ্রাম মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতেই নিশ্চয় হইতেছে যে, ঐ প্রকার কোমল ঠাট সেকালে অন্য কোন কৌশলে নির্ব্বাহ হইত। সেই জন্য সন্দেহ হয় যে, অধুনা কোমল স্বরযুক্ত রাগ-রাগিণীর যে প্রকার ঠাট প্রচলিত আছে, তাহা উহাদের প্রকৃত ঠাট নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে যে, প্রাচীন মতে স্বর প্রকরণের মধ্যে এমন কোন কৌশল প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, যদ্দ্বারা স্বাভাবিক গ্রামকে নানা প্রকার ঠাটে পরিণত করা যাইতে পারে। উত্তর পাওয়া যায়:—স্বর-গ্রামের মূর্চ্ছনাই সেই কৌশল†। প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থ সকলে রাগ-রাগিণীর যে প্রকার মূর্চ্ছনা নির্দ্দেশিত আছে, তদ্দ্বারা রাগের ঠাট অনেক সময়ে নির্ণয় হয় না, ইহা সত্য বটে; তাহার কতক কারণ গ্রন্থকারদিগের লিখার দোষ; কতক কারণ রাগাদির প্রাচীন মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন। মূর্চ্ছনার সহিত প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ঠাটের কিরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা নিম্নে

* সংস্কৃত সঙ্গীত-নির্ণয়। † ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রদর্শিত হইয়েছে। ইহাতে আধুনিক সংগীতের স্বাভাবিক গ্রামই ব্যবহার হইবে; প্রাচীন কালীয় ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম রাগাদির আধুনিক মূর্ত্তির উপযোগী নহে। পূর্ব্বে ৩য় পরিচ্ছেদে স্বরগ্রামের বিবরণে উক্ত হইয়াছে যে, গ্রামস্থ স্বরসমূহের মধ্যস্থিত পূর্ণ ও অর্দ্ধ, এই দুই প্রকার অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনে, গ্রামের বিভিন্ন অবস্থা হয়; তাহাকেই ঠাট বলে। সেই ঠাট অধুনা কড়ি-কোমল যোগেই নিষ্পন্ন হইতেছে। অতএব ঠাট বিভিন্ন হওয়ার মূল কারণ গ্রামের পূর্ণ ও অর্দ্ধান্তরের স্থান-ভেদ। নিম্নে দৃষ্টি হউক*; যথা:—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১. স—র—গ+ম—প—ধ—ন+স১। { স্বাভাবিক ঠাট। সা-মূর্চ্ছনা

১ ২ ৩
২. { স—র+গো—ম—প—ধ+নো—স১।—সিন্ধুর ঠাট।
র—গ+ ম—প—ধ—ন+ স —র১।—রি-মূর্চ্ছনা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৩. { স+রো—গো—ম—প+ধো—নো—স১।—ভৈরবীর ঠাট।
গ+ ম — প —ধ—ন+ স — র —গ১।—গ-মূর্চ্ছনা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৪. { স—র—গ—মী+প—ধ—ন+স১।—ইমনের ঠাট।
ম—প—ধ—ন +স—র—গ+ম১।—ম-মূর্চ্ছনা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৫. { স—র—গ+ম—প—ধ—নো—স১।—ঝিঁঝোটীর ঠাট।
প—ধ—ন+স—র—গ+ ম —প১।—প-মূর্চ্ছনা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৬ { স—র+গো—ম—প+ধো—নো—স১।—কানড়ার ঠাট।
ধ—ন+ স —র—গ+ ম —প —ধ১।—ধ-মূর্চ্ছনা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৭. { স+রো—গো—ম+পো—ধো—নো—স১।—অপ্রচলিত।
ন+ স — র —গ+ ম — প — ধ —ন১।— নি-মূর্চ্ছনা।

উক্ত নি-মূর্চ্ছনা দরবারি তোড়ির ঠাট ছিল বলিয়া বোধ হইতে পারে; আধুনিক

* কসি পূর্ণান্তরের সঙ্কেত; যোগ-চিহ্ন অর্দ্ধান্তরের সঙ্কেত। ১২ অঙ্ক সাতটী অন্তরের সংখ্যা। স্বরাক্ষরে ওকার কোমলের, ও ঈকার কড়ির, সঙ্কেত।

কালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত আরও যে কয়েকটী ঠাট বাকী রহিল, তাহা বিকৃত মূর্চ্ছনা দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যথা :—

১.
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
স+রো+–গ+ম—প+ধো—নো—স১ ।—ভৈরবের ঠাট।
গ+ ম +—পী+ধ—ন+ স — র —গ১ ।—বিকৃত গ মূর্চ্ছনা।

২.
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
স+রো+—গ+ম—প+ধো—+ন+স১ ।—কালাংড়ার ঠাট।
গ+ ম +—পী+ধ—ন+ স—+রী+গ১ ।—বিকৃত গ-মূর্চ্ছনা।

৩.
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
স—র+গো—ম—প+ধো+—ন+স১ ।—পিলুর ঠাট।
ধ—ন+ স —র—গ+ ম +—পী+ধ১ ।—বিকৃত ধ-মূর্চ্ছনা।

৪
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
স+রো—গো—+মী+প+ধো—নো—স১ ।—দরবারি-তোড়ির ঠাট।
গ+ ম — প —+ধী+ন+ স — র —গ১ ।– বিকৃত গ-মূর্চ্ছনা।

৫.
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
স+রো—গো—+মী+প+ধো—+ন+স১ ।—মুলতানির ঠাট।
গ+ ম — প —+ধী+ন+ স —+রী+গ১ ।—বিকৃত গ-মূর্চ্ছনা।

শ্রী, গৌরী, পুরবী, পরজ প্রভৃতি রাগাদি বিকৃত সা-মূর্চ্ছনায় নিষ্পন্ন হয়, এবং প্রচলিত ঠাটই উহাদের স্বাভাবিক। মূর্চ্ছনাও তিন জাতি :—ঔড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ। হিন্দোল, ভূপালী, বৃন্দাবনী-সারঙ্গ, প্রভৃতি রাগ ঔড়ব সা-মূর্চ্ছনা সম্ভূত। ললিত, বসন্ত, মেঘ, মারোআ, পুরিয়া প্রভৃতি রাগ খাড়ব সা-মূর্চ্ছনা সম্ভূত।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
স+০—গো—ম—০+ধো—নো—স১ ।—মালকোশ ঠাট।
গ+০— প —ধ —০+ স —র —গ১ ।—ঔড়ব গ-মূর্চ্ছনা।

উল্লিখিত কয়েক প্রকার ঠাটে শত সহস্র প্রকার রাগ-রাগিণী লিখা যাইতে পারে।*

---

* রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়, স্বরগ্রামের মধ্যে অর্দ্ধান্তরের নানাবিধ স্থানভেদ করিয়া ঔড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ, এই তিন জাতির সহিত উলটপালট ক্রমে শতাধিক প্রকার ঠাট প্রস্তুত পূর্ব্বক, তাহা হিন্দু সঙ্গীতের ব্যবহার্য্য বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা সাধারণকে ভ্রান্তিজালে জড়িত করা হইয়াছে। এতপ্রকার ঠাটের কোনই অর্থ নাই, এবং তাহা হিন্দু সঙ্গীতে ব্যবহারও হয় না। যে কয়েক প্রকার ঠাট যথার্থ ব্যবহার হয় তাহাই পরে প্রদর্শিত হইল।

এই রূপে, রাগাদি লিখিবার জন্য যে নূতন গ্রামের উৎপত্তি স্থির করা যাইতেছে, হিন্দু সংগীতের প্রাচীন মতের সহিত ইহার উত্তম সামঞ্জস্য হয়। মূর্চ্ছনার যদি কোন কার্য্যিক অর্থ থাকে, তাহা হইলে উহাই তাহার ন্যায্য ব্যবহার বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে যদি কেহ মূর্চ্ছনার অন্য প্রকৃতার্থ আবিষ্কৃত করেন, তাহা হইলেও, প্রাচীন মতের সহিত প্রস্তাবিত উপপত্তির কেবল সামঞ্জস্য মাত্র হইবে না; এবং তাহাতে ঐ উপপত্তিরও কোন হানি হইবে না; তাহার বিচার ক্রমে হইতেছে।

কোমল-গ ও কোমল-নি যুক্ত ঠাটে যে সকল রাগিণী গীত হইতেছে, যেমন সিন্ধু, কাফী, সাহানা, আড়ানা, ইত্যাদি, স্বাভাবিক গ্রামই তাহাদের প্রকৃত ঠাট, কেবল র-তে তাহারা আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়—প্রাচীন মতে যাহাকে গ্রহ ও ন্যাস বলে। গ্রহ ও ন্যাসের এই প্রকার অর্থই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, নতুবা অন্য কি অর্থ, তাহা বুঝা যায় না। ঐ সকল রাগিণীতেই রি বাদী ও ধ সম্বাদী; এই রূপে বাদী, সম্বাদী প্রভৃতিরও অর্থ ও প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। রি-এর সহিত ধ-এর মিল রাখার কারণ ঐ সকল রাগিণীতেই ধ কে এক অংশ কড়া করিয়া লইতে হয়, নতুবা উহা রি-এর পূর্ণ সম্বাদী (পঞ্চম) হয় না। ঐ প্রকার রাগসকলকে রি-মূর্চ্ছনা অথবা রি-ঠাটের রাগ বলা যাইতে পারে।

অন্যান্য রাগ সম্বন্ধেও ঐরূপ, অর্থাৎ কেহ গ-ঠাটের, কেহ প-ঠাটের, কেহ ধ-ঠাটের রাগ।

ভৈরবী গ-ঠাটের রাগিণী; স্বাভাবিক গ্রামই উহার প্রকৃত ঠাট; গ উহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস; অর্থাৎ উহা উপর নীচে সর্ব্বত্র বিচরণপূর্ব্বক গ-এর উপরে বিশ্রাম লয়, ও সমাপ্ত হয়।

প্রস্তাবিত উপপত্তির বিরুদ্ধে আশু এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, কোমল ঠাটের বিকৃত স্বরগুলির সহিত সা-এর যে সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, যে সম্বন্ধ অনুসারে উহাদিগকে চিনা যাইতেছে, উক্ত অভিনব ঠাটে বিকৃত স্বরবিশিষ্ট রাগাদি গীত ও বাদিত হইলে, ঐ সম্বন্ধ লোপ পাইয়া তাহারা বেসুরা ও বিরস হইয়া যাইবে। অধুনা যে রীত্যনুসারে তাম্বুরা মিলাইয়া তাহার সহিত গাওয়ার প্রথা প্রচলিত, সেই রূপ সঙ্গতের সহিত উক্ত অভিনব রীতিতে রাগাদি গাইলে, উল্লিখিত সম্বন্ধের ব্যাঘাত হইয়া রাগ বেসুরা হইতে পারে। কিন্তু ১৩শ পরিচ্ছেদে তাম্বুরার স্বর বাঁধার যে নূতন পদ্ধতির প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই নিয়মে আবদ্ধ তাম্বুরার সঙ্গতে গীতাদি গাইলে, উক্ত রসহীনতার কোন আশঙ্কা থাকে না।

বর্তমান পরিচ্ছেদে রাগাদির যে অভিনব ঠাটের প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহাতে কেবল গীত ও গতাদি স্বরলিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিতেই যে-কিছু বিভিন্নতা হইতেছে; প্রত্যুত, গাইতে ও শুনিতে সকলেই সমান। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, গাইতে ও শুনিতে যদি সকল সমান, তবে এই নূতন পদ্ধতির প্রয়োজন ও উপকার কি? তাহার উত্তর এই যে, কোন্ পদ্ধতি নূতন, কোন্ পদ্ধতি প্রাচীন, তাহার নিশ্চয় নাই। যে পদ্ধতিকে প্রাচীন মনে করিতেছ, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে আমার ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রণীত সংগীত গ্রন্থে রাগাদি যে পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতির ঠাট প্রাচীন আর্য্যদিগের সময়ে প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ নাই; বরং না থাকারই কতক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। আর বিশেষ কোন পদ্ধতি প্রাচীন হইলেই বা কি? আমাদের দেশে বিজ্ঞানের নিয়মে সংগীতের চর্চ্চা হওয়া এখনও আরম্ভ হয় নাই; তাহার এই সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র; এবং সংগীতের ভাষ্য ব্যাকরণ এই প্রস্তুত হইতেছে। অতএব এখন হইতেই বিজ্ঞানানুমোদিত পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়া উচিত; কারণ তাহাই স্বাভাবিক ও সহজ। প্রথমেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, প্রথম শিক্ষার্থীদের কড়ি-কোমল স্বর বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অতিশয় কঠিন হয়। প্রস্তাবিত ঠাটে লিপিবদ্ধ স্বর দৃষ্টে শিক্ষার্থীগণ অতি সহজে গাইতে পারে, ইহা সামান্য উপকার নহে। অতএব যে পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তাহাই স্বাভাবিক ও অবলম্বনীয়। স্বাভাবিক গ্রামের মধ্যে যদ্যপি প্রয়োজনীয় কড়ি-কোমল পাওয়া যায়, তজ্জন্য অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি? স্বাভাবিক গ্রাম মধ্যে যে সকল কড়ি-কোমল পাওয়া যায়, তাহাকে বিকৃত স্বর বলা যায় না। স্বাভাবিক গ্রাম মধ্যে যে স্বর পাওয়া যায় না তাহাই বাস্তবিক; বিকৃত।

হিন্দুস্থানে স্বরলিপি দেখিয়া গান বাদ্য শিক্ষা করার রীতি না থাকাতে, উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা হয় নাই। অধুনা রাগাদির যে প্রকার ঠাট প্রচলিত দৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই বীণকার, রবাবী, সেতারী প্রভৃতি যন্ত্রীদিগের বাদন-প্রথানুসারেই নিরূপিত হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্র এরূপে গঠিত নহে যে, যে স্বর ইচ্ছা, তথা হইতেই, অর্থাৎ যে-সে স্বরকে খরজ করিয়া, রাগাদি বাদন করা যায়; সেই জন্যই একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া, তথা হইতেই সকল রাগ উত্থাপিত হওয়ার প্রথা হইয়াছে; এবং রি-মূর্চ্ছনা, গ-মূর্চ্ছনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বরের গ্রাম ব্যবহৃত না হইয়া, তাহাদের পরিবর্ত্তে কড়ি কোমলযুক্ত ঠাটের উদ্ভব হইয়াছে। সেই হইতেই বোধ হয় রাগাদির প্রাচীন সারগম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

কড়ি-কোমল স্বর গায়ক ও বাদকদিগের মধ্যে যে প্রকার অনিশ্চিত ওজনে ব্যবহৃত

হইতেছে, এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় বিকৃত স্বরবিশিষ্ট রাগাদির স্বাভাবিকত্ব ও রঞ্জনশক্তি প্রতিপন্ন হইতে পারিত না। তোড়ি, ভৈরবী, প্রভৃতিতে সাতখানি স্বরের মধ্যে চারিখানি বিকৃত হইয়াও, কিছুই অস্বাভাবিক শুনায় না; বরং সাধারণের কেমন প্রিয়! কিন্তু দরবারি-তোড়ির সব অঙ্গ ভৈরবীর ন্যায় হইয়াও. কেবল কড়ি ম-এর জন্য অস্বাভাবিক হইয়াছে; ও সেই হেতু সমজ্‌দার ভিন্ন সাধারণের প্রিয় হইতে পারে নাই। উক্ত অনিশ্চয়তা ঢাকিবার জন্যই, বিকৃত স্বরের উপর এতাধিক কম্পন ও মিড প্রয়োগের প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু যে প্রকার নূতন ঠাটের প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক বিকৃত স্বর নির্দিষ্ট ওজনে দণ্ডায়মান হইতেছে। এই সুবিধা অপ্রয়োজনীয়, কিম্বা সামান্য নহে। এই সকল কারণে প্রস্তাবিত পদ্ধতি সকলাপেক্ষা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা হয়।

ভৈরব, কালাংড়া, পিলু, তোড়ি প্রভৃতি রাগাদির যে নূতন ঠাট প্রদর্শিত হইয়াছে, অনেকে তাহা প্রচলিত ঠাটাপেক্ষা কঠিন মনে করিতে পারেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ সকল বিকৃত মূর্চ্ছনার ঠাট যে অতিশয় কঠিন, তাহার সন্দেহ নাই; অনেক অধ্যবসায় ও যত্নে উহা আয়ত্ত হয়; এই জন্যই উহাদের বিকৃত নাম দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বদা শুনা অভ্যাস থাকাতেই, লোকে ঐ সকল রাগের গান মুখে মুখে অনায়াসে আদায় করিতেছে বটে; কিন্তু কানে না শুনিয়া, কেবল স্বরলিপি দেখিয়া উহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইলে, প্রস্তাবিত অভিনব ঠাটই সর্ব্বাপেক্ষা সহজতম বোধ হইবে।

এই পদ্ধতির লিখন প্রণালীর সহিত সেতারাদি যন্ত্রের কি প্রকার সামঞ্জস্য হইবে, তাহা পর পরিচ্ছেদে প্রকটিত হইতেছে। এই নূতন পদ্ধতির প্রতি সংস্কারাবদ্ধ প্রাচীন শ্রেণীর সংগীত-বেত্তাদিগের মতামতের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহাদের এক পথ দিয়া গমনাগমের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; তাঁহারা অপরিচিত নূতন পথ কখনই সুগম দেখিবেন না। যাহাদের এখনও কোন পথ দিয়া যাওয়া আসার অভ্যাস হয় নাই, তাহারা ঐ উভয় পথ দিয়া গমনাগমন করত যে পথ অধিক সহজ ও তৃপ্তিকর মনে করিবে, তাহাই সর্ব্বসাধারণ্যে গৃহীত হইবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতি যদি সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয়, তাহা ভবিষ্যতে তদনুসারে গীতাদি লিপিবদ্ধ করত প্রচার করা যাইবে। আপাতত উদাহরণের জন্য দুই চারিটি মাত্র গান দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহা নূতন ও পুরাতন দুই পদ্ধতিতেই লিপিবদ্ধ হইবে। যাঁহার যে পদ্ধতি সহজতর বোধ হইবে, তিনি তাহা দেখিয়া অভ্যাস করিবেন।

১৭শ পরিচ্ছেদ ঃ—ষড়্‌জ-পরিবর্ত্তন, ও ষড়্‌জ-সংক্রমণ।

যন্ত্রাদির মধ্যে এক স্বর ত্যাগ করিয়া অন্য স্বরকে খরজবৎ গ্রহণ করত, তাহা হইতে গ্রাম উত্থাপন পূর্ব্বক, তাহাতেই গীতাদি সম্পাদন করাকে "খরজ পরিবর্ত্তন" অথবা খরজান্তর করণ কহা যায়। এতদ্দেশে বহু সপ্তকবিশিষ্ট বাদ্য যন্ত্র, ও স্বরলিপির ব্যবহার না থাকাতে, খরজ পরিবর্ত্তনের রীতি প্রচলিত হয় নাই; এবং সঙ্গীতবেত্তারাও তাহার নিয়ম অবগত নহেন। কিন্তু হিন্দু সঙ্গীতের খরজ পরিবর্ত্তন যে একবারে নাই, তাহা নহে; গোপন ভাবে আছে। সেতারের গতে কখন কখন খরজ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। ভৈরবী, খাম্বাজ, পিলু প্রভৃতি রাগিণী অনেক সময়ে খরজ পরিবর্ত্তন হইয়া গীত ও বাদিত হইয়া থাকে।

খরজ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ও উপকার অনেক। মনে কর, এস্‌রারের সঙ্গতের সহিত গাইবার ইচ্ছায় স্বর মিলাইয়া দেখা গেল যে, উহার সা-স্বরে গান ধরিলে বড় চড়া হয়; কিন্তু প-স্বরে ধরিলে গাইবার যথেষ্ট সুবিধা হয়; কিম্বা সা-স্বরে ধরিলে বড় খাদ হয়; ম-স্বরে ধরিলে সুবিধা হয়। গায়ক সেই সেই সুবিধাকর স্বর খরজবৎ গ্রহণে, তাহাতেই গান ধরিয়া অনায়াসে গাইতে পারিবে; কিন্তু যন্ত্রীকে সেই প কিম্বা ম হইতে গান ধরিয়া বাজাইতে হইলে, সা-এর গ্রাম ঐ প কিম্বা ম-এর উপর স্থাপন করিতে হইবে। পরন্তু খরজান্তর করণের ফিকির না জানিলে, যন্ত্রী সহসা তাহা করিয়া ঐ রূপ গানের সহিত সঙ্গত করিতে পারেন না। সেই কৌশল আর কিছুই নহে; ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, স্বাভাবিক গ্রামের সাতটী অন্তরের মধ্যে, তৃতীয় ও সপ্তম স্থানীয় অন্তর দুইটী অর্দ্ধস্বর, ও বাকী পাঁচটী অন্তর পূর্ণস্বর; অন্যান্য স্বরকে খরজ করিয়া, সেই পর্দা হইতে উল্লিখিত অন্তরের নিয়মে অন্যান্য পর্দাগুলি আবশ্যক-মত সরাইয়া লইলেই, খরজান্তর করা হয়। ইহাতে সমস্ত পর্দা স্থানান্তর করিতে হয় না; আবশ্যকমত দুই চারি খানা পর্দাকে কড়ি কিম্বা কোমল করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়; তাহা কি রূপ, পরে ব্যক্ত হইতেছে।

কণ্ঠে পর্দা নাই, সকল স্বর হইতেই সহজে গ্রামোচ্চারণ করা যায়; ইহাতে কণ্ঠসঙ্গীতে খরজ পরিবর্ত্তনের অপ্রয়োজন মনে হইতে পরে। কিন্তু তাহা নহে; কণ্ঠের

সহিত সর্ব্বদাই যন্ত্রের সঙ্গত হয়; এবং গলায় যেরূপ গাওয়া যায়, যন্ত্রেও অবিকল তদ্রূপ বাজাইতে হয়। অতএব স্বরলিপিতে কণ্ঠ সঙ্গীতের সহিত যন্ত্র সঙ্গীতের সামঞ্জস্য রাখার কারণ, গান সকল খরজান্তর ভেদ করিয়া লিখার বিশেষ প্রয়োজন; কেননা তাহা হইলে ঐ কণ্ঠ সঙ্গীত দেখিয়া যন্ত্রও গানের সহিত বাজাইতে পারা যায়। ভারতীয় যন্ত্রাদি সেরূপ নহে বলিয়া খরজ পরিবর্ত্তনের সুবিধা হয় না, পূর্ব্বেই বলিলাম; অতএব এক্ষণে তাহার কার্য্য, যন্ত্রের তার উচ্চ নীচ করিয়া, বাঁধিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। কিন্তু কি ওজনে গান ধরা উচিত, তাহা গানের স্বরলিপিতে প্রকাশ থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কণ্ঠের সুবিধার জন্য সাংকেতিক স্বরলিপিতে খরজ পরিবর্ত্তন করিয়া গীতাদি লিখার বিশেষ প্রয়োজন হয়, কেননা ঐ স্বরলিপি কণ্ঠ ও যন্ত্র, দুই-এরই সম্পূর্ণ উপযোগী। সার্গম স্বরলিপিতে সেই রূপ করিয়া লিখার প্রয়োজন হয় না; কারণ সার্গম স্বরলিপি কেবল কণ্ঠেরই উপযোগী, যন্ত্রের নহে।

খরজ পরিবর্ত্তনের উপপত্তি অর্থাৎ মূল নিয়ম এই রূপ:—রি-কে খরজ করিলে গ রিখব হইতে পারে, কেননা রি হইতে গ পূর্ণস্বর। কিন্তু ম ঐ খরজের গান্ধার হইতে পারে না, কেননা গ হইতে ম অর্দ্ধস্বর; কিন্তু রিখবহইতে গান্ধার পূর্ণস্বর হওয়া উচিত; অতএব ম-এ আর অর্দ্ধান্তর যোগ করত উহাকে পূর্ণস্বর করিলে কড়ি-ম হয়; ঐ কড়ি-মই রি-ষাড়্জিক গ্রামের গান্ধার। প ঐ গ্রামের মধ্যম, কেননা গ হইতে ম-এর ন্যায়, কড়ি-ম হইতে প অর্দ্ধস্বর। ধ ঐ গ্রামের পঞ্চম; ও নি উহার ধৈবত। কিন্তু সা১ ঐ গ্রামের নিখাদ হইতে পারে না, কেননা নি হইতে সা অর্দ্ধস্বর; এদিকে ধৈবত হইতে নিখাদ পূর্ণস্বর হওয়া কর্ত্তব্য; অতএব ঐ সা-এ আর অর্দ্ধান্তর যোগ করত উহাকে পূর্ণস্বব করিলে কড়ি-সা হয়, —ঐ কড়ি-সাই রি-ষাড়্জিক গ্রামের নিখাদ; কড়ি সা হইতে রি অর্দ্ধস্বর, যাহা নিখাদ হইতে উচ্চ খরজের ন্যায্য অন্তর। এক্ষণে দেখ, রি-এর খরজে দুইটি কড়ি লাগে, ম ও সা, যথা পার্শ্বে। এই রূপে প্রয়োজনানুসারে কোন স্বরকে অর্দ্ধান্তর উচ্চ, অর্থাৎ কড়ি, কোন স্বরকে অর্দ্ধান্তর নীচ, অর্থাৎ কোমল, করিয়া খরজান্তর করিতে হয়। অচল ঠাট যুক্ত যন্ত্রে সহজে খরজ পরিবর্ত্তন করা যায়; কেননা উহাতে যাবতীয় বিকৃত স্বরগুলির পর্দা উপস্থিত থাকে। অচলস্বারিক গ্রামের সা ব্যতীত অন্যান্য স্বরকে খরজ করিয়া, তাহা

রি১ সা১
সী১— নি
/
সা১
নি—ধ
ধ—প
প—ম
মী— গ
/
ম
গ—রি
রি—সা

হইতে পূর্ব্বাবিক রীতিতে স্বাভাবিক গ্রাম প্রস্তুত করিতে হইলে কোন্ কোন্ সুরের খরজে কি কি সুর বিকৃত করিয়া লইতে হয়, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

স্বাভাবিক সুরের খরজ।

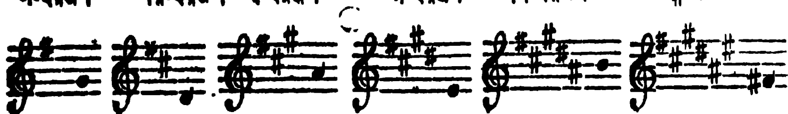
প-খরজে	... ...	১ কড়ি	..	গ♯।
রি ,,	... ...	২ কড়ি	... ...	ম♯ ও সা♯।
ধ ,,	... ...	৩ কড়ি	... ...	ম♯, সা ও প♯।
গ ,,	... ...	৪ কড়ি	... ..	ম♯, সা♯, প♯ ও রি♯।
নি ,,	... ...	৫ কড়ি	... ..	গ♯, সা♯, প♯, রি♯ ও ধ♯।
ম ,,	... ...	১ কোমল	... ...	নি♭।

বিকৃত সুরের খরজ।

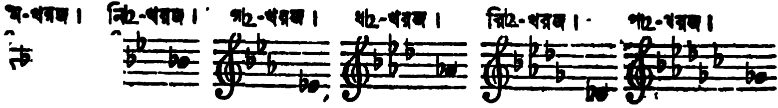
কোমল-নি খরজে	...	২ কোমল	..	নি♭ ও গ♭।
,, গ ,,	...	৩ কোমল	...	নি♭, গ♭, ও ধ♭।
,, ধ ,,	...	৪ কোমল	...	নি♭, গ♭, ধ♭, ও রি♭।
,, রি ,,	...	৫ কোমল	...	নি♭, গ♭, ধ♭, রি♭, ও প♭।
,, প ,,	...	৬ কোমল	...	নি♭, গ♭, ধ♭, রি♭, প♭, ও সা♭।
কড়ি ম খরজে	...	৬ কড়ি	...	ম♯, সা♯, প♯, রি♯, ধ♯ ও গ♯।

সাংকেতিক স্বরলিপিতে মঞ্চের উপর ঐ সকল কড়ি কোন্ স্থলে কি রূপে প্রয়োগ হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

খরজ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয় কড়ি কোমল চিহ্ন সকল মঞ্চের আদিতে কুঞ্চিকা ও তালাংকের মধ্যস্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে স্থাপিত কড়ি কোমল চিহ্নের এই অর্থ যে, তন্নির্দ্দিষ্ট তাবৎ সুরকে তাহাদের যাবতীয় অষ্টমের সহিত গীতাদির আদ্যোপান্তে কড়ি বা কোমল করিতে হয়। তখন ঐ সকল কড়ি ও কোমল চিহ্নকে 'খরজ সূচিকা' নামে কহা যায়, অর্থাৎ তদ্দ্বারা গ্রামের কোন্ সুরটী খরজ, তাহার জ্ঞাপন হয়। যথা :—



কোমল-যোগে খরজ-বদল।



উক্ত কোমল-প খরজে সা-এর অর্থ স্বাভাবিক নি, অর্থাৎ উচ্চারণ করিলেই কোমল-সা হয়। এমতাবস্থায় স্বাভাবিক নি ঐ স্থানে না লিখার তাৎপর্য্য এই:—নি-এর নাম একবার কোমল বলিয়া ব্যবহার হইয়াছে, আবার ঐ নাম ব্যবহার করিলে, একই নাম দুইবার হয়, এদিকে স-এর নাম একবারও ধরা হয় না। ইহা উচিত নহে; গ্রামে সকল স্বরেই নাম একবার করিয়া ধরা উচিত। উক্ত কড়ি-ম খরজে কড়ি-গ-এর অর্থ স্বাভাবিক ম, অর্থাৎ ম উচ্চারণ করিলে কড়ি-গ হয়; কারণ গ হইতে ম অর্দ্ধস্বর উচ্চ, তজ্জন্য ম-কে কড়ি-গও বলা যায়। ইহাও উপরের লিখিত কারণে ঐ রূপ লিখার প্রয়োজন হয়।

যে স্থলে মঞ্চের অপর স্থানে, কোন পদের মধ্যে, কড়ি কোমল চিহ্ন থাকে, তথায় তাহাদিগকে 'আকস্মিক' বলা যায়। তদ্দ্বারা কেবল সেই পদের মধ্যগত স্বরই বিকৃত করিতে হয়, অন্য পদের নহে।

খরজ পরিবর্ত্তনের নিয়ম সাংকেতিক স্বরলিপির ব্যবহার্য্য হইলেও হিন্দু সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থায় উহার প্রয়োজন অতি অল্প; কারণ আমাদের প্রচলিত বাদ্য যন্ত্রাদিতে সহসা খরজ পরিবর্ত্তন করার সুবিধা নাই। অতএব এক্ষণে স্বরলিপিতে গীতাদি খরজান্তর করিয়া লিখিয়া স্বরলিপি কঠিন করা উচিত বিবেচনা হয় না। যে খরজের ওজনে গান ধরিতে হইবে, এক্ষণে বাদ্য যন্ত্রের তারাদি সেই ওজনে মিলাইয়া বাঁধা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পরন্তু ইহাতে সর্ব্বদাই এই অসুবিধা হয় যে, উচ্চ ওজনের খরজে যন্ত্র বাঁধিতে যাইলে, তার ছিঁড়িয়া যায়; আবার খরজ অধিক নিম্ন হইলেও, যন্ত্রের আওয়াজ উপযুক্ত মত না হইয়া ভৎ ভৎ করিতে থাকে। এই হেতু একই ওজনের খরজে সকল প্রকার গান গাইতে বাধ্য হইতে হয়; তাহাতে গান বিশেষে উচিত মত রসের আবির্ভাব হয় না। আমাদের সঙ্গীতে এই সকল অসুবিধা যত দিন না মোচন হইবে, তত দিন গায়কের অদৃষ্টে সকল প্রকার গান গাইয়া সহসা জমান ঘটিবে না। এই কারণ বশতই এরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছে যে, যাঁহার খেয়াল ধ্রুপদ গাওয়া অভ্যাস, তিনি ঠুংরী টপ্পা গাইয়া জমাইতে পারেন না; এবং যাঁহার ঠুংরী টপ্পা গাওয়া অভ্যাস, তিনি খেয়াল ধ্রুপদ গাইয়া জমাইতে পারেন না।
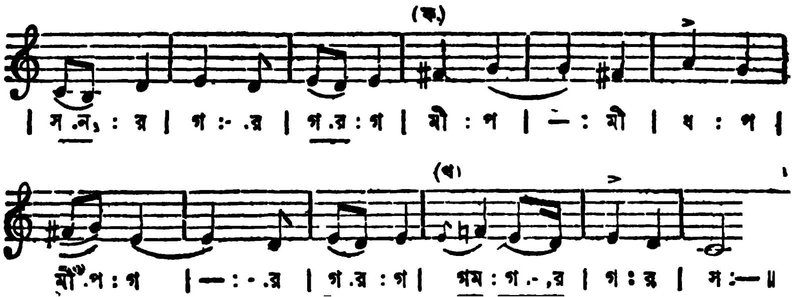
সাংকেতিক স্বরলিপিতে দুই প্রকার নিয়মে গান লিখা যাইতে পারে : এক প্রকার নিয়ম খরজান্তর করিয়া লিখা ; আর এক প্রকার নিয়ম সা-এর খরজে লিখিয়া, গানের শিরোদেশে ঐ সা-এর ওজন লিখিয়া দেওয়া। আমাদের সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ দ্বিতীয় নিয়মই আপাতত অবলম্বন করা উচিত। তবে যন্ত্রাদিতে সহজে যে গান খরজান্তরিত করা যাইতে পারে, যেমন ম ও প-খরজ, তাহা সেই খরজে লিখিলেও হানি নাই। কোন কোন গান যে খরজান্ত করিয়া লিখিত হইতেছে, সে কেবল উদাহরণের জন্য। সার্গম স্বরলিপিতে ঐ সকল খরজ বদলে প্রভেদ বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না, তাহা সর্ব্বদাই এক নিয়মে লিখিয়া গানের মাথায় খরজের ওজন লিখিয়া দিলেই হয়। ভিন্ন ভিন্ন খরজের ওজন কি রূপে জানা যায়, তাহা ১৩শ পরিচ্ছেদে দেখান হইয়াছে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রাগাদির যে অভিনব ঠাটের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে, সেই সকল ঠাটও উক্ত নিয়মানুসারে খরজান্তরিত করা যায়। পূর্ব্বোক্ত খরজ বদলের তালিকা-নুসারে সা-মূর্চ্ছনার স্বাভাবিক ঠাটকে অনায়াসে ভিন্ন ভিন্ন সুরে খরজান্তরিত করা যাইবে। রি-মূর্চ্ছনার ঠাটকে সা-এর উপর স্থাপন করিলে, দুইটী কোমলের আবশ্যক হয় ; গ♭ ও নি♭ ; ইহাই সিন্ধু, সাহানা প্রভৃতির প্রচলিত ঠাট। এদিকে খরজ পরিবর্ত্তনের উক্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, কোমল-নি-ষাড়্‌জিক গ্রামেও ঐ দুই কোমলের প্রয়োজন ; অতএব গ♭ ও নি♭ বিশিষ্ট যে ঠাট, তাহার খরজ নি♭

এক্ষণে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সিন্ধু, সাহানা প্রভৃতি রাগিণীসকল প্রচলিত নিয়মের যে-ঠাটে সচরাচর লিখা যায়, তাহা কোমল নি-এর গ্রাম। এই জন্য ঐ ঠাটকে স্বাভাবিক বলা হয় না। যাহাতে বিকৃত সুর ব্যবহার না হয়, যেমন সা-এর গ্রাম, তাহাকেই স্বাভাবিক ঠাট বলিতে হয়। ঐ কোমল নি-এর গ্রামকে সা-এর উপর স্থাপন করিলেই স্বাভাবিক গ্রামে পরিবর্ত্তন করা হয়। তাহা হইলে রি-মূর্চ্ছনার ঠাট আইসে। গ-মূর্চ্ছনার ঠাট কোমল ধ-এর খরজে লিখিলে ভৈরবীর প্রচলিত ঠাট হয় ; অতএব ভৈরবীর ঠাটের খরজ কোমল-ধ, অর্থাৎ ঐ ঠাট কোমল ধ-খরজের গ্রাম ; ঐ গ্রাম সা-এর খরজে পরিবর্ত্তিত করিলেই গ মূর্চ্ছনার ঠাট পাওয়া যায়। ম-মূর্চ্ছনার ঠাট প-এর খরজে লিখিলে, ইমনের প্রচলিত ঠাট হয়। ধ-মূর্চ্ছনার ঠাট কোমল-গ-এর খরজে লিখিলে সিন্ধু-ভৈরবী, কানাড়া প্রভৃতির প্রচলিত ঠাট হয়, ইত্যাদি।

ষড়্জ-সংক্রমণ, বা খরজ-ফের।

প্রত্যেক রাগ একটী স্বরকে নায়ক রূপে অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়; সেই স্বরকেই খরজ (ষড়্জ) কহে; ইহা অন্যান্য স্বরের নেতা, অর্থাৎ তদ্দ্বারা অন্যান্য স্বরের শাসন হয়। অনেক রাগ এমন আছে, যে তাহারা মধ্যে মধ্যে সা-এর ষাড়্জিকতা ত্যাগ করিয়া, অন্যান্য স্বরকে খরজ রূপে আশ্রয় করে; ও তৎপরে পুনর্ব্বার সা-এর খরজে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, তাহাতেই সমাপ্ত হয়। এই কার্য্যকে 'ষড়জ-সংক্রমণ' কহা যায়। যেমন ইমন-কল্যাণে কড়ি-ম যোগে প-এর খরজে সংক্রমণ হয়; যথা :—



ইহা প্রথমে সা-এর খরজে আবদ্ধ হইয়া, অবরোহণে যখন কড়ি-ম যোগে প-এ গমন করে, যেমন ঐ (ক) চিহ্নিত স্থানে, তখন উহা প-কে খরজ ভাবে আশ্রয় করে। এই জন্যই তথায় কড়ি-ম-এর প্রয়োজন, কারণ কড়ি-ম তখন নি-এর কার্য্য করে, অর্থাৎ নি-রূপ ধারণ করত, তাহার খরজে যে প, তাহাকে লক্ষ্য করে, অর্থাৎ কড়ি-ম তখন প-এর খরজত্বের প্রদর্শক হয়; উহা না হইলে প-এর খরজত্ব হয় না। তৎপরে যখন অবরোহণে স্বাভাবিক ম উচ্চারিত হয়, যেমন (খ) চিহ্নিত স্থানে, তখন প-এর ষাড়্জিকতা ত্যাগ করে, এবং পুনরায় সা-এর খরজত্বকে আশ্রয় করত, তাহাতেই সমাপ্ত হয়; ঐ স্বাভাবিক ম-দ্বারাই সা-এর খরজে প্রত্যাগমন বুঝায়। ইমন-কল্যাণে স্বাভাবিক ম ব্যবহার হওয়াতে সা-মূর্চ্ছনাই উহার প্রকৃত ঠাট। কিন্তু ইমনে ঐ ম নাই, এবং কল্যাণেও ঐ ম নাই; তখন ইমন-কল্যাণে কোথা হইতে স্বাভাবিক ম আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, বেলাবলীর সহিত ইমন মিশিয়া ইমন-কল্যাণ হইয়াছে, কারণ বেলাবলীকে দিনের কল্যাণ বলে। সে যাহাই হউক, ঐ বিষয়ের বিচার এই পরিচ্ছেদের কার্য্য নহে। যে বিষয় বলিতেছি : ঐ প্রকার সংক্রমণ বেলাবলী, বেহাগ, গৌরসারঙ্গ, হাম্বীর, পূরবী, গৌরী প্রভৃতি রাগিণীতে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ইহারা প্রায়ই প-এর খরজে সংক্রমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কড়ি-ম বিশিষ্ট সকল রাগই

যে প-এর খরজে সংক্রমিত হয়, এমন নহে। ইমনে স্বাভাবিক ম না থাকাতে, উহা প-খরজে সংক্রমণ হওয়া বলা যায় না; প-ই উহার প্রকৃত খরজ, সেই জন্য উহাকে ম-মূর্চ্ছনার রাগ বলা যায়। অনেক রাগে কড়ি-ম কেবল আকস্মিক রূপে ব্যবহার হয়, যেমন পুরিয়া-ধনশ্রী, পরজ, বসন্ত, ইত্যাদি; প-খরজে ইহাদের সংক্রমণ হওয়া বলা যায় না।

খাম্বাজ রাগিণী কখন কখন কড়ি-ম যোগে প-এর খরজে সংক্রমিত হয়; যেমন নিম্নলিখিত শোরির টপ্পায়; যথা :—

(ক)

: র গম : গ | মম :প.প :মগ,র :গম | প :প.প : ধ.ধ :প.মী | প : ম.ম : প.ম : গ |
তা - লা বে . ... আটি জো - - - - - - রে জো

ইহা সা-খরজে আরম্ভ হইয়া, ঐ (ক) চিহ্নিত স্থানে কড়ি-ম সহকারে প-এর খরজকে আশ্রয় করিয়াছে; নতুবা খাম্বাজে কড়ি-ম ব্যবহার হওয়ার কথা নহে। তৎপরে স্বাভাবিক ম যোগে সা-খরজে প্রত্যাগমন করিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ কড়ি-ম ভুল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; বড় বড় গায়ক গায়িকাদিগের মুখে উহা সর্ব্বদা শুনা যায়। অতএব উহা ভুল নহে। ঐ রীতি লখ্‌নৌ দরবার হইতে প্রচলিত হয়। ঠুংরী গানে ঐ প্রকার সংক্রমণ সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। খাম্বাজে যে কোমল-নি ব্যবহার হয়, তৎসহযোগেই উহা ম-এর খরজে সংক্রমিত হইয়া থাকে; যথা :—

(হিন্দী) (ক)

| ন :— | ন১ : —.ন | স১.ন : র১ | স১ : স১ | নো :ধ | — : ম |
বং - শী ... ধু - ন লো ... মা - ধা - - রে,

ম :— | প : প | পস১ .স১: নো | ধ :— | প , ম.-:— | গ : গ |
বা - - জ - ত শ্রী ... ... বি - - ন্দা - - - ব - নঃ

প্রথমে স্বাভাবিক নি যোগে সা-এর খরজে আরম্ভ করিয়া অবরোহণে ঐ ক চিহ্নিত

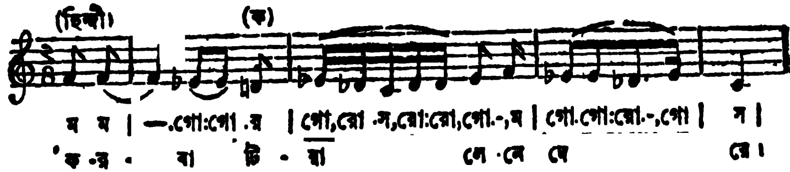
খাম্বাজে কোমল-নি সহকারে ম-খরজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কেহ হয়ত বলিবেন যে, স্বাভাবিক নি ভুল, উহা কোমলই হইবে। কিন্তু উহা ভুল নহে; হিন্দুস্থানী গায়ক মাত্রেই ঐ রূপ গাইয়া থাকেন। খাম্বাজে স্বাভাবিক নি দেওয়া উচিত নহে।—এরূপ নিজের ইচ্ছামত ব্যাকরণ করিলে চলিবে না; সাধারণের ব্যবহার দেখিতে হইবে। সুরট, দেশ, কামোদ ইত্যাদি, ইহারাও ঐ প্রকার দুই নি যোগে ম ও সা-এর খরজে সংক্রমিত হইয়া থাকে। যে সকল রাগে কোমল-নি ব্যবহার হয়, তাহারা যে ঐ নি-কোমল কে ভর করিয়া ম-খরজে সংক্রমিত হয়, ইহার বিশেষ এক প্রমাণ এই যে, নি-কোমল বিশিষ্ট রাগে ম বর্জ্জিত হইতে দেখা যায় না। ঝিঁঝোটিতে ওরূপ সংক্রমণ হয় না, ইহা প-মূর্চ্ছনার রাগিণী, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে গ-এর অতিশয় প্রাবল্য হেতু, কখন কখন এমনও মনে হয় যে, ঐ গ যোগেই উহা স-এর খরজে সংক্রমিত হয়; কিন্তু খরজ-প্রদর্শক অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত নি ব্যতীত সম্পূর্ণ সংক্রমণ হওয়া, বলা যায় না।

সিন্ধু, কাফী, ভীমপলাশি, ইহারা খাম্বাজের ন্যায় স্বাভাবিক নি যোগে সা খরজে সংক্রমিত হয়। বিশেষতঃ অন্তরাতে ইহা প্রসিদ্ধ; তৎপরে কোমল-নি ব্যবহার দ্বারা সা-এর খরজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্য খরজ অবলম্বন করে। সেই অন্য খরজ যে ম, ইহা সহসা বলা যাইতে পারিত না, কেননা এই ম-এর নীচে পূর্ণান্তর ব্যবহিত কোমল গান্ধার থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ম-এর খরজে পূর্ণ সংক্রমণ হইবার জন্যই যেন ঐ সকল রাগিণীতে স্বাভাবিক গ এক একবার ব্যবহার হইয়া থাকে; ইহাতে উহাদের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় ভাগে স্বরলিপিতে উহাদের গানে ঐ সকল বিষয় দ্রষ্টব্য।

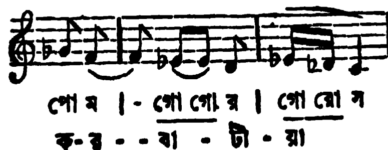
কেদারাতে সা ব্যতীত আরও দুই খরজে সংক্রমণ হয়, ম ও প। প্রথমে গান্ধার যোগে ম-এর খরজ আশ্রয় করে, তৎপরে কড়ি-ম যোগে প-এর খরজে সংক্রমিত হয়; অবশেষে স্বাভাবিক ম ও রি যোগে সা-এর খরজে অবসন্ন হইয়া যায়। ইহা গায়ক মাত্রেই অবগত আছেন।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাগাদি ম ও প-এর খরজেই অধিক সংক্রমিত হয়; কেননা ঐ দুই সুরের সংক্রমণই সহজ ও স্বাভাবিক। এই জন্যই বোধ হয়, সেতারাদি যন্ত্রে কড়ি-ম ও কোমল-নি-এর পৃথক পর্দ্দা থাকার প্রয়োজন ও প্রথা হইয়াছে, নৈলে যথেষ্ট অসুবিধা হইত। তদ্ব্যতীত অন্য সুরে সংক্রমণ হওয়া তত সহজ সাধ্য নহে।

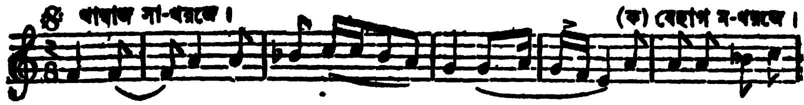
রাগ বিশেষে অন্যান্য স্বরের খরজে ওসংক্রমণ হইয়া থাকে; যেমন ভৈরবী স্বাভাবিক রি যোগে কোমল-গ-এর উপর কখন কখন সংক্রমিত হয়; যথা :—



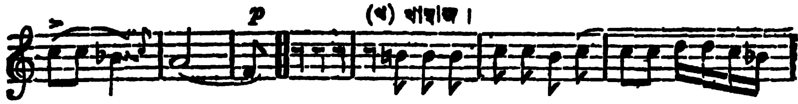
ইহা ম-এ আরম্ভ করিয়া, অবরোহণে ঐ ক চিহ্নিত স্থানে স্বাভাবিক রি যোগে কোমল গ-কে খরজ রূপে আশ্রয় করিতেছে। ঐ অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত নিম্ন স্বাভাবিক রি তথায় কোমল গ-এর খরজত্বের প্রদর্শক। উঁহা স্বভাবত আপনিই উপস্থিত হয়; চেষ্টা করিয়া আনিতে হয় না। কেননা মহইতেকোমল-গ পূর্ণ স্বর; ঐ কোমল গ হইতে আবার পূর্ণান্তর পর্য্যন্ত কোমল রি-তে নামিয়া আবার গ-এ আরোহণ করিয়াছে। ইহাতে সুন্দর বিচিত্রতা হইয়াছে। গ-মূর্চ্ছনা নামক ভৈরবী প্রস্তাবিত নূতন ঠাটে ঐ সংক্রমণটী প-এর উপর পড়ে; ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, রাগাদির প-এ সংক্রমিত হওয়ার প্রবৃত্তি অধিক; কেননা সা-এর সহিত প-এর মিল অধিক জন্য,প-ও উহার ন্যায় সুবিশ্রামদায়ক হয়। এতদ্ভিন্ন ভৈরবীতে আর এক প্রকার সংক্রমণ হইয়া থাকে, তাহা অর্দ্ধস্বর উচ্চ, এমন একটী নূতন স্বর দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়; যথা নিম্নে :—এস্থলে ম এর উপরে অর্দ্ধান্তর উচ্চ কোমল-প সহকারে ম-এর খরজে সংক্রমণ হইয়াছে। কোমল-প অথবা কড়ি-ম ভৈরবীতে নূতন; কিন্তু ঐ স্থানে উহা কোমল-রি-এর রূপ ধারণ করত, ম-খরজের প্রদর্শক হইয়াছে; কেননা কোমল রি ভৈরবীর জীবন; সেই জন্য উহা অন্যায় শুনায়



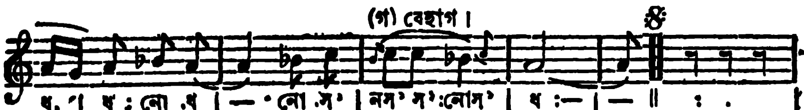
না। অন্যান্য রাগেও বিশেষ বিশেষ পূর্ণ স্বরের উপরে ঐরূপ অর্দ্ধস্বর প্রয়োগ দ্বারা ভৈরবীর অবতারণা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার সংক্রমণ দ্বারা গান বিশেষে প্রায়ই রাগান্তর প্রতিপাদন হইতে দেখা যায়। তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী অতি প্রসিদ্ধ উর্দ্দু ঠুংরী গান লিপিবদ্ধ হইতেছে :—
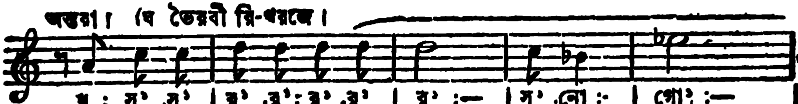


.ম :-.ম | —.ধ :-.ধ | নো.স১,স১:নো.ধ | প :প .-,ধ | প,ম গ:-.ধ | ধ . ধ : নো স১ |
জা - নি ছাম্-সে ঘোলো ... ... মৈ নে ... ... কে -য়া ভ - না কি-



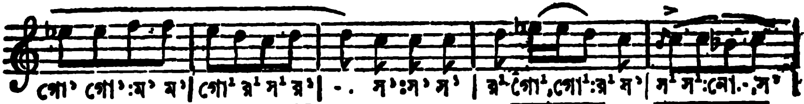
স১.স১:নোস১ | ধ :- | ম || : . | .ন : ন .ম | স১.স১:ন .স১ | স১ .স১:র১,র১স১,নো |
য়া ... ... হৈ। উল্-ফৎকে ব-ছি মারকে, ...



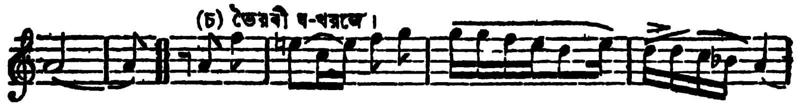
ধ,প ধ : নো .ধ | — .নো .স১ | নস১ স১:নোস১ | ধ :— | — || : . |
. জ - হাঁ-সে খো দি - য়া ... ... হৈ ... ... ||



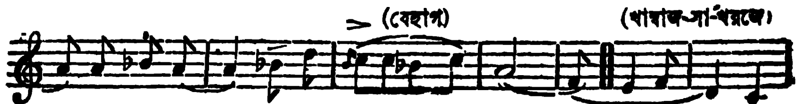
ধ : স১ .স১ | র১ .র১: র১ .র১ | র১ :— | স১ .নো :- | গো১ :— |
মস্ - জিদ্-মে ক -সম্ খা কে, ...



গো১ গো১:ম১ ম১ | গো১ র১ স১ র১ | - . স১:স১ স১ | র১ গো১,গো১:র১ স১ | স১ স১:নো.-,স১ |
... ... খো- দা ঘর মে- য়া ... দি- য়া ... ...



ধ :- | - || : ধ- .ম১ | গ১.স১.গ১:ম১.প১ | প১,প১ .ম১,গ১.র১ -,গ১ | র১,র১.স১,নো. ধ |
হৈ; উল্ ফৎ কে ব-ছি মার্ - - - কে, ...

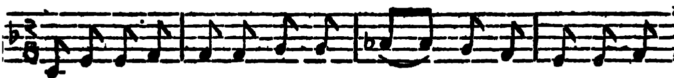


— .ধ : নো .ধ | —: নো র১ | স১.স১.নো -,স১ | ধ :— | ম || গ :-.ম | র : স |
... জ - হাঁ -সে খো-দি - য়া ... ... হৈ || ... ...

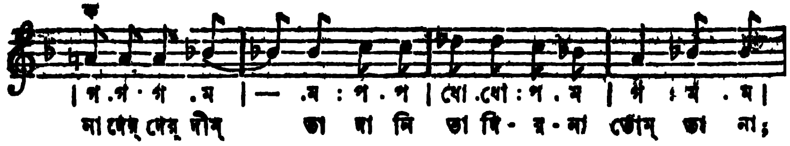
এই গানটীতে তিন রাগের সমাবেশ হইয়াছে। খাম্বাজ, বেহাগ ও ভৈরবী। প্রথমে সা-এর খরজে খাম্বাজ আরম্ভ হইয়া (ক) চিহ্নিত স্থানে বেহাগে পরিণত হইয়াছে, কারণ ঐ স্থানের ধ-গুলি বেহাগের গান্ধারের রূপ ধারণ করিয়াছে; সুতরাং ঐ বেহাগ ম-এর খরজকেই আশ্রয় করিয়া তাহাতেই নিবৃত্ত হইতেছে। তৎপরে (খ) চিহ্নিত স্থানে পুনরায় খাম্বাজ স্বাভাবিক নি যোগে সা-এ সংক্রমিত হইয়া, (গ) চিহ্নিত স্থানে বেহাগে পরিণত হইয়াছে। অন্তরাতে ভৈরবী অবতীর্ণা হইয়া, (ঘ) চিহ্নিত স্থানে ধ-কে তদীয় পঞ্চমের রূপ দিয়া, কোমল গ সহযোগে রি-এর খরজকে আশ্রয় করিয়াছে; কারণ তথায় ঐ গ কোমল ভৈরবীর কোমল-রিখব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৎপরে (চ) চিহ্নিত স্থানে ধ-কে সা-বৎ করিয়া, অরোহণে উচ্চ ম-কে কোমল-ধ এবং স্বাভাবিক গ-কে পঞ্চমে রূপান্তরিত করত, অবরোহণে ঐ ধ খরজে সমাপ্ত হইয়াছে; শেষে আশ্চর্য্য কৌশলে বেহাগের পরে খাম্বাজের সহিত পুনর্মিলিত হইয়া অবসন্ন হইয়াছে। এইরূপে নূতন নূতন বেশ ধারণ করত, গানটী প্রভূত বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে। হিন্দুস্থানী টপ্পাগায়ক মাত্রেই ঐ প্রকার সুরের গান সর্ব্বদা গাইয়া থাকে। ঐ গানটী নানা প্রকার ধরণে ও ভঙ্গীতে গীত হয়; তন্মধ্যে একটী ধরণ উপরে লিপিবদ্ধ হইল।

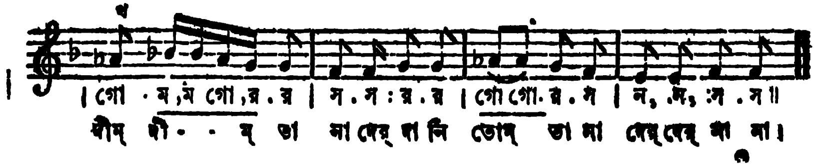
লখ্‌নৌই কায়দার ঠুংরী গানে ঐ প্রকার সংক্রমণ ও রাগান্তর সর্ব্বদা হইয়া থাকে। কালাবঁতেরা হিংসাবশতঃ উহা আসলে দেখিতে পারেন না; ১০ম পরিচ্ছেদে ঠুংরী গানের প্রস্তাবে ঐ বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি আমার ঠুংরীগানের সংগ্রহ অতিশয় অল্প; নতুবা রাগান্তর হওয়ার আরও দুই এক প্রকার উদাহরণ দিতে পারিলে ভাল হইত।

পিলু রাগিণী স্বাভাবিক গ যোগে ম-এর খরজে সংক্রমিত হয়; যথা :—



| প,.ন,:ন, স | স.স:র.র | গো.গো:র.স | ন,.ন,:স.স ||
না দের্‌ দের্‌ তি - না-না না - নি তোম্‌ তা - না দের্‌ দের্‌ না না।





উক্ত ক চিহ্নিত স্থানে স্বাভাবিক গ-এর সাহায্যে ম-এর খরজ অবলম্বন করিয়াছে; তথা হইতে যেন পিলু আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইতেছে, কারণ ঐ ম-খরজের কোমল গান্ধার যে কোমল-ধ, তাহা পূর্ব্ব হইতেই তথায় বর্ত্তমান। সেইজন্য ম-এর খরজে সংক্রমণ করিতে পিলুর প্রবৃত্তি প্রবল ও স্বাভাবিক। তৎপরে আবার কোমল-গ যোগে সা-এর খরজে প্রত্যাবৃত্ত হয়; যেমন উক্ত (খ) চিহ্নিত স্থানে। বারওঁাও স্বাভাবিক গ যোগে ম-এর খরজে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

অনেক রাগ এমন আছে, তাহাদের কড়ি-কোমলের কোন অর্থ পাওয়া যায় না:— যেমন বসন্ত, মারোয়া, পুরিয়া, জয়েৎ প্রভৃতিতে কড়ি-ম ও কোমল-রি; দরবারী তোড়ি, মুলতানি, হিন্দোল প্রভৃতিতে কড়ি-ম ইত্যাদি। এই সকল রাগ সেইজন্য আদায় করাও অতিশয় কঠিন।

কোমল-নি ও কোমল-গ বিশিষ্ট রাগ সমূহের পক্ষে সা-এর গ্রাম কখনই স্বাভাবিক নহে; কিন্তু উহারা সর্ব্বদা সা-এর গ্রামেই গীত ও বাদিত হওয়াতে সা-এর খরজকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য অন্তরাতে ঐ প্রকার সমস্ত রাগই স্বাভাবিক নি-যোগে সা-এর খরজে সংক্রমিত হয়। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রাগাদির যে অভিনব ঠাটের প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহাতে যে স্বর যে রাগের ঠাট, অন্তরাতে সে সকল রাগই উক্ত নিয়ম বশতঃ সেই স্বরে সংক্রমিত হইয়া থাকে: যেমন রি-ঠাটের রাগ অন্তরাতে কড়ি সা যোগে রি-এর খরজে সংক্রমিত হয়। গ ঠাটের রাগ অন্তরাতে কড়ি-রি যোগে গ-এ; প-ঠাটের রাগ কড়ি-ম যোগে প-এ; ধ-ঠাটের রাগ কড়ি-প যোগে ধ-এ, এই প্রকার করিয়া, সংক্রমিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বোধ হয় ভরসা করা যাইতে পারে যে, ষড়্‌জ সংক্রমণের তাৎপর্য্য ও প্রণালী সঙ্গীত কুতূহলী পাঠকবৃন্দ কতক বুঝিতে পারিবেন। সংক্রমণই গানের বিচিত্রতা

সম্বর্দ্ধনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপায়; তদ্দ্বারা ভাবার্থের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন নূতন রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যেমন 'তাল-ফের', 'রাগ-ফের', তেমনি সংক্রমণকে 'ধরজ-ফের' বলা যায়। আধুনিক হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী সঙ্গীতবিদ্‌গণ সংক্রমণ প্রণালী কিছুই অবগত নহেন; কেননা তাঁহাদের সঙ্গীতালোচনা সমস্তই মৌখিক; সুতরাং কিসে কি হইতেছে, তাহার দিকে তাঁহাদের নজর নাই। প্রত্যুত সংক্রমণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে, স্বরের সমূহ অনুধাবনের প্রয়োজন। কিন্তু অজ্ঞাত রূপে গানের মধ্যে সংক্রমণ সর্ব্বদাই ব্যবহার হইতেছে। উহা উন্নতাবস্থ সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ। অস্মদ্দেশে নাট্য সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকিলে, তৎসহিত সংক্রমণের প্রণালীও পরিষ্কৃত ও উন্নত হইবে।

———:o:———

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

———

ভ্রম-সংশোধন : ৩২ পৃষ্ঠার দশম পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত
'১৪ পৃষ্ঠার' স্থলে '২৭ পৃষ্ঠার' হইবে।

নির্ঘণ্ট

প

ফ

ব

ভ

ম